

# কিশোর গল্পসমগ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



# কিশোর গল্লাসমগ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



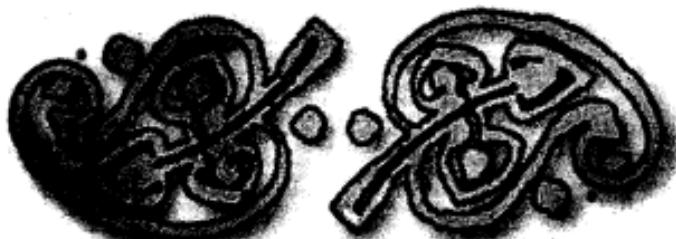


**সুচীপত্র**

প্রকাশক      সাঈদ বারী  
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র  
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০  
ফোন : ৭১১৩৮৭১

বইয়ের নাম      কিশোর গল্পসমষ্টি  
এন্ডকার      রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
থত্ত      প্রকাশক  
সঙ্গম মুদ্রণ      জুলাই ২০০৯  
ষষ্ঠ মুদ্রণ      ফেব্রুয়ারি ২০০৭  
পঞ্চম মুদ্রণ      ফেব্রুয়ারি ২০০৫  
চতুর্থ মুদ্রণ      ডিসেম্বর ২০০৩  
তৃতীয় মুদ্রণ      অক্টোবর ২০০৩  
বিত্তীয় মুদ্রণ      ফেব্রুয়ারি ২০০০  
প্রথম প্রকাশ      ফেব্রুয়ারি ২০০০  
প্রকাশ ও অঙ্গসমূহ      মাসুদ কবির  
মুদ্রণ      সালমানি প্রিস্টিং প্রেস, নয়াবাজার ঢাকা  
উক্তর আমেরিকায় পরিবেশক      মুক্তধারা  
জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র  
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক      সর্জিতা লিমিটেড  
২২ ট্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

Title      Kishor Galpasamagra  
Author      Rabindranath Tagore  
Published by      Saeed Bari  
                    Chief Executive, Suceepatra  
                    38/2ka Banglabazar Dhaka 1100. Bangladesh  
Tel      7113871  
Price      BDT. 150.00 Only US \$ 10.00  
মূল্য      ট ১৫০.০০ মাত্র  
ISBN      984-70022-0134-6



## ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର କିଶୋର ଗଲ୍ଲେର ଭୂବନ

ବାଂଳା ସାହିତ୍ୟର ମହତ୍ତମ ସାହିତ୍ୟପ୍ରଷଟ୍ଠା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର । ସାହିତ୍ୟର ଏମନ କୋନୋ ଆଙ୍ଗିକ ନେଇ ଯା ତା'ର ଆଲୋକସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ପର୍ଶେ ପରିଣତ, ପ୍ରାଗବନ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚଲ ହୟେ ଓଠେନି । ଏମନ ବହୁଧୀ ପ୍ରତିଭା ଏକଟି ଅଞ୍ଚଳେ ଜନ୍ମାଲେଓ ହୟେ ଓଠେନ ସାର୍ବଭୌମ । ଏକଟି କାଳପରିସରେ ରଚିତ ତା'ର ସୃଷ୍ଟିସଭାର ସେଇ କାଳେର ଘେରାଟୋପେଇ ବନ୍ଦି ଥାକେ ନା—ହୟେ ଓଠେ କାଳୋତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ । ଆର ସେଇ ସୃଷ୍ଟିର ରସ ଆସ୍ଵାଦନେର ଅଧିକାର ଜନ୍ମାଯ ସକଳ ଯୁଗେର ସକଳ ମାନୁଷେର ।

ବୟସେ ଯାରା ପରିଣତ, ତାଦେର ଚିନ୍ତାର ଜଗଂ ଜୀବନ୍ୟାପନେର ନାନା ଧରନେର ସଂଘର୍ଷ-ସଂଘର୍ଷ ଜାଟିଲ ହୟେ ଓଠେ । କିନ୍ତୁ ଶିଶୁଦେର ମନୋଲୋକ ସୁହୁ ପରିଚନ୍ତାଯ ନିଷ୍ଠ । ତୁଳ୍ବ କୁଦ୍ର ଜିନିସ ଓ ତାଦେର ମନେ ସଂଘାରିତ କରତେ ପାରେ ଅନ୍ତିମିନ ଆନନ୍ଦ । ଆକାଶକୁସୁମ ଚିନ୍ତା କରତେ ଭାଲୋବାସେ । ଉନ୍ନଟ କଲ୍ପନା ଥେକେ ସଂଘୟ କରତେ ପାରେ ପ୍ରାଣେର ରସଦ । ତାଦେର ମନେ ଜାଗେ ଏନ୍ତାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜବାବ ଖୁଜେ ବେଡ଼ାଯ । ବଡ଼ାଦେର କାହିଁ ଥେକେ ପାଞ୍ଚା ଜବାବେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବେଇ—ଏମନଟି ବଲା ଭାର । କେଟେ-ଛେଟେ ନିଜେର ମତୋ ଜବାବ ତୈରି କରେ ନିତେ ଭାଲୋବାସେ ।

ଯା ଅବିଶ୍ୱାସ୍, ତା ବିଶ୍ୱାସ କରେଇ ପାଇ ଦ୍ୱାତି । ଏଇ ଶିଶୁରା ଆବାର ଭାଲୋବାସାର କାଙ୍ଗଳ । ତାଦେର ଭାଲୋବାସାର କ୍ଷମତାଓ ଅସାଧାରଣ । ଶିଶୁଦେର ପ୍ରତି ସାଂଦ୍ରଦେଶର ମନେ ସ୍ଵତଃକୃତ ଭାଲୋବାସା ଥାକେ, ଚିନ୍ତାଶୀଳତାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଅର୍ଜନ କରତେ ପାରେନ ଶିଶୁମନ୍ତରଦ୍ଵେର ଓପର ଅଧିକାର ଏବଂ ତିନି ଯଦି ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ମାନୁସ ହନ, ତାହଲେଇ ପ୍ରକୃତ ଶିଶୁସାହିତ୍ୟ ରଚନା ସମ୍ଭବ । ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ମଧ୍ୟେ ଏହି ଗୁଣ ଛିଲ ।

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଶିଶୁସାହିତ୍ୟ ବାଂଳା ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ । ସବ ମାନୁଷେର ମନେର ମଧ୍ୟେ ତାର ଶୈଶବ ଚାପ ଡୁବ ମେରେ ଥାକେ । ଶିଶୁସାହିତ୍ୟ ତାର ସ୍ଵପ୍ନଭାରାତୁର ଶୈଶବକେ ଜାଗିଯେ ତୋଳେ । ଫଳେ ଶିଶୁସାହିତ୍ୟ ବସନ୍ତଜନଦେରଙ୍କ ଆସ୍ଵାଦ ଓ ଉପଭୋଗ୍ୟ ।

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଆଶି ବହୁରେର ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନେର ପ୍ରାୟ ପୁରୋଟୀଇ ସାହିତ୍ୟ-ସାଧନାୟ ନିବେଦିତ ଛିଲ । ମହଂ ସାହିତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ବଲେଇ ତା'ର କାହେ ଛୋଟରାଓ ବଡ଼ୋ ହୟେ ଉଠେଛେ । ଶିଶୁ ଓ ଶୈଶବ ତା'ର ମନୋଯୋଗ ଲାଭ କରେଛେ ଆଜୀବନ । ନିତାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୟସେ ଜ୍ଞାନଦାନଦିନୀ ଦେବୀର ପରିଚାଳନାୟ ପ୍ରକାଶିତ 'ବାଲକ' ପତ୍ରିକା ଲେଖାର ଭାର ଅନେକଟୀଇ ନିଜେର କାଁଧେ ତୁଳେ ନିଯୋହିଲେନ । ଫଳେ ସୃଷ୍ଟ ହୟେଛେ ଛଡ଼ା ଆର ଗଲ୍ଲେର ପସରା । ଜୀବନେର ଶେଷ ପର୍ବେ ଆରୋ ମନୋଯୋଗ ଆର ଦରଦେର ସଙ୍ଗେ ଶିଶୁସାହିତ୍ୟ ରଚନାୟ ଆଉନିଯୋଗ କରେଛିଲେନ । ଶିକ୍ଷା ବା ନୀତିଜ୍ଞାନ ଦାନ କରା ତାର ଶିଶୁସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଛିଲ ନା—ଫଳେ ଏହିସବ ସୃଷ୍ଟି ଥେକେ ଶିଶୁପାଠକ ସହଜେଇ ଅର୍ଜନ କରେ ଅବାରିତ ଆନନ୍ଦେର ଅନିଃଶେଷ ଝର୍ନାଧାରା, ଯା କଲ୍ପନାର

শক্তি ও সীমানাকে বাড়িয়ে দেয়। এভাবে বাংলা শিশুসাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

রবীন্দ্রনাথের ছোটদের নিয়ে লেখা গল্প বাংলা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ সম্পদ।

বড়োদের জন্যে লেখা গল্পেও অনেক শিশু-কিশোর চরিত্র এসেছে লেখকের জীবনদর্শনকে বাঞ্ছয় করার জন্য। সেইসব লেখায় শৈশবোচিত চাকুল্য, অপত্যস্নেহের প্রগারতা, উড়ন্টচষ্টা মনোভাবের সঙ্গে শিশুর সংবেদনশীল চিন্তকে বেদনাভারাতুর করে তোলার সামাজিক আয়োজনের মর্মাণ্ডিক চালচ্ছিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

শিশুদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মমতায় যিশে থাকে শ্রদ্ধাবোধ—বিকশিত ব্যক্তিত্বের পরিণত মানুষের মতোই শিশু তাঁর কাছে মর্যাদাবান।

লিপিকার গল্পগুলো কৃপকের আড়াল আর বাগভঙ্গির স্থাতন্ত্রে ছোটদের চিন্তে তৈরি করে ক্লপকথার বাতাবরণ। ‘সে’র গল্পগুলোর উন্টটত্ত্ব ও অসংলগ্নতার মধ্যে পরাবান্তবতার ছোঁয়া যেন পাওয়া যায়। শিশুদের চিন্তা-কল্পনার মতো পারম্পর্যহীন বিন্যাস যে-ফ্যান্টাসির জগৎ নির্মাণ করে, তা সঙ্গত কারণেই তাদের একান্ত আপন। ‘গল্পসংলে’র গল্পগুলোতে শিশু মনের সর্বব্যাঙ্গ কৌতুহল, আবেগ-অনুভূতি, ভালোলাগা-মন্দলাগা যেন গল্পের কাঠামোয় রবীন্দ্রনাথের শৈশবস্মৃতির শিখিত উপস্থাপন।

গল্পগুচ্ছের তারাপদ’র চিন্তাঘঢ়ল্যজনিত চলিষ্ঠুতা তার পরিবারের সদস্যদের দুচ্ছিন্নায় ফেললেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত তারাপদ’র প্রতি। আর বলাই, পরিবেশ-সম্পর্কিত সাম্প্রতিক সচেতনতা সৃষ্টির কতো আগে আগাত-তুচ্ছ নগণ্য বৃক্ষের প্রতি ভালোবাসার, তাকে নিজস্ব অঙ্গিত্বের অবিছেদ্য অঙ্গে পরিণত করার মধ্য দিয়ে যে সুবেদী চিন্তের পরিচয় দিয়েছে, তার কোনো তুলনা নেই। মাতৃহীন বলাই বৃক্ষের সবুজ ছায়া থেকেই জীবনের অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করত। এ বলাই আমাদের পরিচিত জগতেরই একজন। বলাইরা না-থাকলে সভ্যতা এগিয়ে যাবে ধৰ্মসের দিকে।

ছোটদের নিজস্ব জগতের, এমন কী মনোজগতের ছবি, তাদের চাওয়া-পাওয়া সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার ছবি এইসব গল্পে খুঁজে পাওয়া যায় বলে তা তাদের প্রিয় হয়ে ওঠে। মানুষকে আত্মনির্মাণ করতে হয়। তা না-হলে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না। আত্মনির্মাণের জন্য একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের ছোটদের নিয়ে লেখা এবং ছোটদের জন্যে লেখা গল্পগুলো পাঠের মধ্য দিয়ে যে-কোনো পাঠকই নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন। ছোটদের জন্যে তো তা অপরিহার্য।

# সূচী পত্র

## গল্পগুচ্ছ

- পেটমাটার ৯
- রামকানাইয়ের নির্বৃদ্ধিতা ১৪
- খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন ১৯
- কাবুলিওয়ালা ২৬
- ছুটি ৩৪
- অতিথি ৪০
- ইচ্ছাপূরণ ৪৫
- বলাই ৬০

## সে

- সে ৬৭
- গেছো বাবা ৭৮

## গল্পসম্প্রদায়

- বিজ্ঞানী ১৪৩
- রাজার বাড়ি ১৪৭
- বড়ো খবর ১৫০
- রাজরানী ১৫৫
- মুনশি ১৫৯
- ম্যাজিশিয়ান ১৬২
- পরী ১৬৫
- আরো-সত্য ১৬৬
- ম্যানেজার বাবু ১৬৯
- বাচস্পতি ১৭২
- পান্নালাল ১৭৫
- চন্দনী ১৭৭
- ধূংস ১৮১
- ভালো মানুষ ১৮৩
- মৃগকৃতলা ১৮৬

## লিপিকা

- পরীর পরিচয় ১৮৯
- রাজপুত্র ১৯৩
- সুয়োরানীর সাধ ১৯৬
- কর্তার ভূত ১৯৯
- তোতাকাহিনী ২০২
- নতুন পুতুল ২০৫



## পোষ্ট্মাস্টার

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোষ্ট্মাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নৃতন পোষ্টাপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোষ্ট্মাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয়, এই গুণগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোষ্ট্মাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অঙ্ককার আটচালার মধ্যে তাহার আপিস; অদূরে একটি পানাপুরুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধৃত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তরুপন্থবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়—কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপন্থব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুক্ষ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোষ্ট্মাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিত্তমাত্রার অনাথা বালিকা তাহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাটুলের দল খোল-করতাল বাজাইয়া উচৈঁচুরে গান জুড়িয়া দিত—যখন অঙ্ককার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জুলিয়া পোষ্ট্মাস্টার ডাকিতেন—“রতন।” রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না; বলিত, “কি গা বাবু, কেন ডাকছ।”

পোষ্টমাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনই চুলো ধরাতে যেতে হবে—হেঁশেলের—

পোষ্টমাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন—একবার তামাকটা সেজে দে তো। অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোষ্টমাস্টার ফস্ করিয়া জিঞ্জাসা করেন, “আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে ?” সে অনেক কথা; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশি ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশৃঙ্খ করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারই মধ্যে দৈবাৎ দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্গিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোষ্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটোভাই ছিল—বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল—অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশি উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বেশি রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোষ্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসি ব্যঙ্গন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত—তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোষ্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন—ছোটোভাই মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উথাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশ্যে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাহার ঘরের লোকদিগকে মা দিদি দাদা বলিয়া চির-পরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন-কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাহাদের কাঞ্চনিক মূর্তি ও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তঙ্গ সুকোমল বাতাস দিতেছিল; রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উঠিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল, যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিষ্পাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে; এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমন্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করঞ্চন্দের বার বার আবস্থি করিতেছিল। পোষ্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না—সেদিনকার বৃষ্টিধোত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশৰ্ক স্ত্রপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোষ্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত—হৃদয়ের সহিত একান্ত সংলগ্ন একটি ম্লেহপূর্ণলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ঐ

কথাই বার বার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুজ্ঞানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পদ্মবর্মরের অর্থও কতকটা ঐরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিষ্ঠক মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিষ্ঠাস ফেলিয়া ডাকিলেন, “রতন।” রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কষ্টস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “দাদাবাবু, ডাকছ?” পোস্টমাস্টার বলিলেন, “তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।” বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া ‘স্বরে অ’ ‘স্বরে আ’ করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণ মাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহনিষি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ—নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন—বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল—‘রতন’। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, “দাদাবাবু, ঘুমোচ্ছিলে?” পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, “শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না—দেখ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।”

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তঙ্গ ললাটের উপর শাখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় ম্বেহময়ী নারী-রূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে, এবং এ স্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারাবাত্র শিয়ারে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।”

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্থাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাত কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনক্ষভাবে চোকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায়

শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিঠে তাহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সক্ষ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, “দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে ?”

পোষ্টমাস্টার বলিলেন, “রতন, কালই আমি যাচ্ছি।”

রতন। কোথায় যাচ্ছ, দাদাবাবু।

পোষ্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে।

পোষ্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোষ্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঙ্গল হইয়াছে; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিট্রিট্র করিয়া প্রদীপ জুলিতে লাগিল এবং এক স্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপ্টপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে ঝুঁটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চট্টপট্ট হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোষ্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে ?”

পোষ্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, “সে কী করে হবে।” ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোষ্টমাস্টারের হাস্যধনির কঠুন্দ বাজিতে লাগিল—‘সে কী করে হবে।’

ভোরে উঠিয়া পোষ্টমাস্টার দেখিলেন, তাহার স্নানের জল ঠিক আছে; কলিকাতার অভ্যাস-অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভূর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, “রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মতন যত্ন করবেন; আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।” এই কথাগুলি যে অত্যন্ত মেহগর্ত এবং দয়াদুর্ধ হৃদয় হইতে উঠিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভূর অনেক তিরকার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে

কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, “না, না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।”

পোষ্ট্মাস্টার রতনের একপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নৃতন পোষ্ট্মাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোষ্ট্মাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, “রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিন কয়েক চলবে।”

কিছু পথখরচা বাদে তাহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধূলায় পড়িয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না”—বলিয়া এক-দৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোষ্ট্মাস্টার নিষ্পাস ফেলিয়া হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেটেরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ধাবিক্ষারিত নদী ধরণীর উচ্চলিত অশ্বরাশির মতো চারি দিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, ‘ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রেড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি’—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ধার স্নোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শুশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তন্ত্রের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তন্ত্রের উদয় হইল না। সে সেই পোষ্ট্মাপিস গৃহের চারি দিকে কেবল অশ্বজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে—সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভাস্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিষ্পাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুধিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভাস্তিপাশে পড়িবার জন্য চিন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

## রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা

যাহারা বলে, গুরুচরণের মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সংসারটি অন্তঃপুরে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাহারা বিশ্বনিন্দুক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে। আসলে গৃহিণী তখন এক পায়ের উপর বসিয়া দ্বিতীয় পায়ের হাঁটু চিবুক পর্যন্ত উঠিত করিয়া কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্ঘা এবং চিংড়িমাছের ঝাল-চচড়ি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পাস্তাভাত খাইতেছিলেন। বাহির হইতে যখন ডাক পড়িল তখন শূপাকৃতি চর্বিত জঁটা এবং নিঃশেষিত অনুপ্রাপ্তি ফেলিয়া গঞ্জারমুখে কহিলেন, “দুটো পাস্তাভাত যে মুখে দেব, তারও সময় পাওয়া যায় না।”

এ দিকে ডাঙ্গার যখন জবাব দিয়া গেল তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, “দাদা, যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে তো বলো।” গুরুচরণ শ্রীণন্দে বলিলেন, “আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও।” রামকানাই কাগজ কলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গুরুচরণ বলিয়া গেলেন, “আমার স্থাবর অস্থাবর সমন্ত বিষয়সম্পত্তি আমার ধর্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম।” রামকানাই লিখিলেন, কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না। তাঁহার বড়ো আশা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ অপুত্রক জ্যাঠামহাশয়ের সমন্ত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগন্ন ছিলেন তথাপি এই আশায় নবদ্বীপের মা নবদ্বীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই, এবং সকাল-সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শক্রর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গুরুচরণ নিজীবহন্তে যাহা সই করিলেন তাহা কতকগুলা কম্পিত বক্ররেখা কি তাঁহার নাম, বুঝা দুঃসাধ্য।

পাস্তাভাত খাইয়া যখন শ্রী আসিলেন তখন গুরুচরণের বাকরোধ হইয়াছে দেখিয়া শ্রী কান্দিতে লাগিলেন। যাহারা অনেক আশা করিয়া বিষয় হইতে বক্ষিত হইয়াছে তাহারা বলিল ‘মায়াকান্না’। কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল; বলিল, “মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়। এমন সোনার-চাঁদ ভাইপো থাকিতে —”

রামকানাই যদিও শ্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন—এত অধিক যে তাহাকে ভাষ্যন্তরে ভয় বলা যাইতে পারে—কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, “মেজোবউ, তোমার তো বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন? দাদা গেলেন, এখন আমি তো রহিয়া গেলাম, তোমার যা-কিছু

বক্তব্য আছে অবসরমত আমাকে বলিয়ো, এখন ঠিক সময় নয়।”

নবদ্বীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল তখন তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবদ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে শাসাইয়া কহিল, “দেখিৰ মুখাগ্নি কে করে—এবং শ্রান্কশাস্তি যদি কৰি তো আমার নাম নবদ্বীপ নয়।” গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাতে তার বিশেষ পরিত্পত্তি ছিল। লোকে যদি তাহাকে ক্রিশ্চান বলিত, সে জিভ কাটিয়া বলিত, “রাম, আমি যদি ক্রিশ্চান হই তো গোমাংস খাই।” জীবিত অবস্থায় যাহার এই দশা, সদ্যোমৃত অবস্থায় সে-যে পিণ্ডাশ-আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিতিমত ইহা ছাড়া আর-কোনো প্রতিশোধের পথ ছিল না। নবদ্বীপ একটা সান্তুনা পাইল যে, লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে। যতদিন ইহলোকে থাকা যায় জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনোক্রমে পেট চলিয়া যায়, কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যে-লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিয়া পিণ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক সুবিধা আছে।

রামকানাই বরদাসুন্দরীর নিকট গিয়া বলিলেন, “বউঠাকুরানী, দাদা তোমাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাহার উইল। লোহার সিন্দুকে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়ো।”

বিধবা তখন মুখে মুখে দীর্ঘ পদ রচনা করিয়া উচৈ়স্বরে বিলাপ করিতেছিলেন, দুই-চারিজন দাসীও তাহার সহিত স্বর মিলাইয়া মধ্যে মধ্যে দুই-চারটা নৃতন শব্দ যোজনাপূর্বক শোকসংগৃতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দূর করিতেছিল। মাঝে হইতে এই কাগজখণ্ড আসিয়া এক প্রকার লয়ভঙ্গ হইয়া গেল এবং ভাবেরও পূর্বাপর যোগ রাখিল না। ব্যাপারটা নিম্নলিখিত-মতো অসংলগ্ন আকার ধারণ করিল।

“ওগো, আমার কী সর্বনাশ হল গো, কী সর্বনাশ হল। আচ্ছা, ঠাকুরপো, লেখাটা কার। তোমার বুঝি? ওগো, তেমন যত্ন করে আমাকে আর কে দেখবে, আমার দিকে কে মুখ তুলে চাইবে গো।—তোরা একটুকু থাম, মেলা চেঁচাস নে, কথাটা শুনতে দে। ওগো, আমি কেন আগে গেলুম না গো—আমি কেন বেঁচে রইলুম।” রামকানাই মনে মনে নিষ্কাস ফেলিয়া বলিলেন, ‘সে আমাদের কপালের দোষ।’

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবদ্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া পড়িলেন। বোঝাই-গাড়িসমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ যেমন নিরূপায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেকক্ষণ চূপ করিয়া সহ্য করিলেন—অবশ্যে কাতরস্বরে কহিলেন, “আমার অপরাধ কী। আমি তো দাদা নই।”

নবদ্বীপের মা ফোস্ক করিয়া উঠিয়া বলিলেন, “না, তুমি বড়ো ভালো মানুষ, তুমি কিছু বোঝ না; দাদা বললেন, ‘লেখো’, ভাই অমনি লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান। তুমিও সময়কালে ঐ কীর্তি করবে বলে বসে আছ। আমি মলেই কোন পোড়ারমুখী ডাইনীকে ঘরে আনবে—আর আমার সোনার চাঁদ নবদ্বীপকে পাথারে ভাসাবে। কিন্তু সেজন্যে ভেবো না, আমি শিগ্গির মরছি নে।”

এইরূপে রামকানাইয়ের ভাবী অত্যাচার আলোচনা করিয়া গৃহিণী উত্তরোন্তর অধিকতর অসমিষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রামকানাই নিশ্চয় জানিতেন, যদি এই-সকল উৎকট কাল্পনিক আশঙ্কা নিবারণ-উদ্দেশে ইহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন তবে হিতে বিপরীত হইবে। এই ভয়ে অপরাধীর মতো চুপ করিয়া রাখিলেন—যেন কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন, যেন তিনি সোনার নবদ্বীপকে বিষয় হইতে বাধিত করিয়া তাহার ভাবী দ্বিতীয়পক্ষকে সমস্ত লিখিয়া দিয়া মরিয়া বসিয়া আছেন, এখন অপরাধ স্বীকার না করিয়া কোনো গতি নাই।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপ তাহার বুদ্ধিমান বন্ধুদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, “কোনো ভাবনা নাই। এ বিষয় আমিই পাইব। কিছুদিনের মতো বাবাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভগ্ন হইয়া যাইবে।” নবদ্বীপের বাবার বুদ্ধিসুদ্ধির প্রতি নবদ্বীপের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না; সুতরাং কথাটা তাঁরও যুক্তিযুক্ত মনে হইল। অবশ্যে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্বোধ কর্মনাশা বাবা একটা যেমন-তেমন ছল করিয়া কিছুদিনের মতো কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

অঞ্জদিনের মধ্যে বরদাসুন্দরী এবং নবদ্বীপচন্দ্র পরম্পরের নামে উইলজালের অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত হইল। নবদ্বীপ তাহার নিজের নামে যে-উইলখানি বাহির করিয়াছে তাহার নামসহি দেখিলে গুরুচরণের হস্তাক্ষর স্পষ্ট প্রমাণ হয়; উইলের দুই-একজন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাসুন্দরীর পক্ষে নবদ্বীপের বাপ একমাত্র সাক্ষী, এবং সহি কারও বুঝিবার সাধ্য নাই। তাহার গৃহপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল; সে বলিল, “দিদি, তোমার ভাবনা নাই। আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরো সাক্ষ্য জুটাইব।”

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল তখন নবদ্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদ্রলোকটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন-কি, কিঞ্চিৎ রসালাপ করিবারও চেষ্টা করিলেন, জোড়হস্তে সহায়ে বলিলেন, “গোলাম হাজির, এখন মহারানীর কী অনুমতি হয়।”

গৃহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “নেও নেও, আর রঙ করতে হবে না। এতদিন ছুতো করে কাশীতে কাটিয়ে এলেন, একদিনের তরে তো মনে পড়ে নি!” ইত্যাদি।

এইরূপে উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরম্পরের নামে আদরের অভিযোগ আনিতে লাগিলেন—অবশ্যে নালিশ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া জাতিতে গিয়া পৌছিল—নবদ্বীপের মা পুরুষের ভালোবাসার সহিত মুসলমানের মুরগি-বাংসল্যের তুলনা করিলেন। নবদ্বীপের বাপ বলিলেন, ‘রমণীর মুখে মধু, হৃদয়ে ক্ষুর’—যদিও এই মৌখিক মধুরতার পরিচয় নবদ্বীপের বাপ কবে পাইলেন, বলা শক্ত।

ইতিমধ্যে রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন।

অবাক হইয়া যখন তাহার মর্মগুহণের চেষ্টা করিতেছেন তখন নবদ্বীপের মা আসিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন, হাড়জুলানী ডাকিনী কেবল যে বাছা নবদ্বীপকে তাহার শ্রেষ্ঠীল জ্যাঠার ন্যায় উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায় তাহা নহে, আবার সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে!

অবশ্যে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া রামকানাইয়ের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। উচ্চেঃস্থরে বলিয়া উঠিলেন, “তোরা এ কী সর্বনাশ করিয়াছিস।” গৃহিণী ক্রমে নিজমূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, “কেন, এতে নবদ্বীপের দোষ হয়েছে কী। সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে!”

কোথা হইতে এক চক্ষুবাদিকা, ভর্তাৰ পৰমায়ুহন্তী, অষ্টকুষ্ঠীৰ পুত্ৰী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে ইহা কোন্ সৎকুলপ্রদীপ কলকচন্ত্র সন্তান সহ্য করিতে পারে! যদি-বা মৰণকালে এবং ডাকিনীৰ মন্ত্রগুণে কোনো-এক মৃচ্মতি জ্যোষ্ঠতাতেৰ বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে, তবে সুবৰ্ণময় ভাতুপ্পুত্র সে ভৰ্ম নিজহস্তে সংশোধন করিয়া লইলে এমনি কী অন্যায় কাৰ্য হয়!

হতবুদ্ধি রামকানাই যখন দেখিলেন তাহার স্তৰী পুত্ৰ উভয়ে মিলিয়া কখনো-বা তর্জনগৰ্জন কখনো-বা অশ্রুবিসৰ্জন করিতে লাগিলেন, তখন ললাটে কৰাঘাত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্যন্ত স্পর্শ করিলেন না।

এইৱ্ব দুই দিন নীৱবে অনাহারে কাটিয়া গেল, মকদ্দমার দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ বৰদাসুন্দৱীৰ মামাতো ভাইটিকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বশ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে নবদ্বীপের পক্ষে সাফ্য দিল। জয়শ্রী যখন বৰদাসুন্দৱীকে ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে যাইবার আয়োজন করিতেছে তখন রামকানাইকে ডাক পড়িল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শুক্রগুণ শুক্ররসনা বৃদ্ধ কল্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমন্ত্বেৰ কাঠগড়া চাপিয়া ধৰিলেন। চতুর ব্যারিষ্টাৰ অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহিৰ কৰিয়া লইবার জন্য জেৱা কৰিতে আৱস্থ কৰিলেন—বহুদূর হইতে আৱস্থ কৰিয়া সাবধানে অতি ধীৱ বৰ্কগতিতে প্ৰসঙ্গেৰ নিকটবৰ্তী হইবাৰ উদ্যোগ কৰিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজেৱ দিকে ফিরিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, “হজুৱ, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুৰ্বল। অধিক কথা কহিবাৰ সামৰ্থ্য নাই। আমাৱ যা বলিবাৰ সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমাৱ দাদা স্বর্গীয় শুক্রচৱণ চক্ৰবৰ্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাহার পত্নী শ্রীমতী বৰদাসুন্দৱীকে উইল কৰিয়া দিয়া যান। সে উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষৰ কৰিয়াছেন। আমাৱ পুত্ৰ নবদ্বীপচন্দ্ৰ যে উইল দাখিল কৰিয়াছেন তাহা মিথ্যা।” এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিস্টার সকৌতুকে পার্শ্ববর্তী অ্যাটর্নি'কে বলিলেন, “বাই জোভ! লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম।”

মামাতো ভাই ছুটিয়া গিয়া দিনিকে বলিল, “বুড়ো সমস্ত মাটি করিয়াছিল — আমার সাক্ষে মকদ্দমা রক্ষা পায়।”

দিনি বলিলেন, “বটে! লোক কে চিনতে পারে। আমি বুড়োকে ভালো বলে জানতুম।” কারাবরঞ্চ নবদ্বীপের বুদ্ধিমান বন্দুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে; সাক্ষীর বাস্ত্রের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই; এমনতরো আন্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রামকানাইয়ের কঠিন বিকার-জুর উপস্থিত হইল। প্রলাপে পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই নির্বোধ, সর্বকর্মপওকারী, নবদ্বীপের অনাবশ্যক বাপ পৃথিবী হইতে অপস্ত হইয়া গেল; আজীয়দের মধ্যে কেহ কেহ কহিল ‘আর কিছুদিন পূর্বে গোলেই ভালো হইত’—কিন্তু তাহাদের নাম করিতে চাহি না।

## খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

### প্রথম পরিচ্ছেদ

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিঙ্গ ছিপছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক-বৎসর-বয়স একটি শিশুর বন্ধন ও পালন কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালজুমে রাইচরণের কঙ্ক ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুসেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনো তাহার ভূত্য।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে; মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নৃতন কর্তীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্তী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নৃতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মান্ত করিয়াছে—এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরঞ্জ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিণ করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন-সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিলখিল হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, “মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।”

পৃথিবীতে আর-কোনো মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসভ্য চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশ্যে শিশু যখন টল্মল করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিটি, এবং রাইচরণকে চন্দ্ৰ বলিয়া সম্ভাবণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্দ্ৰ।' বাস্তবিক, শিশুর মাথায় এ বৃদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শুক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই একুপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তিসম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত — আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপুল বাধিত।

এই সময়ে অনুকূল পঞ্চাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকূল তাহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রামে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনবাট জলে ডুবিয়া গেল। পাড়-ভাঙ্গার অবিশ্রাম ঝুপ্বাপ্ত শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্নে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই—মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সৃষ্টান্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিষ্ঠদ্বন্দ্বের মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "চন্দ্ৰ, ফু।"

অনতিদূরে সজল পঞ্চল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ববন্ধের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্বফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুকন্দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই-চারিদিন হইল, রাইচরণ কাঠি দিয়া বিন্ধ করিয়া তাহাকে কদম্বফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে, সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙ্গিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্দ্ৰ প্রবৃত্তি হইল না—তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "দেখো, দেখো ও—ই দেখো পাখি, ওই উড়ে—এ গেল। আয় রে পাখি; আয় আয়।" এইরূপ অবিশ্রাম্য বিচ্ছিন্ন কলরব

করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঢেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এন্নপূর্ণামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা—বিশেষত চারি দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাঞ্চনিক পাখি লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, “তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট করে ফুল তুলে আনছি। খবরদার, জলের ধারে যেয়ো না।” বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ববৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ঐ-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খলখল ছলছল করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন-এক বৃক্ষ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশু-প্রবাহ সহাস্য কলম্বরে নিষিঙ্ক স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল—একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল—দুরস্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহবান করিল।

একবার ঘপ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ষ ধোঁয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, “বাবু—খোকাবাবু—লঙ্ঘী দাদাবাবু আমার!”

কিন্তু চন্দ্ৰ বলিয়া কেহ উন্নত দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কষ্ট হাসিয়া উঠিল না। কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছলছল খলখল করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই-সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকর্ষিত জননী চারি দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লঞ্চন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশিথের ঝোড়ে বাতাসের মতো সমস্ত ক্ষেত্রময় “বাবু—খোকাবাবু আমার” বলিয়া ভগ্নকষ্টে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশ্যে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম করিয়া মাঠাকুরুনের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় থাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, “জানি নে, মা।”

যদিও সকলেই মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি প্রামের আস্তে যে একদল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরুনীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে;

এমন-কি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, “তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে—তুই যত টাকা চাস তোকে দেব।” শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু তাহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, “কেন? তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।”

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তা নাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে বৎসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিকবয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সংবরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্যুৎ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশিদিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন-কি, ইহার কঢ়স্বর হাস্যক্রমনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত, রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত; মনে হইত, দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্না—রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্না— যথাসময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল—‘তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।’

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল, প্রথমত, সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টল্মলু করিয়া চলে, এবং পিসিকে পিসি বলে। যে-সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে।

তখন মাঠাকর্তনের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল—আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, ‘আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।’ তখন, এতদিন শিশুকে যে অ্যত্ব করিয়াছে সেজন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে

বড়ো ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্তুরির গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না—রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্নতবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্নার যথন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমষ্টি বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বছকচ্ছে একটি চাকরি জোগাড় করিয়া ফেল্নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো থাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে চুক্তি করিত না। মনে মনে বলিত, ‘বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ত্ব হইবে, তা হইবে না।’

এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে-শুনে ভালো এবং দেখিতে-শুনিতেও বেশ, হাটপুট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং শৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর-একটি দোষ ছিল—সে যে ফেল্নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত, এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত; এবং ফেল্নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ঠিক বাপের মতো নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায়—কিন্তু যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এদিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্না আজকাল বসন্তূষ্যমের অভাব লইয়া সর্বদাই খুঁতখুঁত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাতে কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল, “আবশ্যিক পড়িয়াছে, আমি কিছুদিনের মতো দেশে যাইতেছি।” এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূলবাবু তখন সেখানে মুসেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্তা একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তানকামনায় বহুমূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ

কিনিতেছেন— এমন সময় প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল, “জয় হোক, মা !”

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে রে ?”

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, ‘আমি রাইচরণ ।’

বৃন্দকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্বান হাস্য করিয়া কহিল, “মাঠাকরুণকে একবার প্রণাম করিতে চাই ।”

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুণ রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদুর করিলেন না— রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া জোড়হষ্টে কহিল, “প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মা ও নয়, আর কেহও নয়, কৃত্য অধম এই আমি—”

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, “বলিস কী রে। কোথায় সে ।”

“আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরম্পরাং আনিয়া দিব ।”

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে শ্রীপুরূষ দুইজনে উনুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেলুনাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনুকূলের শ্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘাণ লইয়া, অত্তঙ্গনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কানিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক ছেলেটি দেখিতে বেশ—বেশভূষা আকার প্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব। দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহস্রা মেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোনো প্রমাণ আছে?”

রাইচরণ কহিল, “এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।”

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার শ্রী যেকুপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনই হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে। এবং বৃন্দ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে।

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন, “কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।”

ରାଇଚରଣ କରିବୋଟେ ଗନ୍ଧଗଦ୍ କଟେ ବଲିଲ, “ପ୍ରଭୁ, ବୃଦ୍ଧବସ୍ୟରେ କୋଥାଯା ଯାଇବ ।”

କର୍ତ୍ତା ବଲିଲେନ, “ଆହା, ଥାକ୍ । ଆମାର ବାହାର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏକ । ଓକେ ଆମି ମାର୍କ କରିଲାମ ।”

ନ୍ୟାୟପରାଯଣ ଅନୁକୂଳ କହିଲେନ, “ଯେ କାଜ କରିଯାଛେ ଉହାକେ ମାପ କରା ଯାଯା ନା ।”

ରାଇଚରଣ ଅନୁକୂଳର ପା ଜଡ଼ାଇୟା କହିଲ, “ଆମି କରି ନାଇ, ଦେଖିବ କରିଯାଛେନ ।”

ନିଜେର ପାପ ଦୈଶ୍ୟରେ କୁକୁର ଚାପାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଦେଖିଯା ଅନୁକୂଳ ଆରୋ ବିରକ୍ତ ହିୟ କହିଲେନ, “ଯେ ଏମନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର କାଜ କରିଯାଛେ ତାହାକେ ଆର ବିଶ୍ୱାସ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଯ ।”

ରାଇଚରଣ ପ୍ରଭୁର ପା ଛାଡ଼ିଯା କହିଲ, “ସେ ଆମି ନଯ, ପ୍ରଭୁ ।”

“ତବେ କେ ।”

“ଆମାର ଅନୁକୂଳ ।”

କିନ୍ତୁ ଏକପ କୈଫିୟତେ କୋନୋ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେର ସନ୍ତୋଷ ହିୟେ ପାରେ ନା ।

ରାଇଚରଣ ବଲିଲ, “ପୃଥିବୀତେ ଆମାର ଆର କେହ ନାଇ ।”

ଫେଲନା ଯଥନ ଦେଖିଲ, ସେ ମୁସେଫେର ସନ୍ତାନ, ରାଇଚରଣ ତାହାକେ ଏତଦିନ ଚୁରି କରିଯା ନିଜେର ଛେଲେ ବଲିଯା ଅପମାନିତ କରିଯାଛେ, ତଥନ ତାହାର ମନେ ମନେ କିଛୁ ରାଗ ହିୟିଲ । କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଉଦାରଭାବେ ପିତାକେ ବଲିଲ, “ବାବା, ଉହାକେ ମାପ କରୋ । ବାଢ଼ିତେ ଥାକିତେ ନା ଦାଓ, ଉହାର ମାସିକ କିଛୁ ଟାକା ବରାଦ କରିଯା ଦାଓ ।”

ଇହାର ପର ରାଇଚରଣ କୋନୋ କଥା ନା ବଲିଯା ଏକବାର ପୁତ୍ରେର ମୁଖ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଲ, ସକଳକେ ପ୍ରଣାମ କରିଲ; ତାହାର ପର ଦ୍ୱାରେର ବାହିର ହିୟା ପୃଥିବୀର ଅଗଣ୍ୟ ଲୋକେର ମଧ୍ୟେ ମିଶିଯା ଗେଲ । ମାସାନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ଯଥନ ତାହାର ଦେଶେର ଠିକାନାୟ କିଞ୍ଚିତଃବୃତ୍ତି ପାଠାଇଲେନ ତଥନ ସେ ଟାକା ଫିରିଯା ଆସିଲ । ଦେଖାନେ କୋନୋ ଲୋକ ନାଇ ।

## কাবুলিওয়ালা

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোটো মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না করিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত ঘোনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধরে দিয়া তাহার মুখ বদ্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে, সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এইজন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকালবেলায় আমার নভেলের সন্তুষ্টি পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, “বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বলছিল, সে কিছু জানে না। না?”

আমি পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। “দেখো বাবা, ভোলা বলছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে, তাই বৃষ্টি হয়। মা গো, ভোলা এত মিছিমিছি বকতে পারে! কেবলই বকে, দিনরাত বকে।”

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাতে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, “বাবা, মা তোমার কে হয়।”

মনে মনে কহিলাম, শ্যালিকা; মুখে কহিলাম, “মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা করুণে যা। আমার এখন কাজ আছে।”

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতিদ্রুত উচ্চারণে আগড়ুম-বাগড়ুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সন্তুষ্টি পরিচ্ছেদে প্রতাপসিংহ তখন কাঞ্চনমালাকে লইয়া অক্ষকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্তী নদীর জলে ঝাপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাতে মিনি আগড়ুম-বাগড়ুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, “কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা।”

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুই-চার আঙুরের বাল্ব, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল— তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরণ ভাবেদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে উর্ধ্বশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনই ঝুলি

ঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সন্দেশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু, মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল অমনি সে উর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অঙ্গ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ঐ বুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এ দিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল — আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপসিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভালো হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, ঝুঁস, ইংরাজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষণনীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবেশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু, তোমার লড়কী কোথায় গেল।”

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙ্গাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম — সে আমার গা ঘেঁষিয়া কাবুলির মুখ এবং বুলির দিকে সন্দিপ্ত নেতৃত্বে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি বুলির মধ্য হইতে কিস্মিস খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় আবশ্যকবশত বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি ঘুরের সমীপস্থ বেঁধির উপর বসিয়া অর্ণব কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁশলা বাল্লায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম-কিস্মিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, “উহাকে এ-সব কেন দিয়াছ। অমন আর দিয়ো না।” বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসংকোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া বুলিতে পুরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ঘোলো-আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চক্ককে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্সনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “তুই এ আধুলি কোথায় পেলি।”

মিনি বলিতেছে, “কাবুলিওয়ালা দিয়েছে।”

তাহার মা বলিতেছেন, “কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি।”

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, “আমি চাই নি, সে আপনি দিলে ।”

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম ।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেন্টাবাদাম ঘৃষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র লুক হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে ।

দেখিলাম, এই দুটি বস্তুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে বর যথা রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, “কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও বুলির ভিতর কী ।”

রহমত একটা অনাবশ্যক চল্লবিলু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, “হাঁতি ।”

অর্থাৎ, তাহার বুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে এইটেই তাহার পরিহাসের সূক্ষ্ম মর্ম । খুব যে বেশি সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিত — এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত ।

উহাদের মধ্যে আরো-একটা কথা প্রচলিত ছিল । রহমত মিনিকে বলিত, “খোঁচী, তোমি সসুরবাড়ি কখনু যাবে না !”

বাঙালির ঘরের মেয়ে আজন্মকাল ‘শুশুরবাড়ি’ শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু একেলে ধরনের লোক হওয়াতে শিশু মেয়েকে শুশুরবাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই । এইজন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না । অথচ কথাটার একটা কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত, “তুমি শুশুরবাড়ি যাবে ?”

রহমত কাল্পনিক শুশুরের প্রতি প্রকাও মোটা মুষ্টি আঙ্কালন করিয়া বলিত, “হামি সসুরকে মারবে ।”

শুনিয়া মিনি শুশুর-নামক কোনো-এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত ।

এখন শুভ শরৎকাল । প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন । আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখনো কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেইজন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘূরিয়া বেড়ায় । আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্বদা মন কেমন করে । একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিন্ত ছুটিয়া যায়, তেমনি বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয়, এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে ।

এ দিকে আবার আমি এমনি উদ্বিজ্ঞপ্তুর্তি যে, আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্জ্বাপ্ত হয় । এইজন্য সকালবেলায় আমার ছোটো

ঘরে টেবিলের সামনে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুই ধারে বদ্ধুর দুর্গম দক্ষ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সংকীর্ণ মরুপথ, বোঝাই-করা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে; পাগড়িপরা বণিক ও পথিকেরা কেহ-বা উটের 'পরে, কেহ-বা পদব্রজে; কাহারও হাতে বর্ণা, কাহারও হাতে সেকেলে চক্মকি-ঠোকা বন্দুক—কাবুলি মেঘমন্ত্রে ভাঙা বাংলায় স্বদেশের গল্প করিত আর এই ছবি আমার চোখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শক্তি স্বভাবের লোক; রান্তায় একটা শব্দ শুনিলে তাহার মনে হয়, পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া ওঁয়োপোকা আরশোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ এতদিন (খুব বেশিদিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বার বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি তাহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন, “কখনো কি কাহারও ছেলে চুরি যায় না। কাবুলদেশে কি দাস-ব্যাবসা প্রচলিত নাই। একজন প্রকাণ কাবুলির পক্ষে একটি ছোটো ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারেই কি অস্ত্ব।”

আমাকে মানিতে হইল, ব্যাপারটা যে অস্ত্ব তাহা নহে, কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এইজন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমতকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমত দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাঞ্চানার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড়ো ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয়, কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন একটা ঘড়্যন্ত চলিতেছে। সকালে যেদিন আসিতে পারে না সেদিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে। অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই চিলেচালা-জামা-পায়জামা পরা সেই ঝোলাঝুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কিন্তু, যখন দেখি মিনি ‘কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা’ করিয়া হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বদ্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোটো ঘরে বসিয়া প্রফুল্লিট সংশোধন করিতেছি। বিদ্যায় লইবার পূর্বে আজ দুই-তিন দিন হইতে শীতটা খুব কন্কনে হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে; বেলা বোধ করি আটটা হইবে, মাথায়-গলাবন্ধ-জড়ানো উষাচরণগণ

প্রাতঃভূমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে—তাহার পশ্চাতে কৌতুহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গত্বস্ত্রে রঙচিহ্ন এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রঙজাঙ্গ ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিং ধারিত—মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অঙ্গীকার করে এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে, এমন সময় ‘কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা’ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার ক্ষক্ষে আজ ঝুলি ছিল না, সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যন্ত আলোচনা হইতে পারিল না। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?”

রহমত হাসিয়া কহিল, “সিখানেই যাচ্ছে।”

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল, “সসুরাকে মারিতাম, কিন্তু কী করিব, হাত বাঁধা।”

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যন্তমত নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষ্যাপন করিতেছে, তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চঞ্চলহৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিশ্বৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাঢ়িয়া উঠিতে লাগিল ততই সখার পরিবর্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল। এমন-কি, এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি তো তাহার সহিত একপ্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর-একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যে তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অঙ্গকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নৃতন ধৌত

ରୌଦ୍ର ଯେନ ସୋହାଗାୟ-ଗଲାନୋ ନିର୍ମଳ ସୋନାର ମତୋ ରଙ୍ଗ ଧରିଯାଛେ । ଏମନ-କି, କଲିକାତାର ଗଲିର ଭିତରକାର ଇଷ୍ଟକର୍ଜର୍ଜର ଅପରିଚିତ ସେଁଥାରେସି ବାଡ଼ିଶୁଲିର ଉପରେଣ ଏହି ରୌଦ୍ରେର ଆଭା ଏକଟି ଅପରିଚିତ ଲାବଣ୍ୟ ବିନ୍ଦୁର କରିଯାଛେ । ଆମାର ଘରେ ଆଜ ରାତ୍ରି ଶେଷ ହିତେ ନା ହିତେ ସାନାଇ ବାଜିତେଛେ । ସେ ବାଁଶି ଯେନ ଆମାର ବୁକେର ପଞ୍ଜରେର ହାଡ଼େର ମଧ୍ୟ ହିତେ କାନ୍ଦିଯା କାନ୍ଦିଯା ବାଜିଯା ଉଠିତେଛେ । କରୁଣ ତୈରବୀ ରାଗିଣୀତେ ଆମାର ଆସନ୍ତି ବିଚ୍ଛେଦବ୍ୟଥାକେ ଶରତେର ରୌଦ୍ରେର ସହିତ ସମ୍ମତ ବିଶ୍ଵଜଗନ୍ମଯ ବ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଯା ଦିତେଛେ । ଆଜ ଆମାର ମିନିର ବିବାହ ।

ସକାଳ ହିତେ ଭାରି ଗୋଲମାଲ, ଲୋକଜନେର ଆନାଗୋନା । ଉଠାନେ ବାଁଶ ବାଧିଯା ପାଲ ଖାଟାନୋ ହିତେଛେ; ବାଡ଼ିର ଘରେ ଘରେ ଏବଂ ବାରାନ୍ଦାଯ ଝାଡ଼ ଟାଙ୍ଗାଇବାର ଠୁଠାଂ ଶବ୍ଦ ଉଠିତେଛେ; ହାକଡାକେର ସୀମା ନାଇ ।

ଆମି ଆମାର ଲିଖିବାର ଘରେ ବସିଯା ହିସାବ ଦେଖିତେଛି, ଏମନ ସମୟ ରହମତ ଆସିଯା ସେଲାମ କରିଯା ଦାଁଡାଇଲ ।

ଆମି ପ୍ରଥମେ ତାହାକେ ଚିନିତେ ପାରିଲାମ ନା । ତାହାର ସେ ଝୁଲି ନାଇ, ତାହାର ସେ ଲସା ଚୁଲ ନାଇ, ତାହାର ଶରୀରେ ପୂର୍ବେର ମତୋ ସେ ତେଜ ନାଇ । ଅବଶେଷେ ତାହାର ହାସି ଦେଖିଯା ତାହାକେ ଚିନିଲାମ ।

କହିଲାମ, “କୀ ରେ ରହମତ, କବେ ଆସିଲି ?”

ଦେ କହିଲ, “କାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା ଜେଲ ହିତେ ଖାଲାସ ପାଇଯାଛି ।”

କଥାଟା ଶୁଣିଯା କେମନ କାନେ ଖାଟ୍ କରିଯା ଉଠିଲ । କୋନୋ ଖୁନୀକେ କଥନୋ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖି ନାଇ, ଇହାକେ ଦେଖିଯା ସମ୍ମତ ଅନୁଷ୍କରଣ ଯେନ ସଂକୁଚିତ ହିୟା ଗେଲ । ଆମାର ଇଚ୍ଛା କରିତେ ଲାଗିଲ, ଆଜିକାର ଏହି ଶୁଭଦିନେ ଏ ଲୋକଟା ଏଖାନ ହିତେ ଗେଲେଇ ଭାଲୋ ହୁଏ ।

ଆମି ତାହାକେ କହିଲାମ, “ଆଜ ଆମାଦେର ବାଡ଼ିତେ ଏକଟା କାଜ ଆଛେ, ଆମି କିଛୁ ବ୍ୟନ୍ତ ଆଛି, ତୁମି ଆଜ ଯାଓ ।”

କଥାଟା ଶୁଣିଯାଇ ସେ ତ୍ରଙ୍କଣାଂ ଚଲିଯା ଯାଇତେ ଉଦ୍‌ଯତ ହଇଲ, ଅବଶେଷେ ଦରଜାର କାହେ ଗିଯା ଏକଟୁ ଇତ୍ତତ କରିଯା କହିଲ, “ଖୋରୀକେ ଏକବାର ଦେଖିତେ ପାଇବ ନା ?”

ତାହାର ମନେ ବୁଝି ବିଶ୍ଵାସ ଛିଲ, ମିନି ସେଇ ଭାବେଇ ଆଛେ । ସେ ଯେନ ମନେ କରିଯାଛିଲ, ମିନି ଆବାର ସେଇ ପୂର୍ବେର ମତୋ ‘କାବୁଲିଓୟାଲା, ଓ କାବୁଲିଓୟାଲା’ କରିଯା ଛୁଟିଯା ଆସିବେ, ତାହାଦେର ସେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌତୁକାବହ ପୁରାତନ ହାସ୍ୟାଲାପେର କୋନୋରୂପ ବ୍ୟତ୍ୟା ହିୟେ ନା । ଏମନ-କି, ପୂର୍ବବନ୍ଧୁତ ଶ୍ରବଣ କରିଯା ସେ ଏକ ବାକ୍ତି ଆଜୁର ଏବଂ କାଗଜେର ମୋଡ଼କେ କିମ୍ବିଳ କିମ୍ବିଳ ବାଦାମ ବୋଧ କରି କୋନୋ ସ୍ଵଦେଶୀୟ ବନ୍ଧୁର ନିକଟ ହିତେ ଚାହିୟା-ଚିନ୍ତିଯା ସଂଘର୍ଷ କରିଯା ଆନିଯାଛିଲ ବର ତାହାର ସେ ନିଜେର ବୁଲିଟି ଆର ଛିଲ ନା ।

ଆମି କହିଲାମ, “ଆଜ ବାଡ଼ିତେ କାଜ ଆଛେ, ଆଜ ଆର କାହାରେ ସହିତ ଦେଖା ହିତେ ପାରିବେ ନା ।”

ଦେ ଯେନ କିଛୁ କୁଣ୍ଡ ହଇଲ । ଶ୍ରନ୍ଦଭାବେ ଦାଁଡାଇଯା ଏକବାର ହିରଦୃଷ୍ଟିତେ ଆମାର ମୁଖେର ଦିକେ ଚାହିଲ, ତାର ପରେ ‘ବାବୁ ସେଲାମ’ ବଲିଯା ଦ୍ୱାରେର ବାହିର ହିୟା ଗେଲ ।

ଆମାର ମନେ କେମନ ଏକଟୁ ବ୍ୟଥା ବୋଧ ହଇଲ । ମନେ କରିତେଛି ତାହାକେ ଫିରିଯା

ডাকিব, এমন সময় দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, “এই আঙুর এবং কিঞ্চিৎ কিস্মিস বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।”

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল; কহিল, “আপনার বহুত দয়া, আমার চিরকাল শ্বরণ থাকিবে—আমাকে পয়সা দিবেন না। বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কি আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কি আছে। আমি তাহারই মুখখানি শ্বরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সওন্দা করিতে আসি না।”

এই বলিয়া সে আপনার মন্ত্র টিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সফরে ভাঁজ খুলিয়া দুই হাতে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম, কাগজের উপর একটি ছোটো হাতের ছাপ। ফোটোগ্রাফ নহে, তেলের ছাবি নহে, হাতে খানিকটা ডুষা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই শ্বরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে—যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুস্তুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা আর আমি যে একজন বাঙালি সন্ন্যাসীবংশীয়, তাহা ভুলিয়া গেলাম—তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে শ্বরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু, আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙা-চেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, “খোঁখী, তোমি সসুরবাড়ি যাবিস?”

মিনি এখন শুশুরবাড়ির অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্বের মতো উত্তর দিতে পারিল না, রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিষ্ঠাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটি ও ইতিমধ্যে এইরূপ বড়ো হইয়াছে, তাহার সঙ্গে আবার নৃত্য আলাপ করিতে হইবে—তাহাকে ঠিক পূর্বের মতো তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কী হইয়াছে তাই বা কে জানে। সকালবেলায় শরতের শিঙ্ক রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল,

রহমত কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মুরুপ পৰ্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল ।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম । বলিলাম, “রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসূখে আমার মিনির কল্যাণ হউক ।”

এটা টাকাটা দান করিয়া হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো-একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল । যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ।

অংগহায়ণ / ১২৯৯

## ছুটি

বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্ৰবৰ্তীৰ মাথায় চট্ট কৰিয়া একটা নৃতন ভাৰোদয় হইল; নদীৰ ধারে একটা প্ৰকাণ্ড শালকাঠ মাঞ্চুলে ঝুপান্তৰিত হইবাৰ প্ৰতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থিৰ হইল, সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তিৰ কাঠ, আবশ্যক-কালে তাহাৰ যে কৰ্তব্যানি বিশ্বয় বিৱৰণি এবং অসুবিধা বোধ হইবে, তাহাই উপলক্ষি কৰিয়া বালকেৱা এ প্ৰস্তাৱে সম্পূৰ্ণ অনুমোদন কৰিল।

কোমৰ বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগেৱ সহিত কাৰ্যে প্ৰবৃত্ত হইবাৰ উপক্ৰম কৰিতেছে এমন সময়ে ফটিকেৰ কনিষ্ঠ মাৰ্খনলাল গৰ্ভীৱভাৱে সেই গুড়িৰ উপৱে গিয়া বসিল; ছেলেৱা তাহাৰ এইৱৰ্কপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমৰ্শ হইয়া গোল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু-আধটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্ৰ বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানৱ সকলপ্ৰকাৰ গুৰীড়াৰ অসারতা সমৰক্ষে নীৱবে চিন্তা কৰিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্থালন কৰিয়া কহিল, “দেখ, মাৰ খাবি। এইবেলা ওঠ।”

সে তাহাতে আৱো একটু নড়িয়াচড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীৱৰ্কপে দখল কৰিয়া লইল।

একপ স্থলে সাধাৱণেৰ নিকট রাজসম্মান রক্ষা কৰিতে হইলে অবাধ্য ভাৱাৰ গওদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কৰাইয়া দেওয়া ফটিকেৰ কৰ্তব্য ছিল — সাহস হইল না। কিন্তু, এমন একটা ভাৱ ধাৰণ কৰিল, যেন ইচ্ছা কৰিলেই এখনি উহাকে গীতিমত শাসন কৰিয়া দিতে পাৱে, কিন্তু কৰিল না; কাৰণ, পূৰ্বাপেক্ষা আৱ-একটা ভালো খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আৱ-একটু বেশি মজা আছে। প্ৰস্তাৱ কৰিল, মাৰ্খনকে সুন্দৰ এই কাঠ গড়াইতে আৱস্থা কৰা যাক।

মাৰ্খন মনে কৰিল, ইহাতে তাহাৰ গৌৱৰ আছে; কিন্তু অন্যান্য পাৰ্থিৰ গৌৱৰেৰ ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদেৱ সংভাবনাও আছে, তাহা তাহাৰ কিংবা আৱ-কাহাৱও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেৱা কোমৰ বাঁধিয়া ঠেলিতে আৱস্থা কৰিল — ‘মাৱো ঠেলা হৈইয়ো, সাবাস জোয়ান হৈইয়ো।’ গুঁড়ি এক পাক ঘুৱিতে-না-ঘুৱিতেই মাৰ্খন তাহাৰ গান্ধীৰ্য গৌৱৰ এবং তত্ত্বজ্ঞান-সমেত ভূমিসাঁৎ হইয়া গোল।

খেলাৰ আৱস্থাতেই এইৱৰ্কপ আশাতীত ফললাভ কৰিয়া অন্যান্য বালকেৱা বিশেষ হষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাৰ্খন তৎক্ষণাঁৎ ভূমিশয়া ছাড়িয়া

ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অঙ্কভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙ্গিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গৌফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “চক্রবর্তীদের বাড়ি কোথায়।”

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল, “ঐ হোথা।” কিন্তু কোন্ দিকে যে নির্দেশ করিল, কাহারও বুবিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথা।”

সে বলিল, “জানি নে।” বলিয়া পূর্ববৎ তৃণমূল হইতে রসঘংঘণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগ্দি আসিয়া কহিল, “ফটিকদাদা, মা ডাকছে।”

ফটিক কহিল, “যাব না।”

বাঘা তাহাকে বলপূর্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল; ফটিক নিষ্কল মাক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, “আবার তুই : মাখনকে মেরেছিস।”

ফটিক কহিল, “না, মারি নি।”

“ফের মিথ্যে কথা বলছিস।”

“কখনো মারি নি। মাখনকে জিজ্ঞাসা করো।”

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল, “হাঁ, মেরেছে।”

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, “ফের মিথ্যে কথা।”

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা-তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীৎকার করিয়া কহিলেন, “অ্যা, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস।”

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, “কী হচ্ছে তোমাদের।”

ফটিকের মা বিশ্বয়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন, “ওমা, এ যে দাদা, তুমি কবে এলে।” বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পচিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহার অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া

আসিয়া বিশ্বরবাবু তাহার ভগিনীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই-একদিন পূর্বে বিশ্বরবাবু তাহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উন্নরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছ্বেলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাহার ভগিনী কহিলেন, “ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।”

শুনিয়া বিশ্বর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন।

বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?”

ফটিক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, “যাব।”

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাহার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল—কোন্ দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয় কি মাথাই ফাটায়, কি কী একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদ্যায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

‘কবে যাবে’ ‘কখন যাবে’ করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্ত্র করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্য-বশত তাহার ছিপ ঘূড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌছিয়া প্রথমত মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবারবৃন্দিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তাহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকলা পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিন্তু একটা বিপুবের সন্তাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বরের এত বয়স হইল, তবু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌদ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। ম্রেহও উদ্বেক করে না, তাহার সঙ্গসূখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্ভতা। হঠাতে কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কর্তৃত্বের মিষ্টিতা সহসা চলিয়া যায়; লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ে কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ক্রটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অঙ্গিত সবকে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই শ্রেষ্ঠের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহায় ব্যক্তির নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ কিংবা সত্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিতে কেহ সাহস করে না; কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্ন বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাত্ত্ববন ছাড়া আর-কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নয়। চারি দিকের শ্রেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো-এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামীর শ্রেহশীন চক্ষে সে যে একটা দুর্ঘাতের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের সব চেয়ে বাজিত। মামী যদি দৈবাং তাহাকে কোনো-একটা কাজ করিতে বলিতেন তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যিক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত—অবশ্যে মামী যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, “চের হয়েছে, চের হয়েছে। ওতে আর তোমায় হাত দিতে হবে না। এখন তুমি নিজের কাজে মন দাও গো। একটু পড়ো গো যাও।”—তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামীর এতটা যত্নবাহ্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ একটা ধাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, ‘তাইরে নাইরে নাইরে না’ করিয়া উচৈরঃস্থরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্নোতশ্বিনী, সেই-সব দল-বল উপদ্রব স্বাধীনতা, এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহনিষ্ঠি তাহার নিরূপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্মুর মতো একপ্রকার অবুঝ ভালোবাসা—কেবল একটা কাছে যাইবার অঙ্গ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলিসময়ের মাত্ত্বীন বৎসের মতো কেবল একটা আন্তরিক ‘মা মা’ ক্রন্দন—সেই লজ্জিত শক্তি শীর্ণ দীর্ঘ অসুস্থির বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত হইত।

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাষ্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারতুন্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে কোনো-একটা ছাদে দুটি একটি ছেলেমেয়ে কিছু-একটা খেলার

ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত তখন তাহার চিন্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিভা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “মামা, মার কাছে কবে যাব।” মামা বলিয়াছিলেন, “স্কুলের ছুটি হোক।”

কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনো ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাট্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আবশ্য করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, “বই হারিয়ে ফেলেছি।”

মামী অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, “বেশ করেছ! আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারি নে।”

ফটিক আর-কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল—সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সিরু সিরু করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল, তাহার জুর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল, ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী এই ব্যামোটাকে যে কিন্তু একটা অকারণ অনাবশ্যক জুলাতনের স্বরূপ দেখিবে তাহা সে স্পষ্ট উপলক্ষ করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্মণ্য অঙ্গুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর-কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, একেপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষ্টলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশ্যে কোথাও না পাইয়া বিশ্বজ্ঞরবাবু পুলিসে থবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বজ্ঞরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনো ঝুপ ঝুপ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে, রাস্তায় এক-হাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিসের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বজ্ঞরবাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বজ্ঞরবাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে  
কেন এ কর্মভোগ। দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।”

বাস্তবিক, সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় তাহার ভালোরূপ আহারাদি হয় নাই এবং নিজের  
ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিট্মিট্মি করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, “আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে  
এনেছে।”

বালকের জুর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল।  
বিশ্বস্তরবাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্নীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে  
হতুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল, “মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি।”

বিশ্বস্তরবাবু ঝুমালে চোখ মুছিয়া সম্মেহে ফটিকের শীর্ণ তণ্ড হাতখানি হাতের  
উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল; বলিল, “মা, আমাকে মারিস নে  
মা। সত্যি বলছি, আমি কোনো দোষ করি নি।”

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায়  
ফ্যাল্ফ্যাল্ফ করিয়া ঘরের চারি দিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের  
দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বস্তরবাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া  
মৃদুস্বরে কহিলেন, “ফটিক, তোর মাকে আনতে পাঠিয়েছি।”

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাঙ্কার চিন্তিত বিমর্শ মুখে জানাইলেন, অবস্থা  
বড়োই খারাপ।

বিশ্বস্তরবাবু স্তম্ভিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতি মুহূর্তেই ফটিকের মাতার  
জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসিদের মতো সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল, “এক বাঁও মেলে  
না। দো বাঁও মেলে—এ—এ না।” কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা  
স্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসিরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক  
প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে  
যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকলরবে শোক  
করিতে লাগিলেন। বিশ্বস্তর বহুকষ্টে তাহার শোকোচ্ছ্঵াস নিবৃত্ত করিলে, তিনি শয্যার  
উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচৈরস্বরে ডাকিলেন, “ফটিক! সোনা! মানিক আমার!”

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উচৱ দিয়া কহিল, “অ্যা।”

মা আবার ডাকিলেন, “ওরে ফটিক, বাপধন রে!”

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল,  
“মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।”

## অতিথি

### প্রথম পরিচেন্দ

কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু নৌকা করিয়া সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে মধ্যাহ্নে নদীতীরের এক গঞ্জের নিকট নৌকা বাঁধিয়া পাকের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণবালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু, তোমরা যাচ্ছ কোথায় ?” প্রশ্নকর্তার বয়স পনেরো-ষোলোর অধিক হইবে না।

মতিবাবু উত্তর করিলেন, “কাঁঠালে ।”

ব্রাহ্মণবালক কহিল, “আমাকে পথের মধ্যে নদীগায়ে নাবিয়ে দিতে পার ?”

বাবু সম্মতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কী ?”

ব্রাহ্মণবালক কহিল, “আমার নাম তারাপদ ।”

গৌরবর্ণ ছেলেটিকে বড়ো সুন্দর দেখিতে। বড়ো বড়ো চক্ষ এবং হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে একখানি মলিন ধূতি। অনাবৃত দেহখানি সর্বপ্রকার বাহ্যিকার্জিত; কোনো শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁত নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। যেন সে পূর্বজন্মে তাপস-বালক ছিল এবং নির্মল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুল পরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মার্জিত ব্রাহ্মণশ্রী পরিক্ষুট হইয়া উঠিয়াছে।

মতিলালবাবু তাহাকে পরম স্নেহভরে কহিলেন, “বাবা, তুমি স্নান করে এসো, এইখানেই আহারাদি হবে ।”

তারাপদ বলিল, “রসুন ।” বলিয়া তৎক্ষণাত্মে রক্ষনের আয়োজনে যোগদান করিল। মতিলালবাবুর চাকরটা ছিল হিন্দুস্থানী, মাছ-কোটা প্রভৃতি কার্যে তাহার তেমন পটুতা ছিল না; তারাপদ তাহার কাজ নিজে লইয়া অল্পকালের মধ্যে সুসম্পন্ন করিল এবং দুই-একটা তরকারিও অভ্যন্তর নৈপুণ্যের সহিত রক্ষন করিয়া দিল। পাককার্য শেষ হইলে তারাপদ নদীতে স্নান করিয়া বৌঁচকা ঝুলিয়া একটি শুভ্র বস্ত্র পরিল; একটি ছোটো কাঠের কাঁকই লইয়া মাথার বড়ো বড়ো চুল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফেলিল এবং মার্জিত পইতার গোছা বক্ষে বিলম্বিত করিয়া নৌকায় মতিবাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

মতিবাবু তাহাকে নৌকার ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে মতিবাবুর স্ত্রী এবং তাহার নবমবর্ষীয়া এক কন্যা বসিয়া ছিলেন। মতিবাবুর স্ত্রী অনুপূর্ণা এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া স্নেহে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন-মনে মনে কহিলেন, ‘আহা,

কাহার বাছা, কোথা হইতে আসিয়াছে—ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া  
প্রাণ ধরিয়া আছে।'

যথাসময়ে মতিবাবু এবং এই ছেলেটির জন্য পাশাপাশি দুইখানি আসন পড়িল।  
ছেলেটি তেমন ভোজনপটু নহে; অন্নপূর্ণা তাহার স্বল্প আহার দেখিয়া মনে করিলেন,  
সে লজ্জা করিতেছে; তাহাকে এটা ওটা খাইতে বিশ্র অনুরোধ করিলেন; কিন্তু  
যথন সে আহার হইতে নিরস্ত হইল, তখন সে কোনো অনুরোধ মানিল না। দেখা  
গেল, ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে অথচ এমন সহজে করে  
যে, তাহাতে কোনো প্রকার জেদ বা গৌ প্রকাশ পায় না। তাহার ব্যবহারে লজ্জার  
লক্ষণও লেশমাত্র দেখা গেল না।

সকলের আহারাদির পরে অন্নপূর্ণা তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার  
ইতিহাস জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিঞ্চারিত বিবরণ কিছুই সংগ্রহ হইল না। মোট  
কথা এইটুকু জানা গেল, ছেলেটি সাত-আট বৎসর বয়সেই স্বেচ্ছাকৃত্মে ঘর ছাড়িয়া  
পলাইয়া আসিয়াছে।

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, "তোমার মা নাই?"

তারাপদ কহিল, "আছেন।"

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি তোমাকে ভালোবাসেন না?"

তারাপদ এই প্রশ্ন অত্যন্ত অঙ্গুত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কেন  
ভালোবাসবেন না।"

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, "তবে তুমি তাঁকে ছেড়ে এলে যে?"

তারাপদ কহিল, "তাঁর আরো চারটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে আছে।"

অন্নপূর্ণা বালকের এই অঙ্গুত উত্তরে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, "ওমা, সে কী  
কথা। পাঁচটি আঙুল আছে ব'লে কি একটি আঙুল ত্যাগ করা যায়।"

তারাপদের বয়স অল্প, তাহার ইতিহাসও সেই পরিমাণে সংক্ষিপ্ত কিন্তু ছেলেটি  
সম্পূর্ণ নৃতনতর। সে তাহার পিতামাতার চতুর্থ পুত্র, শৈশবেই পিতৃহীন হয়। বহু  
সন্তানের ঘরেও তারাপদ সকলের অত্যন্ত আদরের ছিল; মা ভাই বোন এবং পাড়ার  
সকলেরই নিকট হইতে সে অজস্র স্নেহ লাভ করিত। এমন-কি, গুরুমহাশয়ও  
তাহাকে মারিত না—মারিলেও বালকের আঘাত পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ  
করিত। এমন অবস্থায় তাহার গৃহত্যাগ করিবার কোনোই কারণ ছিল না। যে  
উপেক্ষিত রোগা ছেলেটা সর্বদাই চুরি-করা গাছের ফল এবং গৃহস্থ লোকদের নিকট  
তাহার চতুর্থ প্রতিফল খাইয়া বেড়ায় সেও তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে তাহার  
নির্যাতনকারী মার নিকট পড়িয়া রহিল, আর সমস্ত গ্রামের এই আদরের ছেলে  
একটা বিদেশী যাত্রার দলের সহিত মিলিয়া অকাতরচিত্তে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন  
করিল।

সকলে খোঁজ করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল। তাহার মা তাহাকে বক্ষে  
চাপিয়া ধরিয়া অঙ্গুজলে আর্দ্র করিয়া দিল, তাহার বোনরা কাঁদিতে লাগিল; তাহার

বড়ো ভাই পুরুষ-অভিভাবকের কঠিন কর্তব্য পালন উপলক্ষে তাহাকে মৃদু রকম শাসন করিবার চেষ্টা করিয়া অবশ্যে অনুত্তঙ্গচিত্তে বিস্তর প্রশ্ন এবং পুরুষ্কার দিল। পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া প্রচুরতর আদর এবং বহুতর প্রলোভনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বৰ্কন, এমন-কি মেহেবুন্নিও তাহার সহিল না; তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে। সে যখনই দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্঵থগাছের তলে কোন্ দূরদেশ হইতে এক সন্ধ্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, অথবা বেদেরা নদীর তীরের পতিত মাঠে ছোটো ছোটো চাটাই বাঁধিয়া বাঁখারি ছুলিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর মেহেবুন্ন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিন্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। উপরি-উপরি দুই-তিনবার পলায়নের পর তাহার আত্মীয়বর্গ এবং গ্রামের লোক তাহার আশা পরিত্যাগ করিল।

প্রথমে সে একটা যাত্রার দলের সঙ্গ লইয়াছিল। অধিকারী যখন তাহাকে পুত্রনির্বিশেষে স্বেহ করিতে লাগিল এবং দলস্থ ছোটো-বড়ো সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল, এমন-কি, যে বাড়িতে যাত্রা হইত সে বাড়ির অধ্যক্ষগণ, বিশেষত পুরমাহিলাৰ্গ যখন বিশেষরূপে তাহাকে আহ্বান করিয়া সমাদর করিতে লাগিল, তখন একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল তাহার আর সকান পাওয়া গেল না।

তারাপদ হরিণশিশুর মতো বক্সনভীরু, আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুক্ত। যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগী করিয়া দেয়। গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল তখনো সংগীতসভায় সে যেৱুপ সংযত গম্ভীর বয়ক্ষ-ভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া বসিয়া বসিয়া দুলিত, দেখিয়া প্রবীণ লোকের হাস্য সংবরণ করা দৃঃসাধ্য হইত। কেবল সংগীত কেন, গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্বাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিন্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। নিষ্ঠুর দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সক্রায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারঝনি সকলই তাহাকে উত্তলা করিত। এই সংগীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে অনতিবিলম্বে এক পাঁচালির দলের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম যত্নে গান শিখাইতে এবং পাঁচালি মুখস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাকে আপন বক্ষপিণ্ডের পাথির মতো প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্বেহ করিতে লাগিল। পাথি কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যুষে উড়িয়া চলিয়া গেল।

শেষবারে সে এক জিমন্যাস্টিকের দলে জুটিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ়মাসের অবসান পর্যন্ত এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে পর্যায়ক্রমে বারোয়ারির মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে দুই-তিন দল যাত্রা, পাঁচালি, কবি, নৰ্তকী এবং

নানাবিধ দোকান নৌকায়োগে ছোটো ছোটো নদী উপনদী দিয়া এক মেলা-অন্তে অন্য মেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। গত বৎসর হইতে কলিকাতার এক স্কুল্ড্র জিমন্যাস্টিকের দল এই পর্যটনশৈল মেলার আমোদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমত নৌকারোহী দোকানির সহিত মিলিয়া মিশিয়া মেলায় পানের খিলি বিক্রয়ের ভার লইয়াছিল। পরে তাহার স্বাভাবিক কৌতুহলবশত এই জিমন্যাস্টিকের আর্চর্য ব্যায়ামনেপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ করিয়াছিল। তারাপদ নিজে নিজে অভ্যাস করিয়া ভালো বাঁশি বাজাইতে শিখিয়াছিল—জিমন্যাস্টিকের সময় তাহাকে দ্রুত তালে লঙ্ঘো ঠুংরির সুরের বাঁশি বাজাইতে হইত—এই তাহার একমাত্র কাজ ছিল।

এই দল হইতেই তাহার শেষ পলায়ন। সে শুনিয়াছিল, নদীগ্রামের জমিদারবাবুরা মহাসমারোহে এক শখের যাত্রা খুলিতেছেন, শুনিয়া সে তাহার স্কুল্ড্র বোঁচকাটি লইয়া নদীগ্রামে যাত্রার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় মতিবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

তারাপদ পর্যায়ক্রমে নানা দলের মধ্যে ভিড়িয়াও আপন স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতি-প্রভাবে কোনো দলের বিশেষত্ব প্রাণ হয় নাই। অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত ছিল। সংসারে অনেক কৃৎসিত কথা সে সর্বদা শুনিয়াছে এবং অনেক কদর্য দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইবার তিলমাত্র অবসর প্রাণ হয় নাই। এ ছেলেটির কিছুতেই খেয়াল ছিল না। অন্যান্য বক্সের ন্যায় কোনোপ্রকার অভ্যাসবদ্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করিতে পারে নাই। সে এই সংসারে পক্ষিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কৌতুহলবশত যতবারই ঢুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না। এইজন্য এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মুখে একটি শুভ স্বাভাবিক তারুণ্য অম্বানভাবে প্রকাশ পাইত, তাহার সেই মুখশ্রী দেখিয়া প্রবীণ বিষয়ী মতিলালবাবু তাহাকে বিনা প্রশ্নে, বিনা সন্দেহে, পরম আদরে আহ্বান করিয়া লইয়াছিলেন।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল। অনন্তর্গত পরম স্নেহে এই ব্রাহ্মণবালককে তাহার ঘরের কথা, তাহার আঝায়পরিজনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তারাপদ অত্যন্ত সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া বাহিরে আসিয়া পরিত্রাণ লাভ করিল। বাহিরে বর্ষার নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আঝারা উদ্বাম চাঞ্চল্যে প্রকৃতিমাতাকে যেন উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘনির্মুক্ত রৌদ্রে নদীতীরের অর্ধনিমগ্ন কাশ্তগশ্রেণী, এবং তাহার উর্ধ্বে সরস সঘন ইক্ষুক্ষেত্র এবং তাহার পরপ্রান্তে দূরদিগন্তচূম্বিত নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা সমন্তই যেন কোনো এক ঝুঁকথার সোনার কাঠির স্পর্শে সদ্যোজাত্রত নবীন সৌন্দর্যের মতো নির্বাক

নীলাকাশের মুঞ্চদৃষ্টির সম্মুখে পরিষ্কৃট হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগতি আলোকে উদ্ভাসিত, নবীনতায় সূচিকৃত, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইল। পর্যায়ক্রমে ঢালু সবুজ মাঠ, প্লাবিত পাটের খেত, গাঢ় শ্যামল আমনধান্যের আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখী সংকীর্ণ পথ, ঘনবনবেষ্টিত ছায়াময় গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জল স্থল আকাশ, এই চারিদিকে সচলতা সজীবতা মুখরতা, এই উর্ধ্ব-অধোদেশের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিঙ্গ সুদূরতা, এই সুবৃহৎ চিরস্থায়ী নির্নিমেষ বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মায় ছিল; অথচ সে এই চক্ষুল মানবকটিকে এক মুহূর্তের জন্যও মেহবাহু দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না। নদীতীরে বাচুর লেজ তুলিয়া ছুটিতেছে, গ্রাম্য টাঁটুঘোড়া সম্মুখের দুই দড়ি-বাঁধা পা লইয়া লাফ দিয়া দিয়া ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে, মাছরাঙা জেলেদের জাল বাঁধিবার বংশদণ্ডের উপর হইতে ঝপ্প করিয়া সবেগে জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে, মেয়েরা উচ্চকল্পে সহায় গল্প করিতে করিতে আবক্ষ জলে বসনাঞ্চল প্রসারিত করিয়া দুই হস্তে তাহা মার্জন করিয়া লইতেছে, কোমর-বাঁধা মেছুনিরা চুপড়ি লইয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে, এ-সমস্তই সে চিরন্তন অশ্বান্ত কৌতুহলের সহিত বসিয়া বসিয়া দেখে, কিছুতেই তাহার দৃষ্টির পিপাসা নিবৃত্ত হয় না।

নৌকার ছাতের উপরে গিয়া তারাপদ ক্রমশ দাঁড়ি-মাঝিদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে আবশ্যকমতে মাল্লাদের হাত হইতে লগি লইয়া নিজেই ঠেলিতে প্রবৃত্ত হইল; মাঝির যখন তামাক খাইবার আবশ্যক, তখন সে নিজে গিয়া হাল ধরিল — যখন যে দিকে পাল ফিরানো আবশ্যক সমস্ত সে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অনন্তপূর্ণ তারাপদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাত্রে তুমি কী খাও।”

তারাপদ কহিল, “যা পাই তাই খাই; সকল দিন খাইও না।”

এই সুন্দর ব্রাক্ষণবালকটির আতিথ্যগ্রহণে ওদাসীন্য অনন্তপূর্ণাকে ঈষৎ পীড়া দিতে লাগিল। তাহার বড়ো ইচ্ছা, খাওয়াইয়া পরাইয়া এই গৃহচ্ছত পাস্ত বালকটিকে পরিত্বষ্ণ করিয়া দেন। কিন্তু কিসে যে তাহার পরিতোষ হইবে তাহার কোনো সন্দেশ পাইলেন না। অনন্তপূর্ণ চাকরদের ডাকিয়া গ্রাম হইতে দুধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ধূমধাম বাধাইয়া দিলেন। তারাপদ যথাপরিমাণে আহার করিল, কিন্তু দুধ খাইল না। মৌনস্বত্বাব মতিলালবাবুও তাহাকে দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; সে সংক্ষেপে বলিল, “আমার ভালো লাগে না।”

নদীর উপর দুই-তিনদিন গেল। তারাপদ রাঁধাবাড়া, বাজার করা হইতে নৌকাচালনা পর্যন্ত সকল কাজেই স্বেচ্ছা ও তৎপরতার সহিত যোগ দিল। যে-কোনো দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে আসে তাহার প্রতি তারাপদর সকৌতুহল

দৃষ্টি ধাবিত হয়, যে-কোনো কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতেই সে আপনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া আছে; এইজন্য সে এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন, অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসম্ভব। মানুষমাত্রেই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে; কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাধৰবাহী বিশ্বব্রহ্মাহের একটি আনন্দোজ্জুল তরঙ্গ—ভূত-ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই—সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য।

এদিকে অনেকদিন নানা সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া অনেকপ্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। কোনোপ্রকার চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকাতে তাহার নির্মল শৃঙ্খলপটে সকল জিনিস আশ্চর্য সহজে মুদ্রিত হইয়া যাইত। পাঁচালি, কথকতা, কীর্তনগান, যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ খণ্ডসকল তাহার কঠাগ্রে ছিল। মতিলালবাবু চিরপ্রথামত একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাহার শ্রী-কন্যাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিলেন; কুশলবের কথার সূচনা হইতেছে, এমন সময়ে তারাপদ উৎসাহ সংবরণ করিতে না পারিয়া নৌকার ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, “বই রাখুন। আমি কুশলবের গান করি, আপনারা শুনে যান।”

এই বলিয়া সে কুশলবের পাঁচালি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মতো সুমিষ্ট পরিপূর্ণস্বরে দাশুরায়ের অনুপ্রাপ্ত ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল; দাঁড়ি-মাঝি সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল; হাস্য করুণা এবং সংগীতে সেই নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপূর্ব রসস্নোত প্রবাহিত হইতে লাগিল—দুই নিষ্ঠক তটভূমি কৃতৃহলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া যে-সকল নৌকা চলিতেছিল, তাহাদের আরোহীগণ ক্ষণকালের জন্য উৎকঢ়িত হইয়া সেই দিকে কান দিয়া রহিল; যখন শেষ হইয়া গেল সকলেই ব্যথিত চিষ্টে দীর্ঘনিষ্ঠাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে শেষ হইল কেন।

সজলনয়না অনন্তপূর্ণর ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছেলেটিকে কোলে বসাইয়া বক্ষে চাপিয়া তাহার মন্তক আস্ত্রাণ করেন। মতিলালবাবু ভাবিতে লাগিলেন, ‘এই ছেলেটিকে যদি কোনোমতে কাছে রাখিতে পারি তবে পুত্রের অভাব পূর্ণ হয়।’ কেবল শুন্দি বালিকা চারুশশীর অন্তঃকরণ ঈর্ষা ও বিদ্যুষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারুশশী তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাহাদের পিতৃমাত্রস্বেহের একমাত্র অধিকারিণী। তাহার খেয়াল এবং জেদের অন্ত ছিল না। খাওয়া, কাপড় পরা, চুল বাঁধা সম্বন্ধে তাহার নিজের স্বাধীন মত ছিল, কিন্তু সে মতের কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। যেদিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিত সেদিন তাহার মায়ের ভয় হইত, পাছে যেয়েটি সাজসজ্জা সম্বন্ধে একটা অসম্ভব জেদ ধরিয়া বসে। যদি দৈবাং একবার চুলবাঁধাটা তাহার মনের মতো না হইল, তবে সেদিন যতবার চুল খুলিয়া যতরকম করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাক কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে না, অবশ্যে মহা

କାନ୍ନାକାଟିର ପାଲା ପଡ଼ିଯା ଯାଇବେ । ସକଳ ବିଷୟେই ଏଇରୂପ । ଆବାର ଏକ-ଏକ ସମୟ ଚିତ୍ତ ସଥନ ପ୍ରସନ୍ନ ଥାକେ ତଥନ କିଛୁତେଇ ତାହାର କୋନୋ ଆପଣି ଥାକେ ନା । ତଥନ ସେ ଅତିମାତ୍ରାୟ ଭାଲୋବାସା ପ୍ରକାଶ କରିଯା ତାହାର ମାକେ ଜଡ଼ାଇଯା ଧରିଯା ଚୁମ୍ବନ କରିଯା ହସିଯା ବକିଯା ଏକେବାରେ ଅନ୍ତର କରିଯା ତୋଲେ । ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମେଯେଟି ଏକଟି ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ପ୍ରହୋଲିକା ।

‘ଏଇ ବାଲିକା ତାହାର ଦୂର୍ବଧ୍ୟ ହଦୟେ ସମନ୍ତ ବେଗ ପ୍ରଯୋଗ କରିଯା ମନେ ମନେ ତାରାପଦକେ ସୁତୀବ୍ର ବିଦେଶେ ତାଡନା କରିତେ ଲାଗିଲ । ପିତାମାତାକେଓ ସର୍ବତୋଭାବେ ଉଦ୍ବେଜିତ କରିଯା ତୁଲିଲ । ଆହାରେ ସମୟ ରୋଦନୋନୁଥି ହଇଯା ଭୋଜନେର ପାତ୍ର ଠେଲିଯା ଫେଲିଯା ଦେଇ, ରନ୍ଧନ ତାହାର ରୁଚିକର ବୋଧ ହୟ ନା, ଦାସୀକେ ମାରେ, ସକଳ ବିଷୟେଇ ଅକାରଣ ଅଭିଯୋଗ କରିତେ ଥାକେ । ତାରାପଦର ବିଦ୍ୟାଗୁଲି ଯତଇ ତାହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟସକଳେର ମନୋରଙ୍ଗନ କରିତେ ଲାଗିଲ, ତତଇ ଯେଣ ତାହାର ରାଗ ବାଡ଼ିଯା ଉଠିଲ । ତାରାପଦର ଯେ କୋନୋ ଗୁଣ ଆହେ ଇହ ସ୍ଵୀକାର କରିତେ ତାହାର ମନ ବିମୁଖ ହଇଲ, ଅଥଚ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ସଥନ ପ୍ରବଳ ହଇତେ ଲାଗିଲ, ତାହାର ଅସନ୍ତୋମେର ମାତ୍ରାଓ ଉଚ୍ଚେ ଉଠିଲ । ତାରାପଦ ଯେଦିନ କୁଶଲବେର ଗାନ କରିଲ ସେଦିନ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରିଲେନ, ‘ସଂଗୀତେ ବନେର ପଣ ବଶ ହୟ, ଆଜ ବୋଧ ହୟ ଆମାର ମେଯେର ମନ ଗଲିଯାଛେ ।’ ତାହାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲେନ, “ଚାରୁ, କେମନ ଲାଗଲ ।” ସେ କୋନୋ ଉତ୍ତର ନା ଦିଯା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବେଗେ ମାଥା ନାଡ଼ିଯା ଦିଲ । ଏଇ ଭଙ୍ଗିଟିକେ ଭାଷାଯ ତର୍ଜମା କରିଲେ ଏଇରୂପ ଦାଁଡାୟ, କିଛୁମାତ୍ର ଭାଲୋ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ କୋନୋକାଳେ ଭାଲୋ ଲାଗିବେ ନା ।

ଚାରୁର ମନେ ଈଶ୍ଵର ଉଦୟ ହଇଯାଛେ ବୁଝିଯା ତାହାର ମାତା ଚାରୁର ସମ୍ମୁଖେ ତାରାପଦର ପ୍ରତି ମେହେ ପ୍ରକାଶ କରିତେ ବିରତ ହଇଲେନ । ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରେ ସଥନ ସକାଳ-ସକାଳ ଖାଇଯା ଚାରୁ ଶୟନ କରିତ ତଥନ ଅନ୍ନପୂଣୀ ନୌକାକଷ୍ଟେ ଦ୍ୱାରେର ନିକଟ ଆସିଯା ବସିଲେନ ଏବଂ ମତିବାବୁ ଓ ତାରାପଦ ବାହିରେ ବସିତ ଏବଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣର ଅନୁରୋଧେ ତାରାପଦ ଗାନ ଆରଣ୍ଣ କରିତ; ତାହାର ଗାନେ ସଥନ ନଦୀଭୀରେର ବିଶ୍ରାମନିରତ ଶ୍ରାମକ୍ଷେତ୍ର ଶକ୍ତ୍ୟାର ବିପୁଲ ଅନ୍ଧକାରେ ମୁଖ ନିଷ୍ଠକ ହଇଯା ରହିତ ଏବଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣର କୋମଳ ହଦୟଥାନି ମେହେ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ୟରସେ ଉଚ୍ଛଳିତ ହଇତେ ଥାକିତ ତଥନ ହଠାତ୍ ଚାରୁ ଦ୍ରୁତପଦେ ବିଛାନା ହଇତେ ଉଠିଯା ଆସିଯା ସରୋଷ-ସରୋଦନେ ବଲିତ, “ମା, ତୋମରା କୀ ଗୋଲ କରଇ, ଆମାର ଘୁମ ହଞ୍ଚେ ନା ।” ପିତାମାତା ତାହାକେ ଏକଳା ଘୁମାଇତେ ପାଠାଇଯା ତାରାପଦକେ ଘରିଯା ସଂଗୀତ ଉପଭୋଗ କରିଲେହେନ ଇହ ତାହାର ଏକାନ୍ତ ଅସହ ହଇଯା ଉଠିତ ।

ଏଇ ଦୀନ୍ତ୍ରକୃଷ୍ଣନୟନା ବାଲିକାର ସ୍ଵାଭାବିକ ସୁତୀବ୍ରତା ତାରାପଦର ନିକଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌତୁକଜନକ ବୋଧ ହିଁତ । ସେ ଇହାକେ ଗଲ୍ଲ ଶୁନାଇଯା, ଗାନ ଗାହିଯା, ବାଁଶି ବାଜାଇଯା ବଶ କରିତେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଲ କିନ୍ତୁ କିଛୁତେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହଇଲ ନା । କେବଳ ତାରାପଦ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ସଥନ ନଦୀତେ ଶ୍ଵାନ କରିତେ ନାମିତ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଲରାଶିର ମଧ୍ୟେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ସରଲ ତନୁଦେହଥାନି ନାନା ସନ୍ତରଣଭଙ୍ଗିତେ ଅବଲୀଲାକ୍ରମେ ସମ୍ବାଲନ କରିଯା ତରଣ ଜଲଦେବତାର ମତୋ ଶୋଭା ପାଇତ, ତଥନ ବାଲିକାର କୌତୁଳ ଆକୃଷି ନା ହଇଯା ଥାକିତ ନା; ସେ ସେଇ ସମୟଟିର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଯା ଥାକିତ; କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ଆଗ୍ରହ କାହାକେଓ ଜାନିତେ

দিত না, এবং এই অশিক্ষাপটু অভিনেত্রী পশমের গলাবক বোনা একমনে অভ্যাস করিতে করিতে মাঝে মাঝে যেন অত্যন্ত উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদর সন্তুষ্টগলীলা দেখিয়া লইত ।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নন্দীগ্রাম কখন ছাড়াইয়া গেল তারাপদ তাহার খৌজ লইল না । অত্যন্ত মৃদুমন্দ গতিতে বৃহৎ নৌকাখানা কখনো পাল তুলিয়া, কখনো গুণ টানিয়া, নানা নদীর শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল; নৌকারোহীদের দিনগুলি ও এই-সকল নদী-উপনদীর মতো শান্তিময় সৌন্দর্যময় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সহজ সৌম্য গমনে মৃদুমিষ্ট কলস্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল । কাহারও কোনোরূপ তাড়া ছিল না; মধ্যাহ্নে স্বানাহারে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইত; এদিকে, সঙ্গ্য হইতে না হইতেই একটা বড়ো দেখিয়া গ্রামের ধারে, ঘাটের কাছে, বিশ্বিমন্ত্রিত খদ্যোত্থচিত বনের পার্শ্বে নৌকা বাঁধিত ।

এমনি করিয়া দিনদশেকে নৌকা কাঁঠালিয়ায় পৌছিল । জমিদারের আগমনে বাঢ়ি হইতে পালকি এবং টাটুঘোড়ার সমাগম হইল এবং বাঁশের লাঠি হস্তে পাইক-বরকন্দাজের দল ঘন ঘন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে গ্রামের উৎকষ্টিত কাকসমাজকে যৎপরোনাস্তি মুখর করিয়া তুলিল ।

এই-সমস্ত সমারোহে কালবিলম্ব হইতেছে, ইতিমধ্যে তারাপদ নৌকা হইতে দ্রুত নামিয়া একবার সমস্ত গ্রাম পর্যটন করিয়া লইল । কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খুড়া, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসি বলিয়া দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দ্য বন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল । কোথাও তাহার প্রকৃত কোনো বন্ধন ছিল না বলিয়াই এই বালক আশ্চর্য সত্ত্বেও সহজে সকলেরই সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিত । তারাপদ দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল ।

এত সহজে হৃদয় হরণ করিবার কারণ এই, তারাপদ সকলেরই সঙ্গে তাহাদের নিজের মতো হইয়া স্বভাবতই যোগ দিতে পারিত । সে কোনোপ্রকার বিশেষ সংক্ষারের ঘারা বন্ধ ছিল না, অথচ সকল অবস্থা, সকল কাজের প্রতিই তাহার একপ্রকার সহজ প্রবণতা ছিল । বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক অথচ তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র, বৃক্ষের কাছে সে বালক নহে অথচ জ্যাঠাও নহে, রাখালের সঙ্গে সে রাখাল অথচ ব্রাক্ষণ । সকলের সকল কাজেই সে চিরকালের সহযোগীর ন্যায় অভ্যন্তরভাবে হস্তক্ষেপ করে; ময়রার দোকানে গল্প করিতে করিতে ময়রা বলে, “দাদাঠাকুর, একটু বসো তো ভাই, আমি আসছি”— তারাপদ অল্পানবদনে দোকানে বসিয়া একখানা শালপাতা লইয়া সন্দেশের মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হয় । ভিয়ান করিতেও সে মজবুত, তাঁতের রহস্যও তাহার কিছু কিছু জানা আছে, কুমারের চক্রচালনও তাহার সম্পূর্ণ অভ্যাস নহে ।

তারাপদ সমস্ত গ্রামটি আয়ত্ত করিয়া লইল, কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার দীর্ঘ সে এখনো জয় করিতে পারিল না। এই বালিকাটি তারাপদের সুদূরে নির্বাসন তীব্রভাবে কামনা করিতেছে জানিয়াই বোধ করি তারাপদ এই গ্রামে এতদিন আবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তররহস্য ভেদ করা সুকঠিন, চারুশশী তাহার প্রমাণ দিল।

বামুনঠাকুরনের মেয়ে সোনামণি পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়; সে-ই চারুর সমবয়সী সখী। তাহার শরীর অসুস্থ থাকাতে গৃহপ্রত্যাগত সখীর সহিত সে কিছুদিন সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। সুস্থ হইয়া যেদিন দেখা করিতে আসিল সেদিন প্রায় বিনা কারণেই দুই সখীর মধ্যে একটু মনোবিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।

চারু অত্যন্ত ফাঁদিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল তারাপদ-নামক তাহাদের নবার্জিত পরমরত্নটির আহরণকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া সে তাহার সখীর কৌতুহল এবং বিশ্বয় সম্মে চড়াইয়া দিবে। কিন্তু যখন সে শুনিল, তারাপদ সোনামণির নিকট কিছুমাত্র অপরিচিত নহে, বামুনঠাকুরকে সে মাসি বলে এবং সোনামণি তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকে, যখন শুনিল তারাপদ কেবল যে বাঁশিতে কীর্তনের সুর বাজাইয়া মাতা ও কন্যার মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহা নহে, সোনামণির অনুরোধে তাহাকে সহস্ত্রে একটি বাঁশের বাঁশি বানাইয়া দিয়াছে, তাহাকে কতদিন উচ্চশাখা হইতে ফল ও কন্টক-শাখা হইতে ফুল পাড়িয়া দিয়াছে, তখন চারুর অন্তঃকরণে যেন তঙ্গশেল বিধিতে লাগিল। চারু জানিত, তারাপদ বিশেষরূপে তাহাদেরই তারাপদ — অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয়, ইতরসাধারণে তাহার একটু-আধটু আভাসমাত্র পাইবে অথচ কোনোমতে নাগাল পাইবে না, দূর হইতে তাহার রূপে গুণে মুঝ হইবে এবং চারুশশীদের ধন্যবাদ দিতে থাকিবে। এই আশ্চর্য দুর্লভ দৈবলক্ষ ব্রাহ্মণবালকটি সোনামণির কাছে কেন সহজগম্য হইল। আমরা যদি এত যত্ন করিয়া না আনিতাম, এত যত্ন করিয়া না রাখিতাম, তাহা হইলে সোনামণিরা তাহার দর্শন পাইত কোথা হইতে। সোনামণির দাদা! শুনিয়া সর্বশরীর জুলিয়া যায়।

যে তারাপদকে চারু মনে মনে বিদ্বেশশরে জর্জর করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই একাধিকার লইয়া এমন প্রবল উদ্বেগ কেন। — বুঝিবে কাহার সাধ্য।

সেইদিনই অপর একটা তুচ্ছ সূত্রে সোনামণির সহিত চারুর মর্মান্তিক আড়ি হইয়া গেল। এবং সে তারাপদের ঘরে গিয়া তাহার শখের বাঁশিটি বাহির করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া মাড়াইয়া সেটাকে নির্দর্শনাবে ভাঙ্গিতে লাগিল।

চারু যখন প্রচণ্ড আবেগে এই বংশিধৰ্মসকার্যে নিযুক্ত আছে এমন সময় তারাপদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে বালিকার এই প্রলয়মূর্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কহিল, “চারু, আমার বাঁশিটা ভাঙছ কেন।” চারু রক্তনেত্রে রক্তিময়ুৰে “বেশ করছি, খুব করছি” বলিয়া আরো বার দুই-চার বিদীর্ঘ বাঁশির উপর অনাবশ্যক পদাঘাত করিয়া উচ্ছসিত কঁষ্টে কঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তারাপদ বাঁশিটি তুলিয়া উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিল, তাহাতে আর পদার্থ নাই। অকারণে তাহার পুরাতন নিরপরাধ বাঁশিটির এই আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া সে আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। চারুশশী প্রতিদিনই তাহার পক্ষে পরম কৌতুহলের বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহার আর একটি কৌতুহলের ফ্রেজ ছিল মতিলালবাবুর লাইব্রেরিতে ইংরাজি ছবির বইগুলি। বাহিরের সংসারের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির জগতে সে কিছুতেই ভালো করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কল্পনার দ্বারা আপনার মনে অনেকটা পূরণ করিয়া লইত কিন্তু তাহাতে মন কিছুতেই ত্বক্ষিণি মানিত না।

ছবির বহির প্রতি তারাপদের এই আগ্রহ দেখিয়া একদিন মতিলালবাবু বলিলেন, “ইং রেজি শিখবে? তা হলে এ-সমস্ত ছবির মানে বুঝতে পারবে।” তারাপদ তৎক্ষণাত বলিল, “শিখব।”

মতিবাবু খুব খুশি হইয়া গ্রামের এন্টেন্স স্কুলের হেডমাস্টার রামরতনবাবুকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই বালকের ইংরাজি-অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তারাপদ তাহার প্রথম স্মরণশক্তি এবং অথঙ্গ মনোযোগ লইয়া ইংরাজি-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সে যেন এক নৃতন দুর্গম রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইল, পুরাতন সংসারের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখিল না; পড়ার লোকেরা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না; যখন সে সন্ধ্যার পূর্বে নির্জন নদীভীরে দ্রুতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিত তখন তাহার উপাসক বালকসম্পন্দায় দূর হইতে ক্ষুণ্ণচিত্তে সম্মুখে তাহাকে নিরীক্ষণ করিত, তাহার পাঠে ব্যাঘাত করিতে সাহস করিত না।

চারুও আজকাল তাহাকে বড়ো একটা দেখিতে পাইত না। পূর্বে তারাপদ অন্তঃপুরে গিয়া অনুপূর্ণার মেহদৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া আহার করিত— কিন্তু তদুপলক্ষে প্রায় মাঝে মাঝে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইত বলিয়া সে মতিবাবুকে অনুরোধ করিয়া বাহিরে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহাতে অনুপূর্ণা ব্যথিত হইয়া আপনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাবু বালকের অধ্যয়নের উৎসাহে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই নৃতন ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন।

এমন সময় চারুও হঠাৎ জিদ ধরিয়া বসিল, “আমিও ইংরাজি শিখিব।” তাহার পিতামাতা তাহাদের খামখেয়ালি কন্যার এই প্রস্তাবটিকে প্রথমে পরিহাসের বিষয় জ্ঞান করিয়া মেহমিতি হাস্য করিলেন—কিন্তু কন্যাটি এই প্রস্তাবের পরিহাস্য অংশটুকুকে প্রচুর অশ্রুজলধারায় অতি শীঘ্ৰই নিঃশেষে ধোত করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে এই মেহদুর্বল নিরূপায় অভিভাবকদ্বয় বালিকার প্রস্তাৱ গঞ্জিৱভাবে গ্রাহ্য করিলেন। চারু মাস্টারের নিকট তারাপদের সহিত একত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু পড়াশুনা করা এই অস্ত্রিচিত্ত বালিকার স্বভাবসংগত ছিল না। সে নিজে কিছু শিখিল না, কেবল তারাপদের অধ্যয়নে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। সে পিছাইয়া

পড়ে, পড়া মুখস্থ করে না, কিন্তু তবু কিছুতেই তারাপদর পশ্চাদ্বর্তী হইয়া থাকিতে চাহে না। তারাপদ তাহাকে অতিক্রম করিয়া নৃতন পড়া লইতে গেলে সে মহা রাগারাগি করিত, এমন-কি কান্নাকাটি করিতে ছাড়িত না। তারাপদ পুরাতন বই শেষ করিয়া নৃতন বই কিনিলে তাহাকেও সেই নৃতন বই কিনিয়া দিতে হইত। তারাপদ অবসরের সময় নিজে ঘরে বসিয়া লিখিত এবং পড়া মুখস্থ করিত, ইহা সেই দীর্ঘাপরায়ণ কন্যাটির সহ্য হইত না; সে গোপনে তাহার লেখা খাতায় কালি ঢালিয়া আসিত, কলম চুরি করিয়া রাখিত, এমন-কি বইয়ের যেখানে অভ্যাস করিবার, সেই অংশটি ছিড়িয়া আসিত। তারাপদ এই বালিকার অনেক দৌরাত্ম্য সকৌতুকে সহ্য করিত, অসহ্য হইলে মারিত, কিন্তু কিছুতেই শাসন করিতে পারিত না।

দৈবাং একটা উপায় বাহির হইল। একদিন বড়ো বিরক্ত হইয়া নিরূপায় তারাপদ তাহার মসীবিলুপ্ত লেখা খাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া গঞ্জীর বিষগ্নমুখে বসিয়া ছিল; চারু দ্বারের কাছে আসিয়া মনে করিল, আজ মার খাইবে। কিন্তু তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না। তারাপদ একটি কথামাত্র না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকা ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘুরঘুর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারংবার এত কাছে ধরা দিল যে তারাপদ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা না দিয়া গঞ্জীর হইয়া রহিল। বালিকা মহা মুশকিলে পড়িল। কেমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কোনোকালেই অভ্যাস ছিল না, অথচ অনুতঙ্গ ক্ষুদ্র হৃদয়টি তাহার সহপাঠীর ক্ষমালাভের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অবশ্যে কোনো উপায় না দেখিয়া ছিন্ন খাতার এক টুকরা লইয়া তারাপদর নিকটে বসিয়া খুব বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল, “আমি আর কখনো খাতায় কালি মাখাব না।” লেখা শেষ করিয়া সেই লেখার প্রতি তারাপদর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেকপ্রকার চার্ঝল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিয়া তারাপদ হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না —হাসিয়া উঠিল। তখন বালিকা লজ্জায় ক্ষেত্রে ক্ষিণ হইয়া উঠিয়া ঘর হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যে কাগজের টুকরায় সে স্থানে দীনতা প্রকাশ করিয়াছে সেটা অনন্ত কাল এবং অনন্ত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ লোপ করিতে পারিলে তবে তাহার হৃদয়ের নিদারণ ক্ষেত্র মিটিতে পারিত।

এদিকে সংকুচিতচিন্ত সোনামণি দুই-একদিন অধ্যয়নশালার বাহিরে উকিবুকি মারিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। সর্বী চারুশঙ্খীর সহিত তাহার সকল বিষয়েই হৃদয়তা ছিল, কিন্তু তারাপদর সম্বন্ধে চারুকে সে অন্তিম ভয় এবং সন্দেহের সহিত দেখিত। চারু যে সময়ে অন্তঃপুরে থাকিত, সেই সময়টি বাছিয়া সোনামণি সসংকোচে তারাপদর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। তারাপদ বই হইতে মুখ তুলিয়া সম্মেহে বলিত, “কী সোনা, খবর কী। মাসি কেমন আছে।”

সোনামণি কহিত, “অনেকদিন যাও নি, মা তোমাকে একবার যেতে বলেছে। মার কোমরে ব্যথা বলে দেখতে আসতে পারে না।”

এমন সময় হয়তো হঠাৎ চারু আসিয়া উপস্থিত। সোনামণি শশব্যস্ত। সে যেন গোপনে তাহার সাথীর সম্পত্তি চুরি করিতে আসিয়াছিল। চারু কঠস্বর সঙ্গমে চড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিত, “অ্যাং সোনা! তুই পড়ার সময় গোল করতে এসেছিস, আমি এখনই বাবাকে গিয়ে বলে দেব।” যেন তিনি নিজে তারাপদর একটি প্রবীণা অভিভাবিকা; তাহার পড়াশুনায় লেশমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে রাত্রিদিন ইহার প্রতিই তাহার একমাত্র দৃষ্টি। কিন্তু সে নিজে কী অভিথায়ে এই অসময়ে তারাপদর পাঠগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না এবং তারাপদও তাহা ভালোৱাপে জানিত। কিন্তু সোনামণি বেচারা ভীত হইয়া তৎক্ষণাত্ এককাশ মিথ্যা কৈফিয়ত সৃজন করিত; অবশ্যে চারু যখন ঘৃণাভৰে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সম্ভাষণ করিত তখন সে লজ্জিত শক্তি পরাজিত হইয়া ব্যথিতচিত্তে ফিরিয়া যাইত। দয়ার্দ তারাপদ তাহাকে ডাকিয়া বলিত, “সোনা, আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি তোদের বাড়ি যাব এখন।” চারু সপিণীর মতো ফোস করিয়া উঠিয়া বলিত, “যাবে বৈকি। তোমার পড়া করতে হবে না? আমি মাটোরমশায়কে বলে দেব না?”

চারুর এই শাসনে ভীত না হইয়া তারাপদ দুই-একদিন সন্ধ্যার পর বামুন্ঠাকরণের বাড়ি গিয়াছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ বারে চারু ফাঁকা শাসন না করিয়া আস্তে আস্তে এক সময় বাহির হইতে তারাপদর ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিয়া মার মসলার বাক্সের চাবিতালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সমস্ত সন্ধ্যাবেলা তারাপদকে এইরপ বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আহারের সময় দ্বার খুলিয়া দিল। তারাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখন অনুতঙ্গ ব্যাকুল বালিকা করজোড়ে সানুনয়ে বারংবার বলিতে লাগিল, “তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর আমি এমন করব না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি খেয়ে যাও।” তাহাতেও যখন তারাপদ বশ মানিল না, তখন সে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল; তারাপদ সংকটে পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিল।

চারু কতবার একান্তমনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে তারাপদর সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, আর কখনো তাহাকে মুহূর্তের জন্য বিরক্ত করিবে না, কিন্তু সোনামণি প্রভৃতি আর পাঁচজন মাঝে আসিয়া পড়াতে কখন তাহার কিরূপ মেজাজ হইয়া যায়, কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারে না। কিছুদিন যখন উপরি-উপরি সে ভালোমানুষি করিতে থাকে, তখনই একটা উৎকট আসন্ন বিপ্লবের জন্য তারাপদ সতর্কভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। আক্রমণটা হঠাৎ কী উপলক্ষে কোন দিক হইতে আসে কিছুই বলা যায় না। তাহার পরে প্রচণ্ড বাড়ি, ঝাড়ের পরে প্রচুর অঞ্চলবির৷ণ, তাহার পরে প্রসন্ন মিঞ্চ শান্তি।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এমন করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিল। এত সুনীর্ধকালের জন্য তারাপদ কখনো কাহারও নিকট ধরা দেয় নাই। বোধ করি, পড়াশুনার মধ্যে তাহার মন এক অপূর্ব আকর্ষণে বন্ধ হইয়াছিল; বোধ করি, বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন

আরঞ্জ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের সুখসঙ্কলন ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল; বোধ করি, তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিয়তদৌয়াজ্যচক্ষণ সৌন্দর্য অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।

এ দিকে চারুক বয়স এগারো উপরীগ হইয়া যায়। মতিবাবু সন্ধান করিয়া তাহার মেয়ের বিবাহের জন্য দুই-তিনটি ভালো ভালো সম্বন্ধ আনাইলেন। কন্যার বিবাহবয়স উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মতিবাবু তাহার ইংরাজি পড়া এবং বাহিরে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক অবরোধে চারু ঘরের মধ্যে ভারি একটা আন্দোলন উপস্থিত করিল।

তখন একদিন অন্নপূর্ণা মতিবাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, “পাত্রের জন্যে তুমি অত খোঁজ করে বেড়াচ্ছ কেন। তারাপদ ছেলেটি তো বেশ। আর তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে।”

শুনিয়া মতিবাবু অত্যন্ত বিশ্঵ায় প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, “সেও কি কখনো হয়। তারাপদের কুলশীল কিছুই জানা নেই। আমার একটিমাত্র মেয়ে, আমি ভালো ঘরে দিতে চাই।”

একদিন রায়ডাঙ্গার বাবুদের বাড়ি হইতে মেয়ে দেখিতে আসিল। চারুকে বেশভূষা পরাইয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হইল। সে শোবার ঘরের দ্বার ঝুঁক্দ করিয়া বসিয়া রহিল—কিছুতেই বাহির হইল না। মতিবাবু ঘরের বাহির হইতে অনেক অনুনয় করিলেন, ভর্সনা করিলেন, কিছুতেই ফল হইল না। অবশেষে বাহিরে আসিয়া রায়ডাঙ্গার দৃতবর্গের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইল, কন্যার হঠাতে অত্যন্ত অসুখ করিয়াছে, আজ আর দেখানো হইবে না। তাহারা ভাবিল, মেয়ের বুঝি কোনো-একটা দোষ আছে, তাই এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করা হইল।

তখন মতিবাবু ভাবিতে লাগিলেন, তারাপদ ছেলেটি দেখিতে শুনিতে সকল হিসাবেই ভালো; উহাকে আমি ঘরেই রাখিতে পারিব, তাহা হইলে আমার একমাত্র মেয়েটিকে পরের বাড়ি পাঠাইতে হইবে না। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাহার অশান্ত অবাধ্য মেয়েটির দুরস্তপনা তাহাদের মেহের চক্ষে যতই মার্জনীয় বোধ হউক ষষ্ঠুরবাড়িতে কেহ সহ্য করিবে না।

তখন স্ত্রী-পুরুষে অনেক আলোচনা করিয়া তারাপদের দেশে তাহার সমস্ত কৌলিক সংবাদ সন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। খবর আসিল যে, বৎস ভালো কিন্তু দরিদ্র। তখন মতিবাবু ছেলের মা এবং ভাইয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। তাহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সম্মতি দিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কাঁঠালিয়ায় মতিবাবু এবং অন্নপূর্ণা বিবাহের দিনক্ষণ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাবু কথাটা গোপনে রাখিলেন।

চারুকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে মাঝে মাঝে বর্গির হাঙ্গামার মতো তারাপদের

পাঠগৃহে গিয়া পড়িত । কখনো রাগ, কখনো অনুরাগ, কখনো বিরাগের দ্বারা তাহার পাঠচর্যার নিভৃত শাস্তি অক্ষমাং তরঙ্গিত করিয়া তুলিত । তাহাতে আজকাল এই নির্লিঙ্গ মুক্তিভাব ব্রাহ্মণবালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব চাঞ্চল্য-সংগ্রাম হইত । যে ব্যক্তির লঘুভাব চিত্ত চিরকাল অক্ষুণ্ণ অব্যাহত ভাবে কালস্ন্যাতের তরঙ্গচূড়ায় ভাসমান হইয়া সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত সে আজকাল এক-একবার অন্যমনক্ষ হইয়া বিচ্ছিন্ন দিবাস্থপুঁজালের মধ্যে জড়িভূত হইয়া পড়ে । এক-একদিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সে মতিবাবুর লাইব্রেরিয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতে থাকিত; সেই ছবিগুলির মিশ্রণে যে কল্পনালোক সৃজিত হইত তাহা পূর্বেকার হইতে অনেক স্বতন্ত্র এবং অধিকতর রঙিন । চারুর অন্তু আচরণ লক্ষ্য করিয়া সে আর পূর্বের মতো স্বভাবত পরিহাস করিতে পারিত না, দুষ্টামি করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না । নিজের এই গৃহ পরিবর্তন, এই আবন্ধ আসঙ্গ ভাব তাহার নিজের কাছে এক নৃতন স্বপ্নের মতো মনে হইতে লাগিল ।

শ্রাবণ মাসে বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া মতিবাবু তারাপদের মা ও ভাইদের আনিতে পাঠাইলেন, তারাপদকে তাহা জানিতে দিলেন না । কলিকাতার মোকাবীরকে গড়ের বাদ্য বায়না দিতে আদেশ করিলেন এবং জিনিসপত্রের ফর্দ পাঠাইয়া দিলেন ।

আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল । গ্রামের নদী এতদিন শুক্ষ্মায় হইয়া ছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক-একটা ডোবায় জল বাধিয়া থাকিত; ছোটো ছোটো নৌকা সেই পঙ্কিল জলে ডোবানো ছিল এবং শুক্ষ্ম নদীপথে গোরুর গাড়ি চলাচলের সুগভীর চক্রচিহ্ন খোদিত হইতেছিল— এমন সময় একদিন, পিতৃগৃহপ্রত্যাগত পার্বতীর মতো, কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্যসহকারে গ্রামের শূন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল— উলঙ্গ বালকবালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চেঃস্থরে নৃত্য করিতে লাগিল, অত্থ আনন্দে বারষার জলে ঝাপ দিয়া দিয়া নদীকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে লাগিল, কুটিরবাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়সঙ্গিনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল— শুক্ষ্ম নিঞ্জীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এক প্রবল বিপুল প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল । দেশবিদেশ হইতে বোঝাই হইয়া ছোটো বড়ো নানা আয়তনের নৌকা আসিতে লাগিল, বাজারের ঘাট সন্ধ্যাবেলায় বিদেশী মাঝির সংগীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল । দুই তীরের গ্রামগুলি সম্মুখের আপনার নিভৃত কোণে আপনার শুন্দু ঘরকন্না লইয়া একাকিনী দিনযাপন করিতে থাকে, বর্ষার সময় বাহিরের বৃহৎ পৃথিবী বিচ্ছিন্ন পণ্যেগুহার লইয়া গৈরিকবর্ণ জলরথে চড়িয়া এই গ্রামকন্যকাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে; তখন জগতের সঙ্গে আঞ্চলিকভাবে কিছুদিনের জন্য তাহাদের শুন্দুতা ঘুচিয়া যায়, সমস্তই সচল সজাগ সজীব হইয়া উঠে এবং মৌন নিষ্ঠক দেশের মধ্যে সুদূর রাজ্যের কলালাপঞ্চনি আসিয়া চারি দিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে ।

এই সময়ে কুড়ুলকাটায় নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথ্যাত্রার মেলা হইবে ।

জ্যোৎস্নাসন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল, কোনো নৌকা নাগরদোলা, কোনো নৌকা যাত্রার দল, কোনো নৌকা পণ্ড্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্ন্মাতের মুখে দ্রুতবেগে মেলা অভিমুখে চলিয়াছে; কলিকাতার কন্স্টের দল বিপুলশব্দে দ্রুততালের বাজনা জুড়িয়া দিয়েছে; যাত্রার দল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাহাঃ শব্দে চীৎকার উঠিতেছে; পশ্চিমদেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাঙ্গলো কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মাণ্ড উৎসাহে বিনা সংগীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে—উদ্বীপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে পূর্বদিগন্ত হইতে ঘনমেঘরাশি প্রকাও কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়ল, চাঁদ আছন্দ হইল— পূর্বেবাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে শ্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীরবর্তী আনন্দালিত বনশ্রেণীর মধ্যে অঙ্ককার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, যিন্তিধনি যেন করাত দিয়া অঙ্ককারকে চিরিতে লাগিল। সমুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা—চাকা ঘুরিতেছে, ধৰ্জা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুন্দর অঙ্ককার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর এক তীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়া গ্রাম আপন কুটিরঘার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘূর্মাইতে লাগিল।

পরদিন তারাপদের মাতা ও ভাতাগণ কাঁঠালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পরদিন কলিকাতা হইতে বিবিধসামগ্ৰীপূৰ্ণ তিনখানা বড়ো নৌকা আসিয়া কাঁঠালিয়ার জমিদারি কাছাকাছির ঘাটে লাগিল এবং পরদিন অতি প্রাতে সোনামণি কাগজে কিঞ্চিত্ত আমসন্ত এবং পাতার ঠোঙায় কিঞ্চিত্ত আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদের পাঠগৃহদ্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঢ়াইল—কিন্তু পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না। মেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্ৰবক্ষন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূৰ্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চূরি করিয়া একদা বৰ্ষার মেঘাঙ্ককার রাত্রে এই ব্ৰাহ্মণবালক আসজিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।

## ইচ্ছাপূরণ

সুবলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সুশীলচন্দ্র । কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মানুষটি হয় না । সেইজন্যই সুবলচন্দ্র কিছু দুর্বল ছিলেন এবং সুশীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না ।

ছেলেটি পাড়াসুন্দ লোককে অঙ্গীর করিয়া বেড়াইত, সেইজন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলেটি হরিগের মতো দৌড়িতে পারিত; কাজেই কিল চড় চাপড় সকল সময় ঠিক জায়গায় গিয়া পড়িত না । কিন্তু সুশীলচন্দ্র দৈবাং যেদিন ধরা পড়িতেন, সেদিন তাহার আর রক্ষা থাকিত না ।

আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় ক্ষুলের ছুটি ছিল, কিন্তু আজ ক্ষুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতেছিল না । তাহার অনেকগুলা কারণ ছিল । একে তো আজ ক্ষুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও পাড়ার বোসেদের বাড়ি আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে । সকাল হইতে সেখানে ধূমধাম চলিতেছে । সুশীলের ইচ্ছা, সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয় ।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে ক্ষুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শইয়া পড়িল । তাহার বাপ সুবল গিয়া জিজাসা করিলেন, “কী রে, বিছানায় পড়ে আছিস যে । আজ ইক্ষুলে যাবি নে?”

সুশীল বলিল, “আমার পেট কামড়াচ্ছে, আজ আমি ইক্ষুলে যেতে পারব না ।”

সুবল তাহার মিথ্যা কথা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন । মনে মনে বলিলেন, ‘রোসো, একে আজ জন্ম করতে হবে ।’ এই বলিয়া কহিলেন, “পেট কামড়াচ্ছে ? তবে আর তোর কোথাও গিয়ে কাজ নেই । বোসেদের বাড়ি বাজি দেখতে হরিকে একলাই পাঠিয়ে দেব এখন । তোর জন্যে আজ লজঞ্জুস কিনে রেখেছিলুম, সেও আজ খেয়ে কাজ নেই । তুই এখানে চূপ করে পড়ে থাক, আমি খানিকটা পাঁচন তৈরি করে নিয়ে আসি ।”

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া সুবলচন্দ্র খুব তিতো পাঁচন তৈয়ার করিয়া আনিতে গেলেন । সুশীল মহা মুশকিলে পড়িয়া গেল । লজঞ্জুস সে যেমন ভালোবাসিত পাঁচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সর্বনাশ বোধ হইত । ও দিকে আবার বোসেদের বাড়ি যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছটফট করিতেছে, তাহাও বুঝি বক্ষ হইল ।

সুবলবাবু যখন খুব বড়ো এক বাটি পাঁচন লইয়া ঘরে ঢুকিলেন সুশীল বিছানা

হইতে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল, “আমার পেট কামড়ানো একেবাবে সেৱে  
গেছে, আমি আজ ইঙ্গুলে ঘাব ।”

বাবা বলিলেন, “না না, সে কাজ নেই, তুই পাঁচন খেয়ে এইখানে চুপচাপ করে  
শুয়ে থাক ।” এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাঁচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা  
লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন ।

সুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্তদিন ধরিয়া কেবল মনে করিতে  
লাগিল যে, ‘আহা, যদি কালই আমার বাবার মতো বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছা তাই  
করতে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ করে রাখতে পারে না ।’

তাহার বাপ সুবলবাবু বাহিরে একলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে,  
‘আমার বাপ মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন বলেই তো আমার ভালোরকম  
পড়াশুনো কিছু হল না । আহা, আবার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই তা হলে  
আর কিছুতেই সময় নষ্ট না করে কেবল পড়াশুনো করে নিই ।’

ইচ্ছাটাকৰ্ম সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া যাইতেছিলেন । তিনি বাপের ও  
ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, আচ্ছা, ভালো, কিছুদিন ইহাদের  
ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক ।

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, “তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে । কাল হইতে  
তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে ।” ছেলেকে গিয়া বলিলেন, “কাল হইতে তুমি  
তোমার বাপের বয়সী হইবে ।” শুনিয়া দুইজনে ভারি খুশি হইয়া উঠিলেন ।

বৃক্ষ সুবলচন্দ্র রাত্রে ভালো ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটায় ঘুমাইতেন ।  
কিন্তু আজ তাহার কী হইল, হঠাৎ খুব ভোরে উঠিয়া একেবাবে লাফ দিয়া বিছানা  
হইতে নামিয়া পড়িলেন । দেখিলেন, খুব ছোটো হইয়া গেছেন; পড়া দাঁত সবগুলি  
উঠিয়াছে; মুখের গৌফদাঢ়ি সমস্ত কোথায় গেছে, তাহার আর চিহ্ন নাই । রাত্রে যে  
ধূতি এবং জামা পরিয়া শুইয়াছিলেন, সকালবেলায় তাহা এত ঢিলা হইয়া গেছে যে,  
হাতের দুই আস্তিন প্রায় মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, জামার গলা বুক পর্যন্ত  
নাবিয়াছে, ধূতির কোঁচাটা এতই লুটাইতেছে যে, পা ফেলিয়া চলাই দায় ।

আমাদের সুশীলচন্দ্র অন্যদিন ভোরে উঠিয়া চারি দিকে দৌরান্ত্য করিয়া বেড়ান,  
কিন্তু আজ তাহার ঘুম আর ভাঙে না; যখন তাহার বাপ সুবলচন্দ্রের চেঁচামেচিতে  
জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিল, কাপড়চোপড়গুলো গায়ে এমনি আঁটিয়া গেছে যে,  
ছিড়িয়া ফাটিয়া কুটিকুটি হইবার জো হইয়াছে; শরীরটা সমস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে;  
কাঁচা-পাকা গোফে-দাঢ়িতে অর্ধেকটা মুখ দেখাই যায় না; মাথায় একমাথা চুল  
ছিল, হাত দিয়া দেখে, সামনে চুল নাই — পরিষ্কার টাক তক করিতেছে ।

আজ সকালে সুশীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিতেই চায় না । অনেকবার তুড়ি দিয়া  
উচৈঃহরে হাই তুলিল; অনেকবার এপাশ-ওপাশ করিল; শেষকালে বাপ  
সুবলচন্দ্রের গোলমালে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল ।

দুইজনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভারি মুশকিল বাধিয়া গেল ।  
আগেই বলিয়াছি, সুশীলচন্দ্র মনে করিত যে, সে যদি তাহার বাবা সুবলচন্দ্রের মতো

বড়ো এবং স্বাধীন হয়, তবে যেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া, জলে ঝাপ দিয়া, কাঁচা আম খাইয়া, পাথির বাঢ়া পাড়িয়া, দেশময় ঘূরিয়া বেড়াইবে; যখন ইচ্ছা ঘরে আসিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই, সেদিন সকালে উঠিয়া তাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল না। পানাপুরুটা দেখিয়া তাহার মনে হইল, ইহাতে ঝাপ দিলেই আমার কাঁপুনি দিয়া জুর আসিবে। চুপচাপ করিয়া দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খেলাধুলাগুলো একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় না, একবার চেষ্টা করিয়াই দেখা যাক। এই ভাবিয়া, কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেকরকম চেষ্টা করিল। কাল যে গাছটাতে কাঠবিড়ালির মতো তরু তরু করিয়া চড়িতে পারিত, আজ বুড়া শরীর লইয়া সে গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিল না; নিচেকার একটা কঢ়ি ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙিয়া গেল এবং বুড়া সুশীল ধপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা বুড়াকে ছেলেমানুষের মতো গাছে চড়িতে ও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অঙ্গুই হইয়া গেল। সুশীলচন্দ্ৰ লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া আবার সেই দাওয়ায় মাদুরে আসিয়া বসিল। চাকরকে বলিল, “ওৱে, বাজার থেকে এক টাকার লজ্জুস কিনে আন।”

লজ্জুসের প্রতি সুশীলচন্দ্ৰের বড়ো লোভ ছিল। স্কুলের ধারে দোকানে সে রোজ নানা রঙের লজ্জুস সাজানো দেখিত; দু-চার পয়সা যাহা পাইত, তাহাতেই লজ্জুস কিনিয়া খাইত; মনে করিত, যখন বাবার মতো টাকা হইবে, তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজ্জুস কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকায় একরাশ লজ্জুস কিনিয়া আনিয়া দিল; তাহারই একটা লইয়া সে দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিয়া ছুঁষিতে লাগিল; কিন্তু বুড়ার মুখে ছেলেমানুষের লজ্জুস কিছুতেই ভালো লাগিল না। একবার ভাবিল, এগুলো আমার ছেলেমানুষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক; আবার তখনই মনে হইল, না কাজ নাই, এত লজ্জুস খাইলে উহার আবার অসুখ করিবে।

কাল পর্যন্ত যে সকল ছেলে সুশীলচন্দ্ৰের সঙ্গে কপাটি খেলিয়াছে, আজ তাহারা সুশীলের সঙ্গানে আসিয়া বুড়ো সুশীলকে দেখিয়া দূরে ছুটিয়া গেল।

সুশীল ভাবিয়াছিল, বাপের মতো স্বাধীন হইলে তাহার সমস্ত ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে সমস্তদিন ধরিয়া কেবলই ডুড় ডুড় শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে; কিন্তু আজ রাখাল গোপাল অঙ্গুয় নিবারণ হুরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল; ভাবিল, চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, এখনই বুঝি ছোঁড়াগুলো গোলমাল বাধাইয়া দিবে।

আগেই বলিয়াছি, বাবা সুবলচন্দ্ৰ প্রতিদিন দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেন, যখন ছোটো ছিলাম তখন দুষ্টামি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্তদিন শান্ত শিষ্ট হইয়া, ঘরে দৰজা বন্ধ করিয়া বসিয়া, কেবলই

বই লইয়া পড়া মুখস্থ করি। এমন-কি সন্ধ্যার পরে ঠাকুরমার কাছে গল্প শোনাও বন্ধ করিয়া প্রদীপ জুলাইয়া রাত্রি দশটা এগারোটা পর্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইয়া সুবলচন্দ্র কিছুতেই স্কুলমুখে হইতে চাহেন না। সুশীল বিরত হইয়া আসিয়া বলিত, “বাবা, ইঙ্গুলে যাবে না?” সুবল মাথা চুলকাইয়া মুখ নিচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেন, “আজ আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি ইঙ্গুলে যেতে পারব না।” সুশীল রাগ করিয়া বলিত, “পারবে না বৈকি? ইঙ্গুলে যাবার সময় আমার অমন চের পেট কামড়েছে, আমি ও-সব জানি।”

বাস্তবিক সুশীল এতরকম উপায়ে স্কুল প্লাইত এবং সে এত অল্পদিনের কথা যে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম নহে। সুশীল জোর করিয়া স্কুল বাপটিকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের ছুটির পরে সুবল বাড়ি আসিয়া খুব একচোট ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য অস্ত্রির হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে বৃন্দ সুশীলচন্দ্র চোখে চশমা দিয়া একখানা ক্ষতিবাসের রামায়ণ লইয়া সুর করিয়া করিয়া পড়িত, সুবলের ছুটাছুটি-গোলমালে তাহার পড়ার ব্যাঘাত হইত। তাই সে জোর করিয়া সুবলকে ধরিয়া আনিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা স্লেট দিয়া আঁক কষিতে দিত। আঁকগুলো এমনি বড়ো বড়ো বাছিয়া দিত যে, তাহার একটা কষিতেই তাহার বাপের এক ঘন্টা চলিয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলায় বুড়া সুশীলের ঘরে অনেক বুড়ায় মিলিয়া দাবা খেলিত। সে সময়টায় সুবলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুশীল একজন মাস্টার রাখিয়া দিল; মাস্টার রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে সুশীলের বড়ো কড়াকড় ছিল। কারণ তাহার বাপ সুবল যখন বৃন্দ ছিলেন তখন তাহার খাওয়া ভালো হজম হইত না, একটু বেশি খাইলে অস্ত্র হইত—সুশীলের সে কথাটা বেশ মনে আছে; সেইজন্য সে তাহার বাপকে কিছুতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অল্প বয়স হইয়া আজকাল তাহার এমনি ক্ষুধা হইয়াছে যে, নুড়ি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সুশীল তাহাকে যতই অল্প খাইতে দিত, পেটের জুলায় তিনি ততই অস্ত্রির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শুকাইয়া তাহার সর্বাঙ্গের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। সুশীল ভাবিল, শক্ত ব্যামো হইয়াছে, তাই কেবলই ঔষধ গিলাইতে লাগিল।

বুড়া সুশীলেরও বড়ো গোল বাধিল। সে তাহার পূর্বকালের অভ্যাসমত যাহা করে তাহাই তাহার সহ্য হয় না। পূর্বে সে পাড়ায় কোথাও যাত্রাগানের খবর পাইলেই, বাড়ি হইতে পালাইয়া, হিমে হোক, বৃষ্টিতে হোক, সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া, সর্দি হইয়া, কাশি হইয়া, গায়ে মাথায় ব্যথা হইয়া, তিন হঞ্চা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রাহিল। চিরকাল সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহাই করিতে গিয়া হাতের গাঁট, পায়ের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল; তাহার চিকিৎসা করিতে ছয় মাস গেল। তাহার পর হইতেই দুই দিন অন্তর সে গরম জলে স্নান করিত এবং সুবলকেও কিছুতেই পুকুরে স্নান করিতে দিত না। পূর্বেকার অভ্যাসমত, ভুলিয়া তক্ষপোষ

হইতে সে লাফ দিয়া নামিতে যায়, আর হাড়গুলা টন্টন্ ঝন্বান্ করিয়া উঠে। দুখের মধ্যে আন্ত পান পূরিয়াই হঠাতে দেখে, দাঁত নাই, পান চিবানো অসাধ্য। ভুলিয়া চিরকনি ব্রুশ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে, প্রায় সকল মাথাতেই টাক। এক-একদিন হঠাতে ভুলিয়া যাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সী বুড়া হইয়াছে এবং ভুলিয়া পূর্বের অভ্যাসমত দুষ্টামি করিয়া পাড়ার বুড়ি আন্দিপিসির জলের কলসে হঠাতে টন্টন্ করিয়া চিলা ছুঁড়িয়া মারিত—বুড়োমানুষের এই ছেলেমানুষ দুষ্টামি দেখিয়া লোকেরা তাহাকে মারু মারু করিয়া তাড়াইয়া যাইত, সে'ও লজ্জায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

সুবলচন্দ্রও এক-একদিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে আজকাল ছেলেমানুষ হইয়াছে। আপনাকে পূর্বের মতো বুড়া মনে করিয়া, যেখানে বুড়োমানুষেরা তাসপাশা খেলিতেছে সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং বুড়ার মতো কথা বলিত; শুনিয়া সকলেই তাহাকে “যা যা, খেলা কর গে যা, জ্যাঠামি করতে হবে না” বলিয়া কান ধরিয়া বিদায় করিয়া দিত। হঠাতে ভুলিয়া মাস্টারকে গিয়া বলিত, “দাও তো, তামাকটা দাও তো, খেয়ে নিই।” শুনিয়া মাস্টার তাহাকে বেঞ্চের উপর একপায়ে দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, “ওরে বেজা, কদিন আমাকে কামাতে আসিস নি কেন।” নাপিত ভাবিত, ছেলেটি খুব ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে। সে উত্তর দিত, “আর বছর দশকে বাদে আসব এখন।” আবার এক-একদিন তাহার পূর্বের অভ্যাসমত তাহার ছেলে সুশীলকে গিয়া মারিত। সুশীল ভাবি রাগ করিয়া বলিত, “পড়াশুনো করে তোমার এই বুদ্ধি হচ্ছে! একরণ্তি ছেলে হয়ে বুড়োমানুষের গায়ে হাত তোল?” অমনি চারিদিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া, কেহ কিল কেহ চড় কেহ গালি দিতে আরঞ্জ করে।

তখন সুবল একান্তমনে প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, “আহা, যদি আমি আমার ছেলে সুশীলের মতো বুড়ো হই এবং স্বাধীন হই, তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই।”

সুশীলও প্রতিদিন জোড়হাত করিয়া বলে, “হে দেবতা, বাপের মতো আমাকে ছেটো করিয়া দাও, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা যেরকম দুষ্টামি আরঞ্জ করিয়াছেন, উহাকে আর আমি সামলাইতে পারি না, সর্বদা ভাবিয়া অঙ্গুর হইলাম।”

তখন ইচ্ছাঠাকরুন আসিয়া বলিলেন, “কেমন, তোমাদের শখ মিটিয়াছে?”

তাঁহারা দুইজনেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, “দোহাই ঠাকরুন, মিটিয়াছে। এখন আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদিগকে তাহাই করিয়া দাও।”

ইচ্ছাঠাকরুন বলিলেন, “আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।”

পরদিন সকালে সুবল পূর্বের মতো বুড়া হইয়া এবং সুশীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দুইজনেরই মনে হইল যে, স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছি। সুবল গলা ভার করিয়া বলিলেন, “সুশীল, ব্যাকরণ মুখস্থ করবে না?”

সুশীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, “বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে।”

## বলাই

মানুষের জীবনটা পৃথিবীর নানা জীবের ইতিহাসের নানা পরিচ্ছেদের উপসংহারে, এমন একটা কথা আছে। লোকালয়ে মানুষের মধ্যে আমরা নানা জীবজন্তুর প্রচন্দ পরিচয় পেয়ে থাকি, সে কথা জানা। বন্ধুত আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক ক'রে নিয়েছে—আমাদের বাঘ-গোরঙ্কে এক খোয়াড়ে দিয়েছে পুরে অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধ'রে রেখেছে। যেমন, রাগিণী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সংগীত ক'রে তোলে—তার পর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না—কিন্তু, সংগীতের ভিতরে এক-একটি সূর অন্য সকল সূরকে ছাড়িয়ে বিশেষ হয়ে ওঠে, কোনোটাতে মধ্যম, কোনোটাতে কোমলগাঙ্কার, কোনোটাতে পঞ্চম।

আমার ভাইপো বলাই—তার প্রকৃতিতে কেমন করে গাছপালার মূল সূরগুলোই হয়েছে প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই চুপচাপ চেয়ে চেয়ে দেখাই তার অভ্যাস, ন'ড়েচ'ড়ে বেড়ানো নয়। পুরদিকের আকাশে কালো মেঘ তরে তরে স্তুতি হয়ে দাঁড়ায়, ওর সমস্ত মনটাতে ভিজে হাওয়া যেন শ্রাবণ-অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘনিয়ে ওঠে; ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি পড়ে, ওর সমস্ত গা যেন শুনতে পায় সেই বৃষ্টির শব্দ। ছাদের উপর বিকেলবেলাকার রোদ্দুর প'ড়ে আসে, গা খুলে বেড়ায়; সমস্ত আকাশ থেকে যেন কী-একটা সংগ্রহ ক'রে নেয়। মাঘের শেষে আমের বোল ধরে, তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্ষের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে; ফাল্বনে পুল্পিত শালবনের মতোই ওর অন্তর-প্রকৃতিটা চারদিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভ'রে ওঠে তাতে একটা ঘন রঙ লাগে। তখন ওর একলা ব'সে ব'সে আপন-মনে কথা কইতে ইচ্ছে করে, যা-কিছু গল্প শনেছে সব নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে; অতি পুরানো বটের কোটরে বাসা বেঁধে আছে যে এক-জোড়া অতি পুরানো পাখি, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, তাদের গল্প। ঐ ড্যাবা-ড্যাবা-চোখ-মেলে-সর্বদা-তাকিয়ে-থাকা ছেলেটা বেশি কথা কইতে পারে না। তাই ওকে মনে মনে অনেক বেশি ভাবতে হয়। ওকে একবার পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ ঘাস পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে পর্যন্ত নেবে গিয়েছে, সেইটে দেখে আর ওর মন ভারি খুশি হয়ে ওঠে। ঘাসের আন্তরণ্টা একটা স্থির পদার্থ তা ওর মনে হয় না; ওর বোধ হয়, যেন ঐ ঘাসের পুঁজি একটা গড়িয়ে-চলা খেলা, কেবলই গড়াচ্ছে। প্রায়ই

তারই সেই ঢালু বেয়ে ও নিজেও গড়াত—সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত—গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগত আর ও খিল খিল ক'রে হেসে উঠত।

রাত্রে বৃষ্টির পর প্রথম সকালে সামনের পাহাড়ের শিখর দিয়ে কাঁচা সোনারঙ্গের রোদুর দেবদারুবনের উপরে এসে পড়ে—ও কাউকে না বলে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই দেবদারুবনের নিষ্ঠুর ছায়াতলে একলা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গা ছম্ ছম্ করে—এই-সব প্রকাণ গাছের ভিতরকার মানুষকে ও যেন দেখতে পায়; তারা কথা কয় না, কিন্তু সমস্তই যেন জানে। তারা-সব যেন অনেক কালের দাদামশায়, ‘এক যে ছিল রাজা’দের আমলের।

ওর ভাবে-ভোলা চোখটা কেবল যে উপরের দিকেই তা নয়, অনেক সময় দেখেছি, ও আমার বাগানে বেড়াচ্ছে মাটির দিকে কী খুঁজে খুঁজে। নতুন অঙ্কুরগুলো তাদের কোঁকড়ানো মাথাটুকু নিয়ে আলোতে ফুটে উঠছে এই দেখতে তার ঔ ঝুঁক্যের সীমা নেই। প্রতিদিন ঝুঁকে প'ড়ে প'ড়ে তাদেরকে যেন জিজ্ঞাসা করে, ‘তার পরে? তার পরে? তার পরে?’ তারা ওর চির-অসমাণ গল্প। সদ্য-গজিয়ে-ওঠা কঢ়ি কঢ়ি পাতা, তাদের সঙ্গে ওর কী-যে একটা বয়স্যভাব তা ও কেমন ক'রে প্রকাশ করবে। তারাও ওকে কী-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আঁকুপাকু করে। হয়তো বলে, ‘তোমার নাম কী’, হয়তো বলে ‘তোমার মা কোথায় গেল?’ বলাই মনে মনে উন্নত করে, ‘আমার মা তো নেই।’

কেউ গাছের ফুল তোলে এইটে ওর বড়ো বাজে। আর-কারও কাছে ওর এই সংকোচের কোনো মানে নেই, এটাও সে বুঝেছে। এইজন্যে ব্যথাটা লুকোতে চেষ্টা করে। ওর বয়সের ছেলেগুলো গাছে তিল মেরে মেরে আম্লকী পাড়ে; ও কিছু বলতে পারে না, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়। ওর সঙ্গীরা ওকে খ্যাপাবার জন্যে বাগানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ছড়ি দিয়ে দু পাশের গাছগুলোকে মারতে মারতে চলে, ফস্ক'রে বকুলগাছের একটা ডাল ভেঙে নেয়—ওর কাঁদতে লজ্জা করে, পাছে সেটাকে কেউ পাগলামি মনে করে। ওর সব চেয়ে বিপদের দিন, যেদিন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটতে আসে। কেননা—ঘাসের ভিতরে ভিতরে ও প্রত্যহ দেখে দেখে বেড়িয়েছে—এতটুকু-টুকু লতা, বেগনি হল্দে নামহারা ফুল, অতি ছোটো ছোটো; মাঝে মাঝে কল্পিকারি গাছ, তার নীল নীল ফুলের বুকের মাঝখানটিতে ছোট একটুখানি সোনার ফৌটা; বেড়ার কাছে কাছে কোথাও বা কালমেঘের লতা, কোথাও বা অনন্তমূল; পাখিতে-খাওয়া নিম ফলের বিচি প'ড়ে ছোটো ছোটো চারা বেরিয়েছে, কী সুন্দর তার পাতা—সমস্তই নিষ্ঠুর নিড়িনি দিয়ে দিয়ে নিড়িয়ে ফেলা হয়। তারা বাগানের শৌখিন গাছ নয়, তাদের নালিশ শোনবার কেউ নেই।

এক-একদিন ওর কাকির কোলে এসে ব'সে তার গলা জড়িয়ে বলে, “ঐ ঘাসিয়াড়াকে বলো-না, আমার ঐ গাছগুলো যেন না কাটে।”

কাকি বলে, “বলাই, কী যে পাগলের মতো বকিস্। ও যে সব জঙ্গল, সাফ না করলে চলবে কেন।”

বলাই অনেকদিন থেকে বুঝাতে পেরেছিল, কতকগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর একলারই—ওর চারিদিকের লোকের মধ্যে তার কোনো সাড়া নেই।

এই ছেলের আসল বয়স সেই কোটি বৎসর আগেকার দিনে যেদিন সমুদ্রের গর্ভ থেকে নতুন-জাগা পক্ষস্তরের মধ্যে পৃথিবীর ভাবী অরণ্য আপনার জন্মের প্রথম ক্রন্দন উঠিয়েছে—সেদিন পশ্চ নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চারিদিকে পাথর আর পাঁক আর জল। কালের পথে সমস্ত জীবের অগ্রহামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, ‘আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব বৌদ্ধ-বাদলে—দিন-রাত্রে।’ গাছের সেই রব আজও উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রাঞ্চে; তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ ব'লে ব'লে উঠছে, ‘আমি থাকব, আমি থাকব।’ বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধ'রে দুলোককে দোহন করে পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে; আর উৎকর্ষিত প্রাণের বাণীকে অহনিষ্ঠি আকাশে উচ্ছ্বসিত ক'রে তোলে, ‘আমি থাকব।’ সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-এক-রকম ক'রে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ঐ বলাই। আমরা তাই নিয়ে খুব হেসেছিলুম।

একদিন সকালে একমনে খবরের কাগজ পড়ছি, বলাই আমাকে ব্যস্ত ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল বাগানে। এক জায়গায় একটা চারা দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, “কাকা, এ গাছটা কী।”

দেখলুম একটা শিমুলগাছের চারা বাগানের খোওয়া-দেওয়া রাস্তার মাঝখানেই উঠেছে।

হায় রে, বলাই ভুল করেছিল আমাকে ডেকে নিয়ে এসে। এতটুকু যখন এর অঙ্কুর বেরিয়েছিল, শিশুর প্রথম প্রলাপটুকুর মতো, তখনই এটা বলাইয়ের চোখে পড়েছে। তার পর থেকে বলাই প্রতিদিন নিজের হাতে একটু একটু জল দিয়েছে, সকালে বিকেলে ক্রমাগত ব্যগ্র হয়ে দেখেছে কতটুকু বাড়ল। শিমুলগাছ বাড়েও দ্রুত, কিন্তু বলাইয়ের আঘাতের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। যখন হাত দুয়োক উঁচু হয়েছে তখন ওর পত্রসমূক্ষি দেখে ভাবলে এ একটা আশ্চর্য গাছ, শিশুর প্রথম বুদ্ধির আভাস দেখবা মাত্র মা যেমন মনে করে—আশ্চর্য শিশু। বলাই ভাবলে, আমাকেও চমৎকৃত ক'রে দেবে।

আমি বললুম, “মালীকে বলতে হবে, এটা উপড়ে ফেলে দেবে।”

বলাই চমকে উঠল। এ কী দারুণ কথা। বললে, “না, কাকা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উপড়ে ফেলো না।”

আমি বললুম, “কী যে বলিস তার ঠিক নেই। একেবারে রাস্তার মাঝখানে উঠেছে। বড়ো হলে চারিদিকে তুলো ছড়িয়ে অস্তির ক'রে দেবে।”

আমার সঙ্গে যখন পারলে না, এই মাতৃহীন শিশুটি গেল তার কাকির কাছে। কোলে ব'সে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, “কাকি, তুমি কাকাকে বারণ ক'রে দাও, গাছটা যেন না কাটেন।”

উপায়টা ঠিক ঠাওরেছিল। ওর কাকি আমাকে ডেকে বললে, “ওগো, শুনছ! আহা, ওর গাছটা রেখে দাও।”

রেখে দিলুম। গোড়ায় বলাই যদি না দেখাত তবে হয়তো ওটা আমার লক্ষ্যই হত না। কিন্তু এখন রোজই চোখে পড়ে। বছর-খানেকের মধ্যে নির্লজ্জের মতো মন্ত বেড়ে উঠল। বলাইয়ের এমন হল, এই গাছটার ‘পরেই তার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বাধের মতো। একটা অজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কাউকে খাতির নেই, একেবারে খাড়া লম্বা হয়ে উঠচ্ছে। যে দেখে সেই ভাবে, এটা এখানে কী করতে। আরো দু-চারবার এর মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব করা গেল। বলাইকে লোভ দেখালুম, এর বদলে শুব ভালো করকগুলো গোলাপের চারা আনিয়ে দেব।

বললেম, “নিতান্তই শিমুলগাছই যদি তোমার পছন্দ, তবে আর একটা চারা আনিয়ে বেড়ার ধারে পুঁতে দেব, সুন্দর দেখতে হবে।”

কিন্তু কাটবার কথা বললেই আঁতকে ওঠে, আর ওর কাকি বলে, “আহা, এমনিই কী খারাপ দেখতে হয়েছে।”

আমার বৌদিনির মৃত্যু হয়েছে—যখন এই ছেলেটি তাঁর কোলে। বোধ করি সেই শোকে দাদার খেয়াল গেল, তিনি বিলেতে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেলেন। ছেলেটি আমার নিঃসন্তান ঘরে কাকির কোলেই মানুষ। বছর দশেক পরে দাদা ফিরে এসে বলাইকে বিলাতি কায়দায় শিক্ষা দেবেন ব'লে প্রথমে নিয়ে গেলেন সিমলেয়—তার পরে বিলেতে নিয়ে যাবার কথা।

কাঁদতে কাঁদতে কাকির কোল ছেড়ে বলাই চলে গেল, আমাদের ঘর হল শূন্য।

তার পরে দু বছর যায়। ইতিমধ্যে বলাইয়ের কাকি গোপনে চোখের জল মোছেন, আর বলাইয়ের শূন্য শোবার ঘরে গিয়ে তার ছেঁড়া এক-পাটি জুতো, তার রুবারের ফাটা গোলা, আর জানোয়ারের গল্প ওয়ালা ছবির বই নাড়েন-চাড়েন; এত দিনে এই-সব চিহ্নকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলাই অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে, এই কথা ব'সে ব'সে চিন্তা করেন।

কোনো-এক সময়ে দেখলুম, লঙ্ঘীছাড়া শিমুলগাছটার বড়ো বাড় বেড়েছে—এতদূর অসংগত হয়ে উঠেছে যে আর প্রশ্নয় দেওয়া চলে না। এক সময়ে দিলুম তাকে কেটে।

এমন সময়ে সিমলে থেকে বলাই তার কাকিকে এক চিঠি পাঠালে, “কাকি, আমার সেই শিমুলগাছের একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়ে দাও।”

বিলেত যাবার পূর্বে একবার আমাদের কাছে আসবার কথা ছিল, সে আর হল না। তাই বলাই তার বন্ধুর ছবি নিয়ে যেতে চাইলে।

তার কাকি আমাকে ডেকে বললেন, “ওগো শুনছ, একজন ফোটোগ্রাফওয়ালা ডেকে আনো।”

জিজ্ঞাসা করলুম, “কেন।”

বলাইয়ের কাঁচ হাতের লেখা চিঠি আমাকে দেখতে দিলেন।

আমি বললেম, “সে গাছ তো কাটা হয়ে গেছে।”

বলাইয়ের কাকি দুদিন অন্ন গ্রহণ করলেন না, আর অনেকদিন পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটি কথাও কল নি। বলাইয়ের বাবা ওকে তাঁর কোল থেকে নিয়ে গেল, সে যেন উঁর নাড়ী ছিঁড়ে; আর উর কাকা তাঁর বলাইয়ের ভালোবাসার গাছটিকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিলে, তাতেও উঁর যেন সমন্ত সংসারকে বাজল, তাঁর বুকের মধ্যে ক্ষত ক'রে দিলে।

ঐ গাছ যে ছিল তাঁর বলাইয়ের প্রতিক্রিপ, তারই প্রাণের দোসর।

সে



উৎসর্গ  
সুন্দর শ্রীযুক্ত চারমচন্দ্র ভট্টাচার্য  
করতলযুগলেষু

মেঘের ফুরোল কাজ এইবাবি ।  
 সময় পেরিয়ে দিয়ে চেলেছিল জলধার,  
 সুনীর্ধ কালের পরে নিল ছুটি ।  
 উদাসী হাওয়ার সাথে জুটি  
 রচিছে যেন সে অন্যমনে  
 আকাশের কোণে কোণে  
 ছবির খেয়াল রাশি রাশি,  
 মিলিছে ভাহার সাথে হেমন্তে কুয়াশা-ছোওয়া হাসি ।  
 দেবপিতামহ হাসে স্বর্গের কর্মের হেরি হেলা,  
 ইন্দ্রের প্রাঙ্গণতলে দেবতার অর্থহীন খেলা ।

আমারো খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে  
 ভেসে আসে বাযুস্ত্রাতে ।  
 নিয়মের নিগন্ত পারায়ে  
 যায় সে হারায়ে  
 নিরূপদেশে  
 বাউলের বেশে ।

যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া  
 সেথায় সে-মুক্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষ্মীছাড়া ।  
 যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা  
 কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,  
 দিলেম উজাড় করি ঝুলি ।  
 লও যদি লও তুলি,  
 রাখ ফেল যাহা ইচ্ছা তাই—  
 কোনো দায় নাই ।  
 ফসল কাটার পরে  
 শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে  
 আগাছার সাথে ।  
 এমন কি আছে কেউ যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে—  
 যার কোনো দাম নেই,  
 নাম নেই,  
 অধিকারী নাই যার কোনো,  
 বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয় নি কখনো ।

## সে

বিধাতা লক্ষ্মক কোটিকোটি মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন, তবু মানুষের আশা মেনে না; বলে, আমরা নিজে মানুষ তৈরি করব। তাই দেবতার সঙ্গীর পুতুল-খেলার পাশাপাশি নিজের খেলা শুরু হল পুতুল নিয়ে, সেগুলো মানুষের আপন-গড়া মানুষ। তার পরে ছেলেরা বলে ‘গল্প বলো’ : তার মানে, ভাষায়-গড়া মানুষ বানাও। গড়ে উঠল কত রাজপুতুর, মন্ত্রীর পুতুর, সুয়োরানী, দুয়োরানী, মৎস্যনারীর উপাখ্যান, আরব্য উপন্যাস, রবিন্সন ক্রুসো। পৃথিবীর জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল। বুড়োরাও আপিসের ছুটির দিনে বলে, মানুষ বানাও ; হল আঠারো-পর্ব মহাভারত প্রস্তুত। আর, লেগে গিয়েছেন গল্প-বানিয়ের দল দেশে দেশে।

নাতনির ফরমাশে কিছু দিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে ; নিছক খেলার মানুষ, সত্যমিথ্যের কোনো জবাবদিহি নেই। গল্প যে শুনছে তার বয়স ন বছর, আর যে শোনাচ্ছে সে সন্তুর পেরিয়ে গেছে। কাজটা একলাই শুরু করেছিলুম, কিন্তু মালমসলা এতই হাল্কা ওজনের যে, নির্বিচারে পুপুও দিল যোগ। আর-একটা লোককে রেখেছিলুম, তার কথা হবে পরে।

অনেক গল্প শুরু হয়েছে এই বলে যে, এক যে ছিল রাজা। আমি আরম্ভ করে দিলুম, এক যে আছে মানুষ। তার পরে লোকে যাকে বলে গপ্পো, এতে তারও কোনো আঁচ নেই। সে মানুষ ঘোড়ায় চড়ে তেপাত্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না। একদিন রাত্রি দশটার পর এল আমার ঘরে। আমি বই পড়ছিলুম। সে বললে, দাদা, খিদে পেয়েছে।

রাজপুতুরের গল্প অনেক শুনেছি ; কখনোই তার খিদে পায় না। কিন্তু এর খিদে পেয়ে গেল গোড়াতেই, শুনে খুশি হলুম। খিদে-পাওয়া লোকের সঙ্গে ভাব করা সহজ। খুশি করবার জন্যে গলির মোড়ের থেকে বেশি দূর যেতে হয় না।

দেখলুম, লোকটার দিব্য খাবার শব্দ। ফরমাশ করে মুড়োর ঘন্ট, লাউচিংড়ি কাঁটাচকড়ি ; বড়োবাজারের মালাই পেলে বাটিটা চেঁচেপুঁছে খায়। এক-একদিন শব্দ যায় আইস্ক্রিমের। এমন করে খায় সে দেখবার যোগ্য। মজুমদারের জামাইবাবুর সঙ্গে অনেকটা মেলে।

একদিন বামাঝাম বৃষ্টি। বসে বসে ছবি আঁকছি। এখানকার মাঠের ছবি। উত্তর দিকে বরাবর চলে গেছে রাঙামাটির রাস্তা—দক্ষিণ দিকে পোড়ো জমি, উচুনিচু টেউ-খেলানো, মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া বুনো খেজুর। দূরে দুটো-চারটে তালগাছ আকাশের দিকে কাঞ্জালের মতো তাকিয়ে। তারই পিছনে জমে উঠেছে ঘন মেঘ

যেন একটা প্রকাণ নীল বাঘ ওৎ পেতে আছে, কখন এক লাফে মাঝ-আকাশে উঠে  
সূর্যটাকে দেবে থাবার ঘা । বাটিতে রঙ গুলে তৃলি বাগিয়ে এই-সব এঁকে চলেছি ।

দরজায় পড়ল ঠেলা । খুলে দেখি ডাকাত নয়, দৈত্য নয়, কোটালের পুত্রুর  
নয়—সেই লোকটা । সর্বাঙ্গ বেয়ে জল ঘরছে, ময়লা ভিজে জামা গায়ে লেপ্টে  
গেছে, কোঁচার ডগায় কাদা, জুতোয় কাদার পিণি । আমি বললুম, এ কী !

সে বললে, যখন বেরিয়েছিলুম খট্টটে রোদ্দুর । আদ্দেক পথে আসতে বৃষ্টি  
নামল । তোমার ঐ বিছানার চাদরটা যদি দাও তো কাপড় ছেড়ে গায়ে জড়িয়ে বসি ।

হ্রুম পাবার সবুর সইল না । চট্ট করে খাটের থেকে লঞ্চৌছিটের ঢাকাটা টেনে  
নিয়ে তাই দিয়ে মাথাটা মুছে কাপড় ছেড়ে সেটা গায়ে জড়িয়ে বসল । ভাগিয়স  
কাশীর জামিয়ারটা পাতা ছিল না ।

বললে, দাদা, তোমাকে একটা গান শোনাব ।

কী করি, ছবি-আঁকা বন্ধ করতে হল ।

সে শুরু করলে—

ভাবো শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,

নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়ান্ত হবে ভবে ।

আমার মুখের ভাব দেখে তার কী সন্দেহ হল জানি নে ; জিগেস করলে, কেমন  
লাগছে ।

আমি বললুম, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমাকে গলা সাধতে হবে লোকালয়  
থেকে দূরে বসে । তার পরে বুঝে নেবেন চিত্রগুণ, যদি সইতে পারেন ।

সে বললে, পুপেদিদিও হিন্দুস্থানি ওস্তাদের কাছে গান শেখে, সেইখানে আমাকে  
বসিয়ে দিলে কেমন হয় ।

আমি বললুম, পুপেদিদিকে যদি রাজি করাতে পার তা হলে কথা নেই ।

সে বললে, পুপেদিদিকে আমি বড়ো ভয় করি ।

এই পর্যন্ত শুনে আমার শ্রোতা পুপেদিদি খুব হেসে উঠল । তাকে কেউ ভয়  
করে, এতে সে ভারি খুশি । যেমন খুশি হয় জগতের দোর্দওপ্তাপের দল ।

দয়াময়ী আধ্বাস দিয়ে বললে, ভয় নেই, আমি তাকে কিছু বলব না ।

আমি বললুম, তোমাকে ভয় কে না করে ! দবেলা দু বাটি দুধ খাও—গায়ে কী  
করম জোর ! মনে আছে তো, তোমার হাতে লাঠি দেখে সেই বাষ্টা লেজ গুটিয়ে  
একেবারে নুটুপিসির বিছানার নীচে গিয়ে লুকিয়েছিল ।

বীরাঙ্গনা ভারি খুশি । মনে করিয়ে দিলে ভালুকটার কথা—সে পালাতে গিয়ে  
পড়ে গিয়েছিল নাবার ঘরের স্নানের জলের টবের মধ্যে ।

সেই যে মানুষটার ইতিহাস গড়ে উঠেছিল আমার একলার হাতে এখন থেকে  
পুপেও তাতে যেখানে-সেখানে জোড়া দিতে লাগল । আমি যদি বা বলি, একদিন  
বেলা তিনটার সময় সে এসেছিল আমার কাছে দাঢ়ি কামাবার খুর চেয়ে নিতে, আর  
নিতে খালি বিক্ষুটের টিন, পুপে খবর দেয়, সে ওর কাছ থেকে নিয়ে গেছে পশ্চম  
বোনবার কুরুশ-কাটি ।

সব গল্পেরই একটা আরঞ্জ আছে শেষ আছে, কিন্তু ঐ-যে ‘এক যে আছে মানুষ’ তার আর শেষ নেই। তার দিনির জুর হয়, ডাঙ্কার ডাকতে যায়। টমি কুকুর আছে, বেড়ালের নথের আঁচড় লেগে তার নাক যায় ছড়ে। পিছন দিক থেকে গোরুর গাড়ির উপর চড়ে বসেছিল, তাই নিয়ে গাড়োয়ানের সঙ্গে হয় বিষম বচসা। উঠোনে কলতলায় পিছলে পড়ে বামুন ঠাকুরনের মাটির ঘড়া দেয় ভেঙে। মোহনবাগানের ফুটবল-ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল, পকেট থেকে সাড়ে তিন আনা পয়সা কে নেয় তুলে; ফিরতি রাস্তায় ভীমনাগের দোকান থেকে সন্দেশ কেনা বাদ গেল। বক্স আছে কিনু চৌধুরী, তার ওখানে গিয়ে কুচো চিংড়ি ভাজা আর আলুর দম ফরমাশ করে। এমনি একটার পর একটা চলছে দিনের পর দিন। এর সঙ্গে পুপে জুড়েছে, কোনোদিন দুপুরবেলায় ওর ঘরে গিয়ে বলেছে মায়ের আলমারি থেকে পাকপ্রণালীর বইখানা খুঁজে বের করতে, বক্স সুধাকান্তবাবু শিখতে চায় মোচার ষষ্ঠ তৈরি করা। আর-একদিন পুপের সুবাসিত নারিকেল তেল নিয়ে গেল চেয়ে, ভয় হয়েছে মাথায় টাক পরে আসছে দেখে। আর-একদিন দিন্দার ওখানে গান শুনতে গেল, দিন্দা তখন তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে।

এই-যে আমাদের এক যে আছে মানুষ, এর একটা নাম নিশ্চয়ই আছে। সে কেবল আমরা দুজনেই জানি, আর কাউকে বলা বারণ। এইখানটাতেই গল্পের মজা। এক যে ছিল রাজা, তারও নাম নেই; রাজপুত্র, তারও নেই। আর রাজকন্যা, যার চুল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, যার হাসিতে মানিক, চোখের জলে মুক্তো, তারও নাম কেউ জানে না। ওরা নামজাদা নয়, অথচ ঘরে ঘরে ওদের খ্যাতি।

এই-যে আমাদের মানুষটি, একে আমরা শুধু বলি ‘সে’। বাইরের লোক কেউ নাম জিগেস করলে আমরা দুজনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করে হাসি। পুপে বলে, আন্দাজ করে বলো দেখি, প দিয়ে আরঞ্জ। কেউ বলে প্রিয়নাথ, কেউ বলে পঞ্চানন, কেউ বলে পাঁচকড়ি, কেউ বলে পীতাম্বর, কেউ বলে পরেশ; কেউ বলে পীটার্স, কেউ বলে প্রেক্ষট, কেউ বলে পীরবঞ্জ, কেউ বলে পীয়ার থাঁ।

এইখানে এসে কলম থামতেই একজন বললে, গল্প চলবে তো?

কার গল্প এ তো রাজপুত্র নয়, এ হল মানুষ, এ খায়-দায় ঘুমোয়, আপিসে যায়, সিনেমা দেখবারও শখ আছে। দিনের পর দিন যা সবাই করছে তাই এর গল্প। মনের মধ্যে যদি মানুষটাকে স্পষ্ট করে গড়ে তোল তা হলে দেখতে পাবে, এ যখন দোকানের রোয়াকে বসে রসগোল্লা খায় আর তার রস ঠোঁঠার ছিদ্র দিয়ে অজানিতে পড়তে থাকে তার ময়লা ধূতির উপর, সেটাই গল্প। যদি জিগেস কর ‘তার পরে’ তা হলে বলব, তার পরে ও ট্রামে চড়ে বসল, হঠাৎ জ্ঞান হল পয়সা নেই, টপ্প করে লাফিয়ে পড়ল। তার পরে? তার পরে এই রকমই আরো কত কী—বড়োবাজার থেকে বহুবাজার, বহুবাজার থেকে নিমতলা।

ওদের মধ্যে একজন বললে, যা সৃষ্টিছাড়া, বড়োবাজারে বহুবাজারে, এমন-কি, নিমতলাতেও যার গতি নেই, তা নিয়ে কি গল্প হয় না।

আমি বললুম, যদি হয় তা হলেই হয়, না হলে হয়ই না।

সে বললে, হোক তবে। হোক-না একেবারে যা ইচ্ছে তাই; মাথা নেই, মুখ নেই, মানে নেই, মোদ্দা নেই, এমন একটা-কিছু।

এটা হল স্পর্ধা। বিধাতার সৃষ্টি, নিয়মের রসারসি দিয়ে কষে বাধা, যেটা হবার সেটা হবেই। এ তো সহ্য হয় না। একঘেয়ে বিধানের সৃষ্টিকর্তা পিতামহকে এমন ক্ষেত্রে ঠাট্টা করে নেওয়া যাক যেখানে শাস্তির ভয় নেই। এ তো তাঁর নিজের এলেকা নয়।

আমাদের সে ছিল কোণে বসে। কানে কানে বললে, দাদা, লেগে যাও। আমার নাম দিয়ে যা-খুশি চালিয়ে দিতে পারো, ফৌজদারি করব না।

সে মানুষটির পরিচয় দেওয়ার দরকার আছে।

পুপুদিদিমণিকে ধারাবেয়ে যে গল্প বলে যাচ্ছি সেই গল্পের মূল অবলম্বন হচ্ছে একটি সর্বনামধারী, সে কেবলমাত্র বাক্য দিয়ে তৈরি। সেইজন্যে একে নিয়ে যা-তা করা সম্ভব, কোনোখানে এসে কোনো প্রশ্নের হঁচেট খাবার আশঙ্কা নেই। কিন্তু অনাসৃষ্টির চাকুৰ প্রমাণ দেবার জন্যে একজন শরীরধারী জোগাড় করতে হয়েছে। সাহিত্যের মামলায় কেস্টা যখন বড়ো বেশি বেসামাল হয়ে পড়ে তখনই এ লোকটা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। কিছুই বাধে না। আমার মতো মোকারের ইশারা পেলেই সে অম্বানমুখে বলতে পারে যে, কাঁচড়াপাড়ার কুঞ্চমেলায় গঙ্গাম্বান করতে গিয়ে কুমীরে ধরেছিল তার টিকির ডগা। সেটা গেল তলিয়ে, বেঁটা-ছেঁড়া মানবদেহের বাকি অংশটুকু উঠে এসেছে ডাঙায়; আরো একটু চোখ টিপে দিলে সে নির্লজ্জ হয়ে বলতে পারে, মানোয়ারী জাহাজের ডুরুরি গোরা সাত মাস পাঁক ঘেঁটে গোটা পাঁচ-ছয় চুল ছাড়া বাকি টিকিটা উদ্ধার করে এনেছে, বকশিশ পেয়েছে এককালীন সোয়া তিন টাকা। পুপুদিদি তবু যদি বলে ‘তার পরে’ তা হলে তখনই শুরু করবে, নীলরতন ডাঙারের পায়ে ধরে বললে, দোহাই ডাঙারবাবু, ওষুধ দিয়ে টিকিটা জোড়া দিয়ে লাগিয়ে দাও, নইলে তেলোর কাছে প্রসাদী ফুল বাঁধতে পারছি না। তিনি সন্ন্যাসীদণ্ড বজ্রজটী মলম লাগিয়ে দিতেই টিকিটা একেবারে মরিয়া হয়ে বেড়ে চলেছে, অফুরান একটা কেঁচোর মতো। পাগড়ি পরলে পাগড়িটা বেলুনের মতো ফেঁপে উঠতে থাকে, মাথার বালিশটা উপরে চুড়ো তৈরি হতে থাকে দৈত্যপুরীর ব্যাঙের ছাতার মতো। বাঁধা মাইনে দিয়ে নাপিত রাখতে হল। প্রহরে প্রহরে তাকে দিয়ে ব্রহ্মতালু চাঁচিয়ে নিতে হচ্ছে।

তবু যদি শ্রোতার কৌতুহল না মেটে তা হলে সে করুণ মুখ করে বলতে থাকে যে, মেডিক্যাল কলেজের সার্জন-জেনেরাল হাতের আস্তিন গুটিয়ে বসে ছিল; তার ভীষণ জেদ, মাথার ঐ জ্যায়গাটাতে ইস্কুর্প দিয়ে ফুটো করে সেইখানে রবারের ছিপি ঝঁটে গালা লাগিয়ে সীলমোহর করে দেবে, ইহকাল-পরকালে ওখান দিয়ে আর টিকি গজাতে পারবে না। চিকিৎসাটা ইহকাল ডিঙিয়ে পরকালেই গিয়ে ঠেকবে এই আশঙ্কায় ও কোনোমতেই রাজি হল না।

আমাদের এই ‘সে’ পদার্থটি ক্ষণজন্মা বটে; এমনতরো কোটিতে গোটিক

মেলে মিথ্যে কথা বানাতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভা। আমার আজগবি গল্লের এত বড়ো  
উন্নতসাধক ওস্তাদ বহু ভাগে জুটেছে। গঞ্জ-প্রশ্নের উন্নতপাড়ার এই যে মানুষ,  
মাঝে মাঝে একে পুপুদিদির কাছে এনে হাজির করি—দেখে তার বড়ো চোখ  
আরো বড়ো হয়ে ওঠে। খুশি হয়ে বাজার থেকে গরম জিলিপি এনে খাইয়ে  
দেয়।—লোকটা অসম্ভব জিলিপি ভালোবাসে, আর ভালোবাসে শিকদারপাড়া গলির  
চম্চম্চ। পুপুদিদি জিগেস করে, তোমার বাড়ি কোথায়। ও বলে, কোন্নগরে,  
প্রশ্নচিহ্নের গলিতে।

নাম বলি নে কেন। নাম বললে ইনি যে কেবলমাত্র ইনিতেই এসে ঢেকবেন,  
এই ভয়। জগতে আমি আছি একজন মাত্র, তুমিও তাই, সেই তুমি আমি ছাড়া  
আর-সকলেই তো সে। আমার গল্লের সকল সে'র উনি জামিন।

একটা কথা বলে রাখি, নইলে অধর্ম হবে। ওকে মাঝে রেখে যে পালা জমানো  
হয়েছে তার থেকে যারা বিচার করে তারা ভুল করে; যারা তাকে চাক্ষুষ দেখেছে  
তারা জানে লোকটা সুপুরূষ, চেহারা সুগঞ্জির। রান্তিরে যেমন তারার আলোর  
ছড়াছড়ি, ওর গান্ধীর্ঘ তেমনি চাপা হাসিতে ভরা। ও পয়লা নম্বরের মানুষ, তাই  
কোনো ঠাট্টা মস্করায় ওকে জখম করতে পারে না। ওকে বোকার মতো সাজাতে  
আমার মজা লাগে, কেননা ও আমার চেয়ে বৃক্ষিমান। অবুঝের ভান করলেও ওর  
মানহানি হয় না; সুবিধে হয়, পুপুর স্বভাবের সঙ্গে ওর মিল হয়ে যায়।

## ২

এর মধ্যে পুপেদিদি গেছে দার্জিলিঙ্গে। সে রইল মাথাঘষা গলিতে একলা আমার  
জিম্বায়। তার ভালো লাগছে না। আমি ও জ্বালাতন হয়েছি। বলে, আমাকে দার্জিলিং  
পাঠাও।

আমি বললুম, কেন।

সে বললে, পুরুষমানুষ বেকার বসে আছি, আক্ষীয়স্বজন ভারি নিন্দে করছে।

কী কাজ করবে, বলো।

পুপেদিদির খেলার রান্নার জন্যে খবরের কাগজ কুচিকুচি করে দেব।

এত মেহন্ত সইবে না। একটু চুপ করো দেখি। আমি এখন হঁহাউ দ্বীপের  
ইতিহাস লিখছি।

হঁহাউ নামটা শোনাচ্ছে ভালো, দাদা। ওটা তোমার চেয়ে আমার কলমেই  
মানাত ঠিক। বিষয়টার একটু আমেজ দিতে পার কি।

ঠাট্টা নয়, বিষয়টা গঞ্জির, কলেজে পাঠ্য হ্বার আশা রাখি। একদল বৈজ্ঞানিক ঐ  
শূন্য দ্বীপে বসতি বেঁধেছেন। খুব কঠিন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত।

একটুখানি বুঝিয়ে বলো—কী করছেন তাঁরা। হাল নিয়মে চাষবাস করছেন?

একেবারে উলটো চাষের সম্পর্ক নেই।

আহারের কী ব্যবস্থা।

একেবারেই বক্ষ।

প্রাণটা ?

দেই চিন্তাটাই সব চেয়ে তুচ্ছ । পাক্যন্ত্রের বিরুদ্ধে ওঁদের সত্যাগ্রহ । বলছেন, ঐ জর্জেয়ন্ট্রার মতো পঁচাও জিনিস আর নেই । যত রোগ, যত যুক্তিগ্রহ, যত চুরি-ডাকাতির মূল কারণ তার নাড়ীতে নাড়ীতে ।

দাদা, কথাটা সত্য হলেও হজম করা শক্ত ।

তোমার পক্ষে শক্ত । কিন্তু, ওরা হলেন বৈজ্ঞানিক । পাক্যন্ট্রটা উপড়ে ফেলেছেন, পেট গেছে চুপ্সে, আহার বন্ধ, নস্য নিচ্ছেন কেবলই । নাক দিয়ে পোষ্টাই নিচ্ছেন হাওয়ায় শুষে । কিছু পৌঁচছে ভিতরে, কিছু হাঁচতে হাঁচতে বেরিয়ে যাচ্ছে । দুই কাজ একসঙ্গেই চলছে, দেহটা সাফও হচ্ছে, ভর্তিও হচ্ছে ।

আশ্চর্য কৌশল । কলের জাঁতা বসিয়েছেন বুঝি ? হাঁস মুরগি পাঁটা ভেড়া আলু পটোল একসঙ্গে পিষে শুকিয়ে ভর্তি করছেন ডিবের মধ্যে ?

না । পাক্যন্ত্র, কসাইখানা, দুটোই সংসার থেকে লোপ করা চাই । পেটের দায়, বিল-চোকানোর ল্যাঠা একসঙ্গে মেটাবেন । চিরকালের মতো জগতে শান্তিস্থাপনার উপায় চিন্তা করছেন ।

নস্যটা তবে শস্য নিয়েও নয়, কেননা সেটাতেও কেনাবেচার মামলা ।

বুঝিয়ে বলি । জীবলোকে উদ্ধিদের সবুজ অংশটাই প্রাণের গোড়াকার পদার্থ, সেটা তো জান ?

পাপমুখে কেমন করে বলব যে জানি, কিন্তু বুঝিমানেরা নিতান্ত যদি জেদ করেন তা হলে মেনে নেব ।

দৈপ্যায়ন পণ্ডিতের দল ঘাসের থেকে সবুজ সার বের করে নিয়ে সূর্যের বেগনি-পেরোনো আলোয় শুকিয়ে মুঠো মুঠো নাকে টুসছেন । সকালবেলায় ডান নাকে ; মধ্যাহ্নে বাঁ নাকে ; সায়াহ্নে দুই নাকে একসঙ্গে, সেইটোই বড়ো ভোজ । ওঁদের সমবেত হাঁচির শব্দে চমকে উঠে পশুপক্ষীরা সাঁতরিয়ে সমৃদ্ধ পার হয়ে গেছে ।

শোনাচ্ছে ভালো । অনেকদিন বেকার আছি দাদা, পাক্যন্ট্রটা হন্তে হয়ে উঠেছে—তোমাদের ঐ নস্যটার দালালি করতে পারি যদি নিয়ুমার্কেটে, তা হলে—

অল্প একটু বাধা পড়েছে, সে কথা পরে বলব । তাঁদের আর-একটা মত আছে । তাঁরা বলেন, মানুষ দু পায়ে খাড়া হয়ে চলে বলে তাদের হৃদ্যন্ত পাক্যন্ত্র ঝুলে ঝুলে মরছে ; অস্বাভাবিক অত্যাচার ঘটেছে লাখো লাখো বৎসর ধরে । তার জরিমানা দিতে হচ্ছে আযুক্ষয় করে । দোলায়মান হৃদয়টা নিয়ে মরছে নরনারী ; চতুর্পদের কোনো বালাই নেই ।

বুঝলুম, কিন্তু উপায় ?

ওরা বলছেন, প্রকৃতির মূল মতলবটা শিশুদের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে । সেই দ্বিপের সব চেয়ে উচু পাহাড়ে শিলালিপিতে অধ্যাপক খুদে রেখেছেন—সবাই মিলে হামাগুড়ি দাও, ফিরে এসো চতুর্পদী চালে, যদি দীর্ঘকাল ধরণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও ।

সাবাস ! আরো কিছু বাকি আছে বোধ হয় ?

আছে। ওরা বলেন, কথা কওয়াটা মানুষের বানানো। ওটা প্রকৃতিদণ্ড নয়। ওতে প্রতিদিন শ্বাসের ক্ষয় হতে থাকে, সেই শ্বাসক্ষয়েই আয়ুষক্ষয়। স্বাভাবিক প্রতিভায় এ কথাটা গোড়াতেই আবিষ্কার করেছে বানর। ত্রোতায়গের হনুমান আজও আছে বেঁচে। আজ ওরা নিরালায় বসে সেই বিশুদ্ধ আদিম বুদ্ধির অনুসরণ করছেন। মাটির দিকে মুখ করে সবাই একেবারে চুপ। সমস্ত দ্বীপটাতে কেবল নাকের থেকে হাঁচির শব্দ বেরোয়, মুখের থেকে কোনো শব্দই নেই।

পরম্পর বোঝাপড়া চলে কী করে।

অত্যাশ্র্য ইশারার ভাষা উদ্ভাবিত।— কখনো টেকি-কোটার ভঙ্গিতে, কখনো হাতপাখি-চালানোর চালে, কখনো ঝোড়া সুপুরি গাছের নকলে ডাইনে বাঁয়ে উপরে নীচে ঘাড় দুলিয়ে বাঁকিয়ে নাড়িয়ে কাঁপিয়ে হেলিয়ে ঝাঁকিয়ে। এমন-কি, সেই ভাষার সঙ্গে ভুরু-বাঁকানি চোখ-টেপানি যোগ করে ওঁদের কবিতার কাজও চলে। দেখা গেছে, তাতে দর্শকের চোখে জল আসে, নস্যর জায়গাটা বন্ধ হয়ে পড়ে।

কিছু টাকা আমাকে ধার দাও, দোহাই তোমার। এই হঁহাউ দ্বীপেই যেতে হচ্ছে আমাকে। এত বড়ো নতুন মজাটা—

নতুন আর পুরোনো হতে পেল কই। হাঁচতে হাঁচতে বস্তিটা বেবাক ফাঁক হয়ে গেছে। পড়ে আছে জালা-জালা সবুজ নস্য। ব্যবহার করবার যোগ্য নাক বাকি নেই একটাও।

এ তোমার আগাগোড়াই বানানো। বিজ্ঞানের ঠাট্টার পক্ষেও এটা বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। এই হঁহাউ দ্বীপের ইতিহাস বানিয়ে তুমি পুপেদিদিকে তাক লাগিয়ে দিতে চাও। ঠিক করেছিলে, তোমার এই অভাগা সে-নামওয়ালাকেই বৈজ্ঞানিক সাজিয়ে সারা দ্বীপময় হাঁচিয়ে মারবে। বর্ণনা করবে আমি ঘাড়-নাড়ানাড়ির ঘটা করে ঘটোৎকচ-বধ পাঁচালির আসর জমাছি কী করে। হয়তো কোন্ হামাগুড়িওয়ালি মনোহর-ঘাড়-নাড়ানির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে বসবে, ঘাড়নাড়া-মন্ত্রে কনে নাড়বে মাথা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, আর আমি নাড়ব ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। সংশ্লিষ্টি-গমন হয়ে উঠবে চতুর্দশপদী। ওদের সেনেট হলে ঘাড়নাড়া ভাষায় যখন ওরা সারে সারে পরীক্ষা দিতে বসেছে, তার মধ্যে আমাকেও বসাবে এক কোণে। আমার উপর তোমার দয়ামায়া নেই, দেবে ফেল করিয়ে। কিন্তু ওদের স্পোর্টিং ক্লাবে হামাগুড়ি-রেসে আমাকেই পাওয়াবে ফাস্ট প্রাইজ। বলে দিচ্ছি, পুপেদিদিকে এমন করে হাসাতে পারবে মনেও কোরো না।

বেশি বোকো না। চাণক্যপত্তি শ্রেণীবিশেষের আয়ুর্বৃদ্ধির জন্যে বলেছেন : তাবচ বাঁচতে মূর্খ যাবৎ ন বক্বকায়তে।—তুমি তো সংস্কৃত কিছু শিখেছিলে ?

যতটা শিখেছিলে ভুলেছি তার দেড়গুণ ওজনে। নয়া-চাণক্য জগতের হিতের জন্যে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটাও তোমার জানা দরকার দাদা, ছন্দ মিলিয়েই লেখা : তখন হাঁপ ছাড়িয়ে বাঁচি যখন পঙ্কত চুপায়তে।—চললুম। আমার শেষ পরামর্শ এই, বৈজ্ঞানিক রাসিকতা ছেড়ে দিয়ে ছেলেমানুষি করো যতটা পার।

এই কাহিনীটা পুপেদিদির কাছে একটুও পছন্দসই হয় নি। কপাল কুঁচকে  
বললে, এ কথনো হয়? নসিয় নিয়ে পেট ভরে?

আমি বললেম, গোড়তে পেটাকেই যে সরিয়ে দিয়েছে।

পুপুদিনি আশ্রম হয়ে বললে, ওঃ, তাই বুঝি।

শেষ পর্যন্ত ওর গিয়ে ঠেকল কথা না বলাতে। ওর প্রশ্ন, কথা না বলে কি বাঁচা  
যায়।

আমি বললুম, ওদের সব চেয়ে বড়ো পণ্ডিত ভূজ্জপাতায় লিখে লিখে দীপময়  
প্রচার করেছেন, কথা বলেই মানুষ মরে। তিনি সংখ্যাগণনায় প্রমাণ করে দিয়েছেন,  
যারা কথা বলত সবাই মরেছে।

হঠাতে পুপুদিনির বুদ্ধিতে প্রশ্ন উঠল, আচ্ছা, বোবারা?

আমি বললেম, তারা কথা বলে মরে নি, তারা মরেছে কেউ বা পেটের অসুখে,  
কেউ বা কাশিসর্দিতে।

শুনে পুপুদিনির মনে হল, কথাটা যুক্তিসংগত।

আচ্ছা, দাদামশায়, তোমার কী মত।

আমি বললুম, কেউ বা মরে কথা বলে, কেউ বা মরে না বলে।

আচ্ছা, তুমি কী চাও।

আমি ভাবছি, হঁহাউ দ্বিপে গিয়ে বাস করব, জমুদ্বিপে বকিয়ে মারল আমাকে,  
আর পেরে উঠছি নে।

### ৩

শিবা-শোধন-সমিতির একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে আমাদের সে। পুপুদিনির  
আসরে আজ সক্ষেবেলায় সেইটে পাঠ হবে।

### রিপোর্ট

সক্ষেবেলায় মাঠে বসে গায়ে হাওয়া লাগাছি এমন সময় শেয়াল এসে বললে,  
দাদা, তুমি নিজের কাঢ়াবাঢ়াদের মানুষ করতে লেগেছ, আমি কী দোষ করেছি।

জিজ্ঞাসা করলেম, কী করতে হবে শুনি।

শেয়াল বললে, নাহয় হলুম পশু, তাই বলে কি উদ্ধার নেই। পণ করেছি,  
তোমার হাতে মানুষ হব।

শুনে মনে ভাবলুম, সৎকার্য বটে।

জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার এমন মতলব হল কেন।

সে বললে, যদি মানুষ হতে পারি তা হলে শেয়াল-সমাজে আমার নাম হবে,  
আমাকে পুজো করবে ওরা।

আমি বললুম, বেশ কথা।

বঙ্কুদের খবর দেওয়া গেল। তারা খুব খুশি। বললে, একটা কাজের মতো কাজ

বটে । পৃথিবীর উপকার হবে । ক'জনে মিলে একটা সভা করলুম, তার নাম দেওয়া গেল শিবা-শোধন-সমিতি ।

পাড়ায় আছে অনেক কালের একটা পোড়ো চত্তীমণ্ডপ । সেখানে রোজ রাত্তির নটার পরে শেয়াল মানুষ করার পুণ্যকর্মে লাগা গেল ।

জিজ্ঞাসা করলুম, বৎস, তোমাকে জ্ঞাতিরা কী নামে ডাকে ।

শেয়াল বললে, হৌহৈ ।

আমরা বললুম, ছি ছি, এ তো চলবে না । মানুষ হতে চাও তো প্রথমে নাম বদলাতে হবে, তার পরে রূপ । আজ থেকে তোমার নাম হল শিবুরাম ।

সে বললে, আচ্ছা । কিন্তু মুখ দেখে বোঝা গেল, হৌহৈ নামটা তার যেরকম মিষ্টি লাগে শিবুরাম তেমন লাগল না । উপায় নেই, মানুষ হতেই হবে ।

প্রথম কাজ হল তাকে দু পায়ে দাঁড় করানো । অনেক দিন লাগল । বহু কষ্টে নড়ুনড়ু করতে করতে চলে, থেকে থেকে পড়ে পড়ে যায় । ছ মাস গেল দেহটাকে কোনোমতে খাড়া রাখতে । থাবাগুলো ঢাকবার জন্য পরানো হল জুতো মোজা দস্তানা ।

অবশ্যে আমাদের সভাপতি গৌর গৌসাই বললেন, শিবুরাম, এইবার আয়নায় তোমার দ্বিপদী ছন্দের মূর্তিটা দেখো দেখি, পছন্দ হয় কি না ।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে ঘাড় বেঁকিয়ে শিবুরাম অনেকক্ষণ ধরে দেখলে । শেষকালে বললে, গৌসাইজি, এখনো তোমার সঙ্গে তো চেহারার মিল হচ্ছে না ।

গৌসাইজি বললেন, শিবু, সোজা হলেই কি হল । মানুষ হওয়া এত সোজা নয় । বলি, লেজটা যাবে কোথায় । ওটার মায়া কি ত্যাগ করতে পার ।

শিবুরামের মুখ গেল শুকিয়ে । শেয়ালপাড়ায় দশ-বিশ গাঁয়ের মধ্যে ওর লেজ ছিল বিখ্যাত ।

সাধারণ শেয়ালরা ওর নাম দিয়েছিল ‘খাসা-লেজুড়ি’ । যারা শেয়ালি-সংকৃত জানত তারা সেই ভাষায় ওকে বলত, ‘সুলোমলাঙ্গুলী’ । দু দিন গেল ওর ভাবতে তিন রাত্রি ওর ঘূম হল না । শেষকালে বৃহস্পতিবারে এসে বললে, রাজি ।

পাট্কিলে রঙের ঝাঁকড়া রোঁয়াওয়ালা লেজটা গেল কাটা, একেবারে গোড়া ঘেঁষে ।

সভ্যেরা সকলে বলে উঠল, অহো, পশুর এ কী মুক্তি ! লেজবন্ধনের মায়া ওর এত দিনে কেটে গেল ! ধন্য !

শিবুরাম একটা গভীর দীর্ঘনিশ্চাস ফেললে । চোখের জল সামলিয়ে নিয়ে সেও অতি করুণসুরে বললে, ধন্য !

সেদিন ওর আহারে রুচি রইল না, সমস্ত রাত সেই কাটা লেজের স্বপ্ন দেখলে ।

পরদিন শিবুরাম সভায় এসে হাজির । গৌসাইজি বললেন, কেমন হে শিবু, দেহটা হাঙ্কা বোধ হচ্ছে তো ?

শিবুরাম বললে, আজ্জে, খুবই হাক্কা । কিন্তু মন বলছে, লেজ গেল তবু মানুষের  
সঙ্গে বর্ণভেদ তো ঘুচল না ।

গৌসাই বললেন, রঙ মিলিয়ে সবৰ্ণ হতে চাও যদি, তবে রঁয়া ঘুচিয়ে ফেলো ।  
তিনু নাপিত এল ।

পাঁচ দিন লাগল খুর বুলিয়ে বুলিয়ে লোমগুলো চেঁচে ফেলতে । রূপ যেটা ফুটে  
উঠল তা দেখে সভ্যরা সবাই চুপ করে গেল ।

শিবুরাম উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, মশায়, আপনারা কোনো কথা বলেন না কেন ।  
সভ্যরা বললে, আমরা নিজের কীর্তিতে অবাক ।

শিবুরাম মনে শান্তি পেল । কাটা লেজ ও চাঁচা রঁয়ার শোক ভুলে গেল ।

সভ্যরা দুই চক্ষু বুজে বললেন, শিবুরাম, আর নয় । সভা বন্ধ হল । এখন—  
শিবু বললে, এখন আমার কাজ হবে শেয়াল-সমাজকে অবাক করা ।

এ দিকে শিবুরামের পিসি খৈকিনি কেঁদে কেঁদে মরে । গাঁয়ের মোড়ল হুরুইকে  
গিয়ে বললে, মোড়লমশায়, আজ এক বছরের উপর হয়ে গেল আমার হৌহৌকে  
দেখি নে কেন । বাঘ-ভালুকের হাতে পড়ল না তো ?

মোড়ল বললে, বাঘ-ভালুককে ভয় কিসের ? ভয় ঐ মানুষ জানোয়ারটাকে,  
হয়তো তাদের ফাঁদে পড়েছে ।

খৌজ পড়ে গেল । ঘুরতে ঘুরতে ভলন্টিয়ারের দল এল সেই চণ্ডীমণ্ডপের  
বাঁশবনে । ডাক দিলে, হুক্কা হয়া ।

শিবুরামের বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল, একবার গলা ছেড়ে ঐ  
একতানমন্ত্রে ঘোঝ দিতে ইচ্ছা হল । বছ কষ্টে চেপে গেল ।

দ্বিতীয় প্রহরে বাঁশবনে আবার ডাক উঠল, হুক্কা হয়া । এবার শিবুরামের চাপা  
গলায় কান্নার মতো একটুখানি রব উঠল । তবু থেমে গেল ।

তৃতীয় প্রহরে ওরা আবার যখন ডাক ছাড়লে শিবুরাম আর থাকতে পারলে না ;  
ডেকে উঠল, হুক্কা হয়া, হুক্কা হয়া, হুক্কা হয়া ।

হুরুই বললে, ঐ তো হৌহৌয়ের গলা শুনি । একবার হাঁক দাও তো ।  
ডাক পড়ল, হৌহৌ !

সভাপতি বিছানা ছেড়ে এসে বললেন, শিবুরাম !

বাইরে থেকে আবার ডাক পড়ল, হৌহৌ !

গৌসাইজি আবার সতর্ক করে দিলেন, শিবুরাম !

তৃতীয়বার ডাকে শিবুরাম ছুটে বেরিয়ে আসতেই শেয়ালরা দিল দৌড় । হুরুই,  
হৈয়ো, হুহু প্রভৃতি বড়ো বড়ো শেয়াল-বীর আপন আপন গর্তের ভিতর গিয়ে ঢুকল ।

সমস্ত শেয়াল-সমাজ শুক্তিত !

তার পর ছ মাস গেল ।

শেষ খবর পাওয়া গেছে । শিবুরাম সারারাত হেঁকে হেঁকে বেড়াচ্ছে, আমার  
লেজ কই, আমার লেজ কই ।

গৌসাইয়ের শোবার ঘরের সামনের রোয়াকে বসে উর্ধ্ব দিকে মুখ তুলে প্রহরে  
প্রহরে কোকিয়ে উঠে বলে, আমার লেজ ফিরে দাও ।

গৌসাই দরজা খুলতে সাহস করে না — ভয় পায়, পাছে তাকে খ্যাপা শেয়ালে  
কামড়ায় ।

শেয়ালক্কটার বনে যেখানে শিবুরামের বাড়ি সেখানে ওর যাওয়া বন্ধ । জাতিরা  
ওকে দূর থেকে দেখলে, হয় পালায় নয় খেকিয়ে কামড়াতে আসে । ভাঙা  
চণ্ডীমণ্ডপেই থাকে, সেখানে একজোড়া পঁয়াচা ছাড়া আর অন্য প্রাণী নেই । খাঁদু,  
গোবর, বেঁচি, টেঁড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো ডানপিটে ছেলেরাও ভূতের ভয়ে সেখানকার  
জঙ্গল থেকে করমচা পাড়তে যায় না ।

শেয়ালি ভাষায় শেয়াল একটা ছড়া লিখেছে, তার আরম্ভটা এইরকম —

ওরে লেজ, হারা লেজ, চক্ষে দেখি ধূয়া ।

বক্ষ মোর গেল ফেটে হঞ্চা হয়া হয়া ॥

পুপে বলে উঠল, কী অন্যায়, ভারি অন্যায় । আচ্ছা, দাদমশায়, ওর মাসিও ওকে  
নেবে না ঘরে ?

আমি বললুম, তুমি ভেবো না ওর গায়ের রোঁয়াগুলো আবার উঠুক, তখন ওকে  
চিনতে পারবে ।

কিন্তু, ওর লেজ ?

হয়তো লাঙ্গুলাদ্য ঘৃত পাওয়া যেতে পারে কবিরাজমশায়ের ঘরে । আমি খোঁজ  
নেব ।

সে আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললে, রাগ কোরো না দাদা, হক কথা  
বলব—তোমারও শোধনের দরকার হয়েছে ।

বে-আদব কোথাকার, কিসের শোধন আমার ।

তোমার ঐ বুড়োমির শোধন । বয়স তো কম হয় নি, তবু ছেলেমানুষিতে পাকা  
হতে পারলে না ।

প্রমাণ পেলে কিসে ।

এই-যে রিপোর্টটা পড়ে শোনালে, ওটা তো আগাগোড়া বাঙ্গ, প্রবীণ বয়সের  
জ্যাঠামি । দেখলে না পুপুদিদির মুখ কিরকম গঠন ? বোধ হয় গায়ে কাঁটা দিয়ে  
উঠেছিল । ভাবছিল, রোঁয়া-চঁচা শেয়ালটা এখনই এল বুঝি তার কাছে নালিশ  
করতে । বুঝির মাত্রাটা একটু কমাতে যদি না পার তা হলে গল্প বলা ছেড়ে দাও ।

ওটা কমানো আমার পক্ষে শক্ত । তুমি বুঝবে কী করে ; তোমাকে তো চেষ্টাই  
করতে হয় না, বিধাতা আছেন তোমার সহায় ।

দাদা, রাগ করছ বটে, কিন্তু আমি বলে দিলুম, বুঝির ঝাঁজে তোমার রস যাচ্ছে  
শুকিয়ে । মজা করছ মনে কর, কিন্তু তোমার ঠাট্টা গায়ে ঠেকলে আমার মতো  
লাগে । এর আগে তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি—হাসতে গিয়ে,  
হাসাতে গিয়ে পরকাল খুইয়ো না । লেজকাটা শেয়ালের কথা শুনে পুপুদিদির চোখ  
জলে ভরে এসেছিল, দেখতে পাও নি বুঝি ? বল তো আজই তাকে আমি

একটুখানি হাসিয়ে দিই গে—বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বুদ্ধির ভেজাল নেই।

লেখা তৈরি আছে নাকি?

আছে। নাটকি চালের আলাপ। বললেই হবে, আমাদের পাড়ার উধো গোবরা  
আর পঞ্চতে মিলে কথা হচ্ছে। ওদের সবাইকে দিদি চেনে।

আছো বেশ, দেখা যাক।

## গেছো বাবা

উধো। কী রে, সন্ধান পেলি?

গোবরা। আরে ভাই, তোমার কথা শুনে আজ মাসখানেক ধরে বনে-বাদাড়ে  
যুরে যুরে হাড় মাটি হল, টিকিও দেখতে পেলুম না।

পঞ্চ। কার সন্ধান করছিস রে।

গোবরা। গেছো বাবার।

পঞ্চ। গেছো বাবা? সে আবার কে রে।

উধো। জানিস নে? বিশ্বসুন্দর লোক তাকে জানে।

পঞ্চ। তা, গেছো বাবার ব্যাপারটা কী শুনি।

উধো। বাবা যে-গাছে চড়ে বসবে সেই গাছই হবে কল্পতরু। তলায় দাঁড়িয়ে  
হাত পাতলেই যা চাইবি তাই পাবি রে।

পঞ্চ। খবর পেলি কার কাছ থেকে।

উধো। ধোকড় গাঁয়ের ভেকু সর্দারের কাছ থেকে। বাবা সেদিন ডুমুর গাছে  
চড়ে বসে পা দোলাছিল; ভেকু জানে না, তলা দিয়ে যাচ্ছে, মাথায় ছিল এক হাঁড়ি  
চিটেগড়, তামাক তৈরি করবে। বাবার পায়ে ঠেকে তার হাঁড়ি গেল  
টলে—চিটেগড়ে তার মুখ চোখ গেল বুজে। বাবার দয়ার শরীর ; বললে, ভেকু,  
তোর মনের কামনা কী খুলে বল। ভেকুটা বোকা ; বললে, বাবা একখানা ট্যানা  
দাও, মুখটা মুছে ফেলি। যেমনি বলা অমনি গাছ থেকে খসে পড়ল একখানা  
গামছা। মুখ চোখ মুছে উপরে যখন তাকালো তখন আর কারও দেখা নেই। যা  
চাইবে কেবল একবার। বাস, তার পরে কেঁদে আকাশ ফাটালেও সাড়া মিলবে না।

পঞ্চ। হায় রে হায়, শাল নয়, দোশালা নয়, শুধু একখানা গামছা! ভেকুর আর  
বুদ্ধি কত হবে।

উধো। তা হোক, নেপু। ঐ গামছা নিয়েই তার দিব্যি চলে যাচ্ছে—দেখিস নি?  
রথতলার কাছে অত বড়ো আটচালা বানিয়েছে। গামছা হোক, বাবার গামছা তো।

পঞ্চ। কী করে হল। ভেলকি নাকি।

উধো। হোদলপাড়ার মেলায় ভেকু সেদিন বাবার গামছা পেতে বসল। হাজারে

হাজারে লোক এসে জুটল । বাবার নামে টাকাটা সিকেটা আলুটা মূলোটা চার দিক থেকে গামছার উপর পড়তে লাগল । মেয়েরা কেউ বা এসে বলে, ও ভেঙ্গুদাদা, আমার ছেলেটার মাথায় বাবার গামছা একটু ঠেকিয়ে দে, আজ তিনমাস ধরে জুরে ভুগছে । ওর নিয়ম হচ্ছে নৈবিদ্যি চাই পাঁচ সিকে, পাঁচটা সুপুরি, পাঁচ কুন্কে চাল, পাঁচ ছটাক ঘি ।

পঞ্চুঁ ! নৈবিদ্যি তো দিছে, ফল পাচ্ছে কিছু ?

উধো । পাচ্ছে বৈকি । গাজন পাল গামছা ভরে পনেরো দিন ধরে ধান ঢেলেছে ; তার পরে ঐ গামছার কোণে দড়ি লাগিয়ে একটা পাঁঠাও দিলে বেঁধে, ঐ পাঁঠার ডাকে চার দিক থেকে লোক এসে জমল । কী বলব, ভাই, মাস এগারো পরেই গাজনের চাকরি জুটে গেল । আমাদের রাজবাড়ির কোতোয়ালের সিঙ্গি ঘোঁটে, তার দাড়ি চুম্বিয়ে দেয় ।

পঞ্চুঁ ! সত্যি বলছিস ?

উধো । সত্যি না তো কী । গাজন যে আমার মামাতো ভাইয়ের ভায়রাভাই হয় ।

পঞ্চুঁ ! আচ্ছা ভাই উধো, গামছাটা তুই দেখেছিস ?

উধো । দেখেছি বৈকি । হটগঞ্জের তাঁতে দেড়গজ ওসারের যে গামছা বুনি হয়, চাঁপার বরন জমি, লাল পাড়, একেবারে বেমালুম তাই ।

পঞ্চুঁ ! বলিস কী । তা, সে গাছের উপর থেকে পড়ল কী করে ।

উধো । ঐ তো মজা । বাবার দয়া !

পঞ্চুঁ ! চল্ ভাই, চল্, খোঁজ করতে বেরোই । কিন্তু, চিনব কী করে ।

উধো । সেই তো মুশকিল । কেউ তো তাকে দেখে নি । আবার হবি তো হ, ভেঙ্গু বেটার চোখ গেল চিটেগড়ে বুজে ।

পঞ্চুঁ ! তবে উপায় ?

উধো । আমি তো হাটে ঘাটে যাকে দেখছি তাকেই জোড়হাত করে জিগেস করছি, দয়া করে জানাও, তুমিই কি গেছো বাবা । শুনে তারা তেড়ে মারতে আসে । একজন তো দিল আমার মাথায় হাঁকোর জল ঢেলে ।

গোবরা । তা দিক গে । ছাড়া হবে না । ঝুঁজে বের করবই । যা থাকে কপালে ।

পঞ্চুঁ ! ভেঙ্গু বলে, গাছে চড়লেই তবে বাবার চেহারা ধরা পড়ে, যখন নীচে থাকেন চেনবার জো নেই ।

উধো । গাছে চড়িয়ে চড়িয়ে মানুষকে পরখ করব কী করে, ভাই । আমি এক বুদ্ধি করেছি, আমার আমড়া গাছ আমড়ায় ভরে গেছে, যাকে দেখছি তাকেই বলছি, আমড়া পেড়ে নাও—গাছটা প্রায় খালি হয়ে এল, ডালগুলোও ভেঙেছে ।

পঞ্চুঁ ! আর দেরি নয় রে চল্ । কপালের জোর যদি থাকে তবে দর্শনলাভ হবেই । একবার গলা ছেড়ে ডাক দে-না, ভাই ! গেছো বাবা, ও বাবা, দয়াল বাবা, পারুলবনে কোথাও যদি থাক লুকিয়ে, একবার অভাগাদের দর্শন দাও ।

গোবরা । ওরে হয়েছে রে, দয়া হল বুঝি ।

পঞ্চুঁ ! কই রে, কই ।

গোবরা। এই-যে চালতা গাছে।

পঞ্চ। কী রে, চালতা গাছে কী। দেখছি নে তো কিছু।

গোবরা। এই-যে দুলছে।

পঞ্চ। কী দুলছে। ও তো লেজ রে।

উধো। তোর কেমন বুদ্ধি গোবরা, ও বাবার লেজ নয় রে, হনুমানের লেজ।  
দেখছিস নে মুখ ভ্যাঙ্গছে?

গোবরা। ঘোর কলি যে ! বাবা এই কপিরূপ ধরেছেন আমাদের ভোলাবার  
জন্যে।

পঞ্চ। ভুলছি নে, বাবা, কালামুখ দেখিয়ে ভোলাতে পারবে না। যত পার মুখ  
ভ্যাঙ্গও, নড়ছি নে—তোমার ঐ শ্রীলেজের শরণ নিলুম।

গোবরা। ওরে, বাবা যে লস্বা লাফ দিয়ে পালাতে শুরু করল রে।

পঞ্চ। পালাবে কোথায়। আমাদের ভক্তির দৌড়ের সঙ্গে পারবে কেন।

গোবরা। এই বসেছে কয়েৎবেল গাছের ডগায়।

উধো। পঞ্চ, উঠে পড়-না গাছে।

পঞ্চ। আরে, তুই ওঠ-না।

উধো। আরে, তুই ওঠ।

পঞ্চ। অত উচ্চে উঠতে পারব না, বাবা, কৃপা করে নেমে এসো।

উধো। বাবা, তোমার ঐ শ্রীলেজ গলায় বেঁধে অন্তিমে যেন চক্ষু মুদতে পারি  
এই আশীর্বাদ করো। [প্রস্থান]

ওহে কমবুদ্ধি, হাসাতে পারলে ?

না। যে মানুষ সবই বিনা বিশ্বাস করতে পারে তাকে হাসানো সোজা  
নয়। ভয় হচ্ছে, পুপেদিদি পাছে গেছো বাবার সন্ধান করতে আমাকে পাঠায়।

মুখ দেখে আমারও তাই বোধ হচ্ছে। গেছো বাবার 'প'রে ওর টান পড়েছে।  
আজ্ঞা, কাল পরীক্ষা করে দেখব, বিশ্বাস না করিয়েও মজা লাগাতে পারা যায় কি না।

কিছুক্ষণ বাদে পুপু এসে বললে, আজ্ঞা, দাদামশায়, গেছো বাবার কাছে তুমি  
হলে কী চাইতে।

আমি বললেম, পুপুদিদির জন্যে এমন একটা কলম চাইতেম যা নিয়ে লিখতে  
বসলে অঙ্ক করতে একটা ভুলও হত না।

পুপুদিদি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, আঃ, সে কী মজাই হত !

অঙ্কে দিদি এবার একশোর মধ্যে সাড়ে তেরো মার্কা পেয়েছে।

স্থপ্ত দেখছি কি জেগে আছি বলতে পারি নে। জানি নে কত রাত। ঘর অঙ্ককার,  
লঠনটা আছে বারান্দায়, দরজার বাইরে। একটা চামচিকে পোকার লোভে ঘুরপাক  
খেয়ে বেড়াচ্ছে, গয়ায়-পিণ্ডি-না দেওয়া ভূতের মতো।

সে এসে হাঁক দিলে, দাদা, ঘুমচ্ছ নাকি।

বলেই ঘরে ঢুকে পড়ল । কালো কষ্টলে সর্বাঙ্গ মোড়া ।

জিগেস করলেম, এ কেমন সজ্জা তোমার ।

বললে, আমার বরসজ্জা ।

বরসজ্জা ! বুঝিয়ে বলো ।

কনে দেখতে যাচ্ছি ।

জানি নে কেন, আমার যেন ঘুমে-ঘোলা বুদ্ধিতে ঠেকল যে, ঠিক হয়েছে, এই  
সজ্জাই উচিত । উৎসাহ দিয়ে বললুম, সেজেছ ভালো । তোমার ওরিজিন্যালিটি  
দেখে খুশি হলুম । একেবারে ক্লাসিকাল সাজ ।

কী রকম ।

ভূতনাথ যখন তাঁর তপস্থিনী কনেকে বর দিতে এলেন, তাঁর গায়ে ছিল হাতির  
চামড়া । তোমার এটা যেন ভালুকের চামড়া । নারদ দেখলে খুশি হতেন ।

দাদা, সমজদার তুমি । এলেম এইজন্যেই তোমার কাছে এত রাস্তিরে ।

কত রাত বলো দেখি ।

দেড়টার বেশি হবে না ।

কনে কি এখনই দেখা চাই ।

হাঁ, এখনই ।

শুনেই বলে উঠলেম, ভারি চমৎকার ।

কী কারণে বলো তো ।

কেন-যে এতদিন আইডিয়াটা মাথায় আসে নি তাই ভাবি । আপিসের বড়ো  
সাহেবের মুখ দেখা দিনের রোদ্দুরে, আর কনে দেখা মাঝরাত্তিরের অঙ্ককারে ।

দাদা, তোমার মুখের কথা যেন অমৃতসমান । একটা পৌরাণিক নজির দাও  
তো ।

মহাদেব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মহাকালীর দিকে অমাবস্যার ঘোর  
অঙ্ককারে, এই কথাটা শুরণ কোরো ।

অহো, দাদা, তোমার কথায় আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে । সার্বাইম যাকে বলে ।  
তা হলে আর কথা নেই ।

কনেটি কে এবং আছেন কোথায় ।

আমার বউদিদির ছোটো বোন, আছেন তাঁরই বাড়িতে ।

চেহারায় তোমার বউদিদির সঙ্গে কি মেলে ।

মেলে বৈকি, সহোদরা বটে ।

তা হলে অঙ্ককার রাতের দরকার আছে ।

বউদি স্বয়ং বলে দিয়েছেন ; উচ্চিটা যেন সঙ্গে না আনি ।

বউদির ঠিকানাটুঁ ?

সাতাশ মাইল দূরে, চৌচাকলা গ্রামে, উনকুণ পাড়ায় ।

ভোজন আছে তো ?

আছে বৈকি ।

শুনে কোন্ মোহের ঘোরে যে মনটা পুলকিত হল বলতে পারি নে । লিভরের  
দোষে ভুগে আসছি বারো বছর, খাবার নাম শুনলেই পিণ্ডি যায় বিগড়ে ।

জিগেস করলেম, খাওয়াটা কী রকম হবে শুনি ।

অত্যন্ত উক্তেজিত হয়ে বলে উঠল, অতি উন্ম, অতি উন্ম, অতি উন্ম । বউদি  
আমসত্ত্ব দিয়ে উচ্ছেসিঙ্ক চমৎকার রাঁধে, আর কুলের আঁটি টেকিতে কুটে তার সঙ্গে  
দোকার জল মিশিয়ে চাটনি —

বলেই নাচ জুড়ে দিল বিলিতি চালে — টিটিম্টম্টম্, টিটিম্টম্টম্, টিটিম্টম্টম্ ।

জীবনে কোনেদিন নাচি নি, হঠাৎ নাচ পেয়ে গেল — দূজনে হাত ধরাধরি করে  
নাচতে শুরু করে দিলুম, টিটিম্টম্টম্ । মনে হল আশ্র্য আমার ক্ষমতা ; যমুনা দিদি  
যদি দেখত তবে বলত, নাচ বটে ।

শেষকালে হাঁপিয়ে উঠে ধপ্ত করে বসে পড়লুম । বললুম, আহারের ফর্দ যা দিলে  
একেবারে খাঁটি ভিটামিন । লিভরের পক্ষে অমৃত । কনে দেখতে যাবে তো কনের  
পরীক্ষা তো চাই ।

এক দফা হয়ে গেছে আগেই ।

কী রকম ।

মনে করলুম, মিলন হবার আগে মিলের পরীক্ষা চাই । ঠিক কি না বলো ।

ঠিক তো বটেই । পরীক্ষার প্রণালীটা কী ।

জিগেস করা চাই ‘শোলোক মেলাতে পার কি না’ । দৃত পাঠিয়েছিলুম  
'রংশাল' এর সহ-সম্পাদককে, তিনি আওড়ালেন —

সুন্দরী, তুমি কালো কৃষ্টি ।

বললেন মিল করে এর জবাব দিতে হবে, পুরো মাপের মিল ।

কনেটি এক নিঃশেষে বলে দিলে —

কানা তুমি, নেই ভালো দৃষ্টি ।

সহ-সম্পাদকের এটা অসহ হল, বলে দিলে —

ব্রহ্মা লঘা হাতে

তোমাকে গড়েছে রাতে

যবে শেষ হল আলোকৃষ্টি ।

লঘা হাতে বলবার তাৎপর্য কী হল ।

মেয়েটি ঢ্যাঙ্গা আছে শুনেছি, তোমার চেয়ে ইঞ্জিন দুই-তিন বড়ো হবে । তাই  
শুনেই তো আমার উৎসাহ ।

বলো কী ।

একখানা মেয়ে বিয়ে করতে গিয়ে পাওয়া যাবে আধখানা ফাউ ।

এ কথাটা আমার মাথায় ওঠে নি ।

যা হোক দাদা, সহ-সম্পাদকের কাছে হার মেনে ও হার-মানার একটা কবুলতি  
দিয়ে দিয়েছে ।

কী রকম ।

মাছের আঁশের হার গেঁথে ওর গলায় পরিয়েছে, বলেছে যশঃসৌরভ তোমার  
সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে ।

আমি লাফ দিয়ে বলে উঠলুম, ধন্য ! এবার দেখছি এক অসাধারণের সঙ্গে  
আর-এক অসাধারণের মিলন হবে, জগতে এমন কদাচিং ঘটে । তা হলে আর কেন  
দিনক্ষণ দেখা ।

কিন্তু মেয়েটির পগ, ওকে যে হারাতে পারবে তাকেই ও বিয়ে করবে ।

কুপে ?

না, কথার মিলে । ঠিকমত যদি মেলাতে পারি তা হলে ও নিজেকে দেবে  
জলাঞ্জলি ।

পারবে তো ?

নিশ্চয় ।

প্ল্যানটা কী শুনি ।

বলব, চার লাইনে আমার চরিত্র বর্ণনা করো, স্তবে আমাকে খুশি করে দাও ।  
মিল হওয়া চাই ফর্স্ট ক্লাস ।

কনে দেখার যদি পেটেন্ট নেওয়া চলত তুমি নিতে পারতে ! বরের স্তব দিয়ে  
শুরু ! অতি উত্তম ! উমা তাতেই জিতেছিলেন ।

প্রথম লাইনটা ওকে ধরিয়ে দিতে হবে, নইলে আমার চরিত্রের থই পাবে না ;  
আমার বর্ণনার ধূয়োটি হচ্ছে এই —

তুমি দেখি মানুষটা একেবারে অন্তুত ।

পুরো বহরের মিল দাবি করলে মেয়েটি বোধ হয় মাথায় হাত দিয়ে পড়বে ।  
ওকে হার মানতেই হবে । আচ্ছা দাদা, তুমিই দাও দেখি ওর পরের লাইনটা যোগ  
করে ।

আমি বললেম —

কুকে তোমার বুঝি চাপিয়াছে বদ্বৃত্ত ।

এক্সেলেন্ট । কিন্তু আর দুটো লাইন না হলে শ্লোক তো ভর্তি হয় না । আমি  
বলছি, কনে তো কনে, কনের বাবার সাধ্য হবে না ওর মিল বের করতে । দাদা,  
তোমার মাথায় কিছু আসছে ? ভাষায় হোক অভাষায় হোক ।

একেবারেই না ।

তা হলে শোনো —

ছাত থেকে লাফ দাও, পাঁক দেখে ঝাঁপ দাও,

যখন তখন করো যন্ত্রুত তন্ত্রুত ।

ও আবার কী ! ওটা কোন্ দিশি বুলি ।

দেবভাষা সংস্কৃত, কিন্তু শব্দের এক পর্যায় ।

যন্ত্রুত তন্ত্রুত, মানেটা কী হল ।

ওর মানে, যা খুশি তাই । ওটা বঙ্গভাষায়, যাকে হাল আমলের পঞ্জিতেরা বলেছে  
'অবদান' ।

লোকটার 'পরে আমার ভক্তি কূল ছাপিয়ে উঠল। মনে হল অসাধারণ প্রতিভা। ওর পিঠ থাবড়িয়ে বললুম, স্তুষ্টি করেছ আমাকে।

সে বললে, স্তুষ্টি হলে চলবে কেন। চলতে হবে। লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। ফস্ করে বৰকরণ পেরিয়ে যাবে কখন, এসে পড়বে তৈতিলকরণ, বৈকুণ্ঠযোগ, তার পরেই হৰ্ষণযোগ, বিষ্টিকরণ, শেষ রাত্তিরে অসূক্ষ্যযোগ, ধনিষ্ঠানক্ষত্র—গোষ্ঠামীমতে ব্যতীপাতযোগ বালবকরণ, পরিঘযোগে যখন গরকরণ এসে পড়বে তখন বিপদ হবে—ঘৰকৰন্তার পক্ষে গৱেষণার মতো এত বড়ো বাধা আৰ নেই। সিদ্ধিযোগ ব্ৰক্ষযোগ ইন্দ্ৰযোগ শিবযোগ এই হঞ্চাৰ মধ্যে একদিনও পাওয়া যাবে না, বৱীয়ানযোগের অল্প একটু আশা আছে যখন পুনৰ্বসু নক্ষত্ৰের দৃষ্টি পড়বে।

কাজ নেই, কাজ নেই, এখনি বেরিয়ে পড়া যাক। ডাক দাও পুতুলালকে, মোটৰখানা আনুক। সে এতক্ষণে চৱকা কাটতে বসেছে। চৱকা কাটতে কাটতে তবে সে ঘুমতে পারে, মোটৰ চালিয়ে তার এই দশা হয়েছে।

গাড়িতে চড়ে বসলুম।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছি, ঘোৰ অন্ধকার। পুকুৱের ধারে আস্সেওড়াৰ ঝোপ। হঠাৎ তার ভিতৰ থেকে খৈকশিয়ালি উঠল ডেকে। তখন রাত সাড়ে তিনটে হবে। যেমনি ডাকা, পুতুলাল চমকে উঠে গাড়িসুন্দ গিয়ে পড়ল একগলা জলের মধ্যে। এ দিকে তার পিঠৰে কাপড়েৰ ভিতৰে একটা ব্যাঙ ঢুকে লাফালাফি কৰছে। আৱ, পুতুলালেৰ সে কী চেঁচানি! আমি ওকে সাজ্জনা দিয়ে বললুম, পুতুলাল, তোৱ পিঠে বাত আছে, ব্যাঙটাকে খুব কষে লাফাতে দে, বিনি পয়সায় অমন ভালো মালিশ আৱ পাৰিনে।

গাড়িৰ ছাদেৰ উপৰ দাঁড়িয়ে ডাক দিতে লাগলুম, বনমালী, বনমালী।

ইন্টুপিডেৰ কোনো সাড়াশব্দ নেই। স্পষ্টই বোৰা গেল, সে তখন বোলপুৰ ক্ষেত্ৰে প্ল্যাটফৰমে চাদৰ মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে। ভাৱি রাগ হল। ইচ্ছে কৱল, তার নাকেৰ মধ্যে ফাউন্টেন পেনেৱে সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে হাঁচিয়ে দিয়ে আসি গে। এ দিকে পাঁকেৰ জলে আমাৰ চুলগুলো গেছে ভিজে। না আঁচড়ে নিয়ে ওৱ বউদিদিৰ ওখানে যাই কী কৱে। গোলমাল শুনে পুকুৱপাড়ে হাঁসগুলো পঁ্যাক পঁ্যাক কৱে ডেকে উঠেছে। এক লাফ দিয়ে পড়লুম তাদেৰ মধ্যে; একটাকে চেপে ধৰে তার ডানা দিয়ে ঘষে ঘষে চুলটা একৱকম টিক কৱে নিলুম। পুতুলাল বললে, ঠিক বলেছ, দাদাৰাবু। ব্যাঙেৰ লাফে বড়ো আৱাম বোধ হচ্ছে। ঘুম আসছে।

যাৱয়া গেল ওৱ বউদিদিৰ বাড়িতে। খিদেৰ চোটে একেবাৱে ভুলে গেছি কনে দেখাৰ কথা। বউদিদিকে জিগেস কৱলেম, আমাৰ সঙ্গে ছিল সে, তাকে দেখছি নে কেন।

তিন হাত দোপাটা কাপড়েৰ ঘোমটাৰ ভিতৰ থেকে মিহিসুৱে বউদিদি বললে, সে কনে খুঁজতে গেছে।

কোনু চুলোয়।

মজা দিঘিৰ ধারে বাঁশতলায়।

কত দূর হবে ।

তিনি পহুঁরের পথ ।

দূর বেশি নয় বটে । কিন্তু, খিদে পেয়েছে । তোমার সেই চাট্টনি বের করো দিকি ।

বউদিদি নাকি সুরে বললে, হায় রে আমার পোড়া কপাল, এই গেল মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবারে ফাটা ফুটবল ভর্তি করে সমস্তটা পাঠিয়ে দিয়েছি বুজুদিদির ওখানে—সে ওটা থেতে ভালোবাসে ছোলার ছাতুর সঙ্গে সর্বেতেল আর লক্ষ্মা দিয়ে মেখে ।

মুখ শুকিয়ে গেল ; বললুম, আমরা খাই কী ।

বউদিদি বললে, শুকনো কুঁচো চিংড়িমাছের মোরবা আর টাট্কা চিটেগুড়ে জমানো । বাছারা খেয়ে নাও, নইলে পিণ্ডি পড়ে যাবে ।

কিছু খেলেম, অনেকটাই রইল বাকি । পুতুলালকে জিগেস করলুম, খাবি ?

সে বললে, ভাঁড়টা দাও, বাড়ি গিয়ে আহিক করে খাব ।

বাড়ি এলেম ফিরে । চটিজুতো ভিজে, গা-ময় কাদা ।

বনমালীকে ডাক দিয়ে বললুম, বাঁদর, কী করছিলি ।

সে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললে, বিজে কামড়েছিল, তাই ঘুমছিলুম ।

বলেই সে চলে গেল ঘুমতে ।

এমন সময় একটা গুণাগোছের মানুষ একেবারে ঘরের মধ্যে উপস্থিত । মন্ত্র লঘা, ঘাড় মোটা, মোটা পিপের মতো গর্দান, বনমালীর মতো রঙ কালো, ঝাঁকড়া চুল, খৌচা খৌচা গোঁফ, চোখ দুটো রাঙা, গায়ে ছিটের মেরঝাই, কোমরে লাল রঞ্জের ডোরাকাটা লুঞ্জির উপর হলদে রঞ্জের তিন-কোণা গামছা বাঁধা, হাতে পিতলের কাঁকামারা লস্বা একটা বাঁশের লাঠি, গলার আওয়াজ যেন গদাইবাবুদের মোটরগাড়িটার শিঞ্জের মতো । হঠাৎ সে সাড়ে তিন মোন ওজনের গলায় ডেকে উঠল, বাবুশায় !

চমকে উঠে কলমের খৌচায় খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে গেল ।

বললুম, কী হয়েছে, কে তুমি ।

সে বললে, আমার নাম পাল্লারাম, দিদির বাড়ি থেকে এসেছি, জানতে চাই তোমাদের সে কোথায় গেল ।

আমি বললুম, আমি কী জানি ।

পাল্লারাম চোখ পাকিয়ে হাঁক দিয়ে বললে, জান না বটে ! ঐ যে তার তালি দেওয়া আঁশ-বের-করা সবুজ রঞ্জের এক পাটি পশমের মোজা কাদাসুক্ত শুকিয়ে গিয়ে মরা কাঠবেড়ালির কাটা লেজের মতো তোমার বইয়ের শেলকে ঝুলছে, ওটা ফেলে সে যাবে কোন্ ধারণে ।

আমি বললুম, লোকসান সইবে না, যেখানে থাকে ফিরে আসবেই । কিন্তু হয়েছে কী ।

পাল্লারাম বললে, পরশুদিন সন্ধের সময় দিদি গিয়েছিল জঙ্গিলাটের বাড়ি ।

ଲାଟଗିନ୍ନିର ସঙ୍ଗେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପାତିଯେଛେ । ଫିରେ ଏସେ ଦେଖେ, ଏକଟା ଘଟି, ଏକଟା ଛାତା, ଏକଜୋଡ଼ା ତାସ, ହାରିକେନ ଲଞ୍ଠନ, ଆର ଏକଟା ପାଥୁରେ କୟଲାର ଛାଲା ନିଯେ କୋଥାଯି ମେଳେ ଚଲେ ଗେଛେ । ଦିନି ବାଗାନ ଥେକେ ଏକଝୁଡ଼ି ବାଶେର କୌଡ଼ା ଲାଉଡ଼ଗା ଆର ବେତୋଶାକ ତୁଲେ ରେଖେଛିଲ ; ତାଓ ଖୁଜେ ପାଓଯା ଯାଛେ ନା । ଦିନି ଭାବି ରାଗ କରଛେ ।

ଆମି ବଲଲୁମ, ତା ଆମି କୀ କରବ ।

ପାଲ୍ଲାରାମ ବଲଲେ, ତୋମାର ଏଥାନେ କୋଥାଯ ସେ ଲୁକିଯେ ଆଛେ, ତାକେ ବେର କରେ ଦାଓ ।

ଆମି ବଲଲୁମ, ଏଥାନେ ନେଇ, ତୁମି ଥାନାଯ ଥବର ଦାଓ ଗେ ।

ନିଶ୍ଚଯ ଆଛେ ।

ଆମି ବଲଲୁମ, ଭାଲୋ ମୁଶକିଲେ ଫେଲଲେ ଦେଖାଇ । ବଲାଇ ସେ ନେଇ ।

'ନିଶ୍ଚଯ ଆଛେ, ନିଶ୍ଚଯ ଆଛେ, ନିଶ୍ଚଯ ଆଛେ' ବଲତେ ବଲତେ ପାଲ୍ଲାରାମ ଆମାର ଟେବିଲେର ଉପର ଦମାଦମ ତାର ବାଶେର ଲାଠିର ମୁଣ୍ଡଟା ଟୁକତେ ଲାଗଲ । ପାଶେର ବାଡ଼ିତେ ଏକଟା ପାଗଲ ଛିଲ, ସେ ଶେଯାଲ ଡାକେର ନକଲ କରେ ହାଁକ ଦିଲ 'ହୃକାହୃଯା' । ପାଡ଼ାର ସବ କୁକୁର ଚେଂଟିଯେ ଉଠିଲ । ବନମାଲୀ ଆମାର ଜନ୍ୟେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ବେଲେର ଶରବତ ରେଖେ ଗିଯେଛିଲ, ସେଟା ଉଲ୍ଟିଯେ ବୋତଲ ଭେଙେ ବେଗନ୍ତି ରଙ୍ଗେ କାଲିର ସଙ୍ଗେ ମିଶେ ରେଶମେର ଚାଦର ବେଯେ ଆମାର ଜୁତୋର ମଧ୍ୟେ ଗିଯେ ଜମଲ । ଚିତ୍କାର କରତେ ଲାଗଲୁମ, ବନମାଲୀ, ବନମାଲୀ !

ବନମାଲୀ ଘରେ ଚୁକେଇ ପାଲ୍ଲାରାମେର ଚେହାରା ଦେଖେ 'ବାପ ରେ' 'ମା ରେ' ବଲେ ଚେଂଚାତେ ଚେଂଚାତେ ଦୌଡ଼ ଦିଲେ ।

ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼େ ଗେଲ ; ବଲଲେମ, ସେ ଗେଛେ କନେର ଖୋଜ କରତେ ।

କୋଥାଯ ।

ମଜାନିଧିର ଧାରେ ବାଶ୍ତଲାଯ ।

ଲୋକଟା ବଲଲେ, ସେଥାନେ ଯେ ଆମାରଇ ବାଡ଼ି ।

ତା ହଲେ ଠିକ ହେଯେଛେ । ତୋମାର ମେଯେ ଆଛେ ?

ଆଛେ ।

ଏଇବାର ତୋମାର ମେଯେର ପାତ୍ର ଜୁଟିଲ ।

ଜୁଟିଲ ଏଥିନେ ବଲା ଯାଯ ନା । ଏଇ ଡାଙ୍ଗା ନିଯେ ଘାଡ଼େ ଧରେ ତାର ବିଯେ ଦେବ, ତାର ପରେ ବୁଝିବ କନ୍ୟାଦାୟ ଘୁଚିଲ ।

ତା ହଲେ ଆର ଦେରି କୋରୋ ନା । କନେ ଦେଖାର ପରେଇ ବରକେ ଦେଖା ହୟତୋ ସହଜ ହବେ ନା ।

ସେ ବଲଲେ, ଠିକ କଥା ।

ଏକଟା ଭାଙ୍ଗା ବାଲତି ଛିଲ ଘରେର ବାଇରେ । ସେଟା ଫସ୍ କରେ ତୁଲେ ନିଲେ । ଜିଗେସ କରଲେମ, ଓଟା ନିଯେ କୀ ହବେ ।

ଓ ବଲଲେ, ବଡ଼ୋ ରୋଦ୍ଦୁର, ଟୁପିର ମତୋ କରେ ପରବ ।

ଓ ତୋ ଗେଲ । ତଥନ କାକ ଡାକଛେ, ଟ୍ରାମେର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁ ହେଯେଛେ । ବିଛାନା ଥେକେ ଧର୍ଡୁଫର୍ଡୁ କରେ ଉଠେଇ ଡାକ ଦିଲେମ ବନମାଲୀକେ । ଜିଗେସ କରଲେମ, ଘରେ କେ ଚୁକେଛିଲ ।

ও চোখ রংগড়ে বললে, দিদিমণির বেড়ালটা ।

এই পর্যন্ত শুনে পুপুদিদি হতাশভাবে বললে, ও কী কথা দাদামশায়, তুমি যে  
বলছিলে, তুমি নেমস্তন্ত্র থেকে গিয়েছিলে, তার পরে তোমার ঘরে এসেছিল  
পাল্লারাম ।

সামলে নিলুম । আর একটু হলেই বৃক্ষিমানের মতো বলতে যাছিলুম,  
আগাগোড়া স্বপ্ন । সব মাটি হত । এখন থেকে পাল্লারামকে নিয়ে উঠে-পড়ে লাগতে  
হবে যেমন করে পারি । স্বপ্ন যখন বিধাতা ভাঙ্গেন নালিশ খাটে না । আমরা ভাঙ্গলে  
বড়ো নিষ্ঠুর হয় ।

পুপুদিদি বললে, দাদামশায়, ওদের দুজনের বিয়ে হল কি না বললে না তো  
কিছু ।

বুবালুম, বিয়ে হওয়াটা জরুর দরকার । বললুম, বিয়ে না হয়ে কি রক্ষা আছে ।

তার পরে তোমার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে কি ।

হয়েছে বৈকি । তখন তোর সাড়ে চারটে, রাস্তার গ্যাস নেবে নি । দেখলুম, নতুন  
বউ তার বরকে ধরে নিয়ে চলেছে ।

কোথায় ।

নতুন বাজারে মানকচু কিনতে ।

মানকচু !

হ্যাঁ, বর আপনি করেছিল ।

কেন ।

বলেছিল, অত্যন্ত দরকার হলে বরঞ্চ কাঁঠাল কিনে আনতে পারি, মানকচু পারব  
না ।

তার পরে কী হল !

আনতে হল মানকচু কাঁধে করে ।

খুশি হল পুপু ; বললে, খুব জন্ম !

## ৫

সকালে বসে চা খাচ্ছি এমন সময়ে সে এসে উপস্থিত ।

জিগেস করলুম, কিছু বলবার আছে ?

ও বললে, আছে ।

চট্ট করে বলে ফেলো, আমাকে এখনি বেরতে হবে ।

কোথায় ।

লাটিসাহেবের বাড়ি ।

লাটিসাহেব তোমাকে ডাকেন নাকি ।

না, ডাকেন না, ডাকলে ভালো করতেন ।

ভালো কিসের !

জানতে পারতেন, ওঁরা যাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে থাকেন আমি তাদের

চেয়েও খবর বানাতে ওন্তাদ। কোনো রায়বাহাদুর আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না,  
সে কথা তুমি জান।

জানি, কিন্তু আমাকে নিয়ে আজকাল তুমি যা-তা বলছ।

অসম্ভব গল্পেরই যে ফরমাশ।

হোক না অসম্ভব, তারও তো একটা বাঁধুনি থাকা চাই। এলোমেলো অসম্ভব তো  
যে-সে বানাতে পারে।

তোমার অসম্ভবের একটা নয়না দাও।

আচ্ছা বলি শোনো—

শৃতিরত্নমশায় মোহনবাগানের গোল-কীপারি করে ক্যালকাটার কাছ থেকে  
একে একে পাঁচ গোল খেলেন। থেয়ে থিদে গেল না, উল্টো হল, পেট চোঁ-চোঁ  
করতে লাগল। সামনে পেলেন অক্টোবর মুনমেন্ট। নীচে থেকে চাটতে চাটতে  
ছড়ো পর্যন্ত দিলেন চেটে। বদরুন্দিন মিএও সেনেট হলে বসে জুতো সেলাই  
করছিল, সে হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল। বললে, আপনি শান্তিজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এত বড়ো  
জিনিসটাকে ঝঁটো করে দিলেন!

‘তোবা তোবা’ বলে তিনবার মুনমেন্টের গায়ে থুথু ফেলে মিএওসাহেব দৌড়ে  
গেল টেক্সম্যান-আপিসে খবর দিতে।

শৃতিরত্নমশায়ের হঠাৎ চৈতন্য হল, মুখটা তাঁর অশুন্দ হয়েছে। গেলেন  
মুজিয়মের দরোয়ানের কাছে। বললেন, পাঁড়েজি, তুমিও ব্রাক্ষণ, আমিও ব্রাক্ষণ—  
একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

পাঁড়েজি দাঢ়ি চুম্বিয়ে নিয়ে সেলাম করে বললে, কোমা ভূ পোর্টে ভূ সি ভূ  
প্রে।

পণ্ডিতমশায় একটু চিন্তা করে বললে, বড়ো শক্ত প্রশ্ন, সাংখ্যকারিকা মিলিয়ে  
দেখে কাল জবাব দিয়ে যাব। বিশেষ আজ আমার মুখ অশুন্দ, আমি মনুমেন্ট  
চেটেছি।

পাঁড়েজি দেশালাই দিয়ে বর্মা চুরুট ধরালো। দু টান টেনে বললে, তা হলে  
এক্সুনি খুলুন ওয়েব্স্টার ডিক্সনারি, দেখুন বিধান কী।

শৃতিরত্ন বললেন, তা হলে তো ভাটিপাড়ায় যেতে হয়। সে পরে হবে, আপাতত  
তোমার ঐ পিতলে-বাঁধানো ডাঙাখানা চাই।

পাঁড়ে বললে, কেন, কী করবেন, চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়েছে বুঝি?

শৃতিরত্ন বললেন, তুমি খবর পেলে কেমন করে। সে তো পড়েছিল পরশ  
দিন।

ছুটতে হল উল্টোডিঙ্গিতে যকৃত-বিকৃতির বড়ো ডাঙার ম্যাকার্টনি সাহেবের  
কাছে। তিনি নারকেলডাঙা থেকে শাবল আনিয়ে সাফ করে দিলেন।

পাঁড়েজি বললে, তবে ডাঙায় তোমার কী প্রয়োজন।

পণ্ডিতমশায় বললেন, দাঁতন করতে হবে।

পাঁড়েজি বললে, ওঃ, তাই বলো, আমি বলি নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচবে বুঝি, তা হলে আবার গঙ্গাজল দিয়ে শোধন করতে হত ।

এই পর্যন্ত গুড়গুড়িটা কাছে নিয়ে দু টান টেনে সে বললে, দেখো দাদা, এইরকম তোমার বানিয়ে বলবার ধরন । এ যেন আঙুল দিয়ে না লিখে গণেশের উঁড় দিয়ে লম্বা চালে বাড়িয়ে লেখা । যেটাকে যেরকম জানি সেটাকে অন্যরকম করে দেওয়া । অত্যন্ত সহজ কাজ । যদি বল লাটসাহেব কলুর ব্যাবসা ধরে বাগবাজারে শুটকি মাছের দোকান খুলেছেন, তবে এমন সন্তা ঠাট্টায় যারা হাসে তাদের হাসির দাম কিসের ।

চটেছ বলে বোধ হচ্ছে ।

কারণ আছে । আমাকে নিয়ে পুপুদিদিকে সেদিন যাচ্ছে-তাই কতকগুলো বাজে কথা বলেছিলে । নিতান্ত ছেলেমানুষ বলেই দিদি হাঁ করে সব শুনেছিল । কিন্তু, অদ্ভুত কথা যদি বলতেই হয় তবে তার মধ্যে কারিগরি চাই তো ।

সেটা ছিল না বুঝি ?

না, ছিল না । চুপ করে থাকতুম যদি আমাকে সুন্দ না জড়াতে । যদি বলতে, তোমার অতিথিকে তুমি জিরাফের মুড়িঘন্ট খাইয়েছ, সর্বেবাঁটা দিয়ে তিমিমাছ-ভাজা আর পোলাওয়ের সঙ্গে পাঁকের থেকে টাটকা ধরে আনা জলহস্তী, আর তার সঙ্গে তালের উঁড়ির ডাঁটা-চচ্চড়ি, তা হলে আমি বলতুম, ওটা হল স্তুল । ওরকম লেখা সহজ ।

আচ্ছা, তুমি হলে কী রকম লিখতে ।

বলি, রাগ করবে না ? দাদা, তোমার চেয়ে আমার কেরামতি যে বেশি তা নয়, কম বলেই সুবিধে । আমি হলে বলতুম —

তাসমানিয়াতে তাস খেলার নেমস্তন্ম ছিল, যাকে বলে দেখা-বিন্তি । সেখানে কোঞ্জমাচুকু ছিলেন বাড়ির কর্তা, আর গিন্নির নাম ছিল শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরকুনা । তাঁদের বড়ো মেয়ের নাম পাম্বুনি দেবী, স্বহস্তে রেঁধেছিলেন কিন্তিনাবুর মেরিউনাথু, তার গন্ধ যায় সাত পাড়া পেরিয়ে । গন্ধে শ্যেয়ালগুলো পর্যন্ত দিনের বেলা হাঁক ছেড়ে ডাকতে আরম্ভ করে নির্ভয়ে, লোভে কি ক্ষোভে জানি নে । কাকগুলো জমির উপর ঢোঁট গুঁজে দিয়ে মরিয়া হয়ে পাখা ঝাপটায় তিন ঘণ্টা ধরে । এ তো গেল তরকারি । আর, জালা জালা ভর্তি ছিল কাঙ্গুটোর সাঙ্গচানি । সে দেশের পাকা পাকা অঁকসুটো ফলের ছোবড়া-চোঁয়ানো । এই সঙ্গে মিষ্টান্ন ছিল ইক্টিকুটির ভিক্টিমাই, ঝুড়িভর্তি । প্রথমে ওদের পোষা হাতি এসে পা দিয়ে সেগুলো দ'লে দিল ; তার পরে ওদের দেশের সব চেয়ে বড়ো জানোয়ার, মানুষে গোরুতে সিঙ্গিতে মিশোল, তাকে ওরা বলে গাণিসাঙ্গড়ং, তার কাঁটাওয়ালা জির দিয়ে চেটে চেটে কতকটা নরম করে আনলে । তার পরে তিনশো লোকের পাতের সামনে দমাদ্বয় হামানদিস্তার শব্দ উঠতে লাগল । ওরা বলে, এই ভীষণ শব্দ

শুনলেই ওদের জিবে জল আসে ; দূর পাড়া থেকে শুনতে পেয়ে ভিখারী আসে দলে দলে । খেতে খেতে যাদের দাঁত তেঙ্গে যায় তারা সেই ভাঙা দাঁত দান করে যায় বাড়ির কর্তাকে । তিনি সেই ভাঙা দাঁত ব্যাকে পাঠিয়ে দেন জমা করে রাখতে, উইল করে দিয়ে যান ছেলেদের । যার তবিলে যত দাঁত তার তত নাম । অনেকে লুকিয়ে অন্যের সঁপ্রিত দাঁত কিনে নিয়ে নিজের বলে চালিয়ে দেয় । এই নিয়ে বড়ো বড়ো মকদ্দমা হয়ে গেছে । হাজারদাঁতিরা পঞ্চাশদাঁতির ঘরে মেয়ে দেয় না । একজন সামান্য অনুরোধাঁতি ওদের কেটু নাড় খেতে গিয়ে হঠাৎ দম আটকিয়ে মারা গেল, হাজারদাঁতির পাড়ায় তাকে পোড়াবার লোক পাওয়াই গেল না । তাকে লুকিয়ে ভাসিয়ে দিলে চৌচঙ্গী নদীর জলে । তাই নিয়ে নদীর দুই ধারের লোকেরা খেসারতের দাবি করে নালিশ করেছিল, লড়েছিল প্রিভিকোপিল পর্যন্ত ।

আমি হাঁপিয়ে উঠে বললুম, থামো, থামো ! কিন্তু জিগেস করি, তুমি যে কাহিনীটা আওড়ালে তার বিশেষ গুণটা কী ।

ওর গুণটা এই, এটা কুলের আঁষিটির চাটনি নয় । যা কিছুই জানি নে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার শখ মেটালে কোনো নালিশের কারণ থাকে না । কিন্তু, এতেও যে আছে উচ্চ দরের হাসি তা আমি বলি নে । বিশ্বাস করবার অভীত যা তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য করতে পার যদি, তা হলেই অস্তুত রসের গঁফ জমে । নেহাত বাজারে-চল্পতি ছেলে-ভোলাবার সন্তা অত্যুক্তি যদি তুমি বানাতে থাক তা হলে তোমার অপযশ হবে, এই আমি বলে রাখলুম ।

আমি বললেম, আচ্ছা, এমন করে গঁফ বলব যাতে পুপুদিদির বিশ্বাস ভাঙতে ওরা ডাকতে হবে ।

ভালো কথা, কিন্তু লাটসাহেবের বাড়িতে যাওয়া বলতে কী বোঝায় ।

বোঝায়, তুমি বিদ্যায় নিলেই ছুটি পাই । একবার বসলে উঠতে চাও না, তাই 'তুমি যাও' অনুরোধটা সামান্য একটু ঘুরিয়ে বলতে হল ।

বুঝেছি, আচ্ছা তবে চললুম ।

## ৬

সার্কাস দেখে আসার পর থেকে পুপুদিদির মনটা যেন বাঘের বাসা হয়ে উঠল । বাঘের সঙ্গে, বাঘের মাসির সঙ্গে সর্বদা তার আলাপ চলছে । আমরা কেউ যখন থাকি নে তখনই ওদের মজলিস জমে । আমার কাছে নাপিতের খবর নিছিল ; আমি বললুম, নাপিতের কী দরকার ।

পুপু জানালে, বাঘ ওকে অত্যন্ত ধরে পড়েছে । খৌচা খৌচা হয়ে উঠেছে ওর গৌফ, ও কামাতে চায় ।

আমি জিগেস করলে, গৌফ কামালোর কথা ওর মনে এল কী করে ।

পুপু বললে, চা খেয়ে বাবার পেয়াজায় তলানি যেটুকু থাকি থাকে আমি বাঘকে খেতে দিই । সেদিন তাই খেতে এসে ও দেখতে পেয়েছিল পাঁচুবাবুকে ; ওর বিশ্বাস, গৌফ কামালে ওর মুখখানা দেখাবে ঠিক পাঁচুবাবুই মতো ।

আমি বললুম, সেটা নিতান্ত অন্যায় ভাবে নি। কিন্তু, একটু মুশকিল আছে।  
কামানোর শুরুতেই নাপিতকে যদি শেষ করে দেয় তা হলে কামানো শেষ হবেই  
না।

শুনেই ফস্ক করে পুপের মাথায় বুদ্ধি এল ; বলে ফেললে, জান দাদামশায় ?  
বাঘরা কখনো নাপিতকে খায় না।

আমি বললুম, বল কী। কেন বলো দেখি।

খেলে ওদের পাপ হয়।

ওঁ, তা হলে কোনো ভয় নেই। এক কাজ করা যাবে, চৌরঙ্গিতে  
সাহেব-নাপিতের দোকানে নিয়ে যাওয়া যাবে।

পুপে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, হাঁ হাঁ, ভারি মজা হবে। সাহেবের মাংস নিশ্চয়  
খাবে না, ঘেন্না করবে।

খেলে গঙ্গাস্নান করতে হবে। খাওয়া-ছোওয়ায় বাঘের এত বাছ বিচার আছে,  
ভূমি জানলে কী করে, দিদি।

পুপু খুব সেয়ানার মতো মুখ টিপে হেসে বললে, আমি সব জানি।

আর, আমি বুঝি জানি নে ?

কী জান বলো তো।

ওরা কখনো চাষী কৈবর্তৰ মাংস খায় না ; বিশেষত যারা গঙ্গার পশ্চিম-পারে  
থাকে। শাস্ত্রে বারণ।

আর, যারা পুর-পারে থাকে ?

তারা যদি জেলে কৈবর্ত হয় তো সেটা অতি পবিত্র মাংস। সেটা খাবার নিয়ম বাঁ  
থাবা দিয়ে ছিড়ে ছিড়ে।

বাঁ থাবা কেন।

ঐটে হচ্ছে শুন্দি রীতি। ওদের পশ্চিতরা ডান থাবাকে নোংরা বলে। একটি কথা  
জেনে রাখো দিদি, নাপতিনীদের 'পরে ওদের ঘেন্না। নাপতিনীরা যে মেয়েদের  
পায়ে আলতা লাগায়।

তা লাগালেই বা ?

সাধু বাঘেরা বলে, আলতাটা রজের ভান, ওটা আঁচড়ে কামড়ে ছিড়ে চিবিয়ে  
বের করা রক্ত নয়, ওটা মিথ্যাচার। এরকম কপটাচরণকে ওরা অত্যন্ত নিন্দে  
করে। একবার একটা বাঘ ঢুকেছিল পাগড়িওয়ালার ঘরে, সেখানে ম্যাজেন্টা গোলা  
ছিল গামলায়। রক্ত মনে করে মহা খুশি হয়ে মুখ ডুরোলে তার মধ্যে। সে  
একেবারে পাকা রঙ। বাঘের দাঢ়ি গৌফ, তার দুই গাল, লাল টক্টকে হয়ে উঠল।  
নিবিড় বলে যেখানে বাঘেদের পুরুষপাড়া মোষমারা থামে, সেইখানে আসতেই  
ওদের আঁচড়ি শিরোমণি বলে উঠল, এ কী কাণ ! তোমার সমস্ত মুখ লাল কেন।  
ও লজ্জায় পড়ে মিথ্যে করে বললে, গওয়ার মেরে তার রক্ত খেয়ে এসেছি। ধরা  
পড়ে গেল মিথ্যে। পশ্চিতজি বললে, নখে তো রজের চিহ্ন দেখি না ; মুখ ওঁকে  
বললে, মুখে তো রজের গন্ধ নেই। সবাই বলে উঠল, ছি ছি ! এ তো রক্তও নয়,

পিতৃও নয়, মগজও নয়, মজ্জাও নয় —নিশ্চয় মানুষের পাড়ায় গিয়ে এমন একটা রক্ত খেয়েছে যা নিরামিষ রক্ত, যা অশুচি। পঞ্চায়েত বসে গেল। কামড়বিশারদ-মশায় হৃষ্কার দিয়ে বললে, প্রায়শিত্ব করা চাই। করতেই হল।

যদি না করত।

সর্বনাশ ! ও যে পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের বাপ ; বড়ো বড়ো খরনখিনীর গৌরীদানের বয়স হয়ে এসেছে। পেটের নীচে লেজ গুটিয়ে সাত গুণ মোষ পণ দিতে চাইলেও বর ভুটবে না। এর চেয়েও ভয়ংকর শাস্তি আছে।

কী রকম।

ম'লে শান্ত করবার জন্যে পুরুত পাওয়া যাবে না, শেষকালে হয়তো বেত-জঙ্গল গাঁ থেকে নেকড়ে-বেঘো পুরুত আনতে হবে ; সে ভাবি লজ্জা, সাত পুরুষের মাথা হেঁট।

শান্ত নাই বা হল।

শোনো একবার। বাঘের ভূত যে না খেয়ে মরবে।

সে তো মরেইছে, আবার মরবে কী করে।

সেই তো আরো বিপদ। না খেয়ে মরা ভালো, কিন্তু ম'রে না খেয়ে বেঁচে থাকা যে বিষম দুর্ঘট।

পুপুদিদিকে ভাবিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ বাদে ভুরু কুঁচকিয়ে বললে, ইংরেজের ভূত তা হলে খেতে পায় কী করে।

তারা বেঁচে থাকতে যা খেয়েছে তাতেই তাদের সাত জন্ম অমনি চলে যায়। আমরা যা খাই তাতে, বৈতরণী পার হবার অনেক আগেই পেট চোঁ-চোঁ করতে থাকে।

সন্দেহ মীমাংসা হতেই পুপে জিগেস করলে, প্রায়শিত্ব কিরকম হল।

আমি বললুম, হাঁকবিদ্যা-বাচস্পতি বিধান দিলে যে, বাঘাচল্লীতলার দক্ষিণপশ্চিম কোণে কৃষ্ণপঞ্জী তিথি থেকে শুরু করে অমাবস্যার আড়াই পহর রাত পর্যন্ত ওকে কেবল খ্যাকশ্যালির ঘাড়ের মাংস খেয়ে থাকতে হবে ; তাও হয় ওর পিসতুতো বোন কিংবা মাসতুতো শ্যালার মেজো ছেলে ছাড়া আর কেউ শিকার করলে হবে ন—আর, ওকে খেতে হবে পিছনের ডান দিকের থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে। এত বড়ো শাস্তির হৃকুম শুনেই বাঘের গা বমি-বমি করে এল ; চার পায়ে হাত জোর করে হাউ-হাউ করতে লাগল।

কেন, কী এমন শাস্তি।

বল কী, খ্যাকশ্যালির মাংস ! যত দূর অশুচি হতে হয়। বাঘটা দোহাই পেড়ে বললে, আমাকে বরঞ্চ নেউলের লেজ খেতে বলো সেও রাজি, কিন্তু খ্যাকশ্যালির ঘাড়ের মাংস !

শেষকালে কি খেতে হল ?

হল বৈকি।

দাদামশায়, বাঘেরা তা হলে কুব ধার্মিক ?

ধার্মিক না হলে কি এত নিয়ম বাঁচিয়ে চলে। সেইজন্যেই তো শেয়ালরা ওদের ভারি ভক্তি করে। বাঘের এটো প্রসাদ পেলে ওরা বর্তিয়ে যায়। মাঘের ত্রয়োদশীতে যদি মঙ্গলবার পড়ে তা হলে সেদিন ভোর রাত্তিরে ঠিক দেড় প্রহর থাকতে বুড়ো বাঘের পা চেটে আসা শেয়ালদের ভারি পুণ্যকর্ম। কত শেয়াল প্রাণ দিয়েছে এই পুণ্যের জন্যে।

পুপুর বিষম খটকা লাগল। বললে, বাঘরা এতই যদি ধার্মিক হবে তা হলে জীবহত্যে করে কাঁচা মাংস খায় কী করে।

সে বুঝি যে-সে মাংস। ও-যে মন্ত্র দিয়ে শোধন করা।

কিরকম মন্ত্র।

ওদের সনাতন হালুম-মন্ত্র। সেই মন্ত্র পড়ে তবে ওরা হত্যা করে। তাকে কি হত্যা বলে।

যদি হালুম-মন্ত্র বলতে ভুলে যায়।

বাঘপুঙ্গব-পঞ্জিরের মতে তা হলে ওরা বিনা মন্ত্রে যে জীবকে মারে পরজন্মে সেই জীব হয়েই জন্মায়। ওদের ভারি তয় পাছে মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়।

কেন।

ওরা বলে, মানুষের সর্বাঙ্গ টাক-পড়া, কী কুশী! তার পরে, সামান্য একটা লেজ তা ও নেই মানুষের দেহে। পিঠের মাছি তাড়াবার জন্যেই ওদের বিয়ে করতে হয়। আবার দেখো-না, ওরা খাড়া দাঁড়িয়ে সঙ্গের মতো দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে—দেখে আমরা হেসে মরি। আধুনিক বাঘের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো জ্ঞানী শান্দোল্যতত্ত্বরত্ন বলেন, জীবসৃষ্টির শেষের পালায় বিশ্বকর্মার মালমসলা যখন সমস্তই কাবার হয়ে গেল তখনই মানুষ গড়তে তাঁর হঠাতে শখ হল। তাই বেচারাদের পায়ের তলার জন্যে থাবা দূরে থাক কয়েক টুকরো খুরের জোগাড় করতে পারলেন না, জুতো পরে তবে ওরা পায়ের লজ্জা নিবারণ করতে পারে—আর, গায়ের লজ্জা ঢাকে ওরা কাপড়ে জড়িয়ে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ওরাই হল লজ্জিত জীব। এত লজ্জা জীবলোকে আর কোথাও নেই।

বাঘেদের বুঝি ভারি অহংকার?

অহংকর। সেইজন্যেই তো ওরা এত করে জাত বাঁচিয়ে চলে। জাতের দোহাই পেড়ে একটা বাঘের খাওয়া বন্ধ করেছিল একজন মানুষের মেয়ে; তাই নিয়ে আমাদের সে একটা ছড়া বানিয়েছে।

তোমার মতো সে আবার ছড়া বানাতে পারে নাকি।

তার নিজের বিশ্বাস সে পারে, এই তর্ক নিয়ে তো পুলিস ডাকা যায় না।

আচ্ছা, শোনাও-না।

তবে শোনো—

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,  
গায়ে তার কালো কালো দাগ।  
বেহারাকে খেতে ঘরে ঢুকে  
আঘানাটা পড়েছে সমুখে।

এক ছুটে পালালো বেহারা,  
বাঘ দেখে আপন চেহারা ।  
গাঁ-গাঁ করে ডেকে ওঠে রাগে,  
দেহ কেন ভরা কালো দাগে ।

তেকিশালে পুটু ধান ভানে,  
বাঘ এসে দাঁড়ালো সেখানে ।  
ফুলিয়ে তীষণ দুই গৌফ  
বলে, চাই গ্রিসেরিন সোপ ।

পুটু বলে, ও কথাটা কী যে  
জন্মেও জনি নে তা নিজে ।  
ইংরেজি-টিংরেজি কিছু  
শিখি নি তো, জাতে আমি নিচু ।

বাঘ বলে, কথা বল ঝঁটো,  
নেই কি আমার চোখ দুটো ।  
গায়ে কিসে দাগ হল লোপ  
না মাথিয়ে গ্রিসেরিন সোপ ।

পুটু বলে, আমি কালো কৃষি  
কথনো মাথি নি ও জিনিসটি ।  
কথা শনে পায় মোর হাসি,  
নই মেম-সাহেবের মাসি ।

বাঘ বলে, নেই তো লজ্জা ?  
খাব তোর হাড় মাস মজ্জা ।

পুটু বলে, ছি ছি ওরে বাপ,  
মুখেও আনিলে হবে পাপ ।  
জান না কি আমি অশ্পৃশ্য,  
মহাঞ্চা গাধিজির শিষ্য ।  
আমার মাংস যদি খাও  
জাত যাবে জান না কি তাও ।  
পায়ে ধরি করিয়ো না রাগ !  
জুঁস নে জুঁস নে, বলে বাঘ,  
আরে ছি ছি, আরে রাম রাম,  
বাঘনাপাড়ায় বদনাম  
রটে যাবে ; ঘরে মেয়ে ঠাসা,  
ঘুচে যাবে বিবাহের আশা

দেবী বাঘা-চষ্ণির কোপে ।  
কাজ নেই গ্রিসেরিন সোপে ।

জান, পুপুনিদি ? আধুনিক বাঘেদের মধ্যে ভারি একটা কাণ্ড চলছে — যাকে বলে  
প্রগতি, প্রচেষ্টা । ওদের প্রগতিওয়ালা প্রচারকেরা বাঘ-সমাজে বলে বেড়াচ্ছে যে,  
অস্পৃশ্য বলে খাদ্য বিচার করা পিতৃ জন্ম-আঙ্গার প্রতি অবমাননা । ওরা বলছে,  
আজ থেকে আমরা যাকে পাব তাকেই খাব ; বাঁ থাবা দিয়ে খাব, ডান থাবা দিয়ে  
খাব, পিছনের থাবা দিয়েও খাব ; হালুম-মন্ত্র পড়েও খাব, না পড়েও  
খাব—এমন-কি, বৃহস্পতিবারেও আমরা আঁচড়ে খাব, শনিবারেও আমরা কামড়ে  
খাব । এত ঔদার্য ! এই বাঘেরা যুক্তিবাদী এবং সর্বজীবে এদের সম্মানবোধ অত্যন্ত  
ফলাও । এমন-কি, এরা পশ্চিম-পারের চাষী কৈবর্তদেরও খেতে চায়, এতই এদের  
উদার মন । ঘোরতর দলাদলি বেধে গেছে । প্রাচীনরা নব্য সম্প্রদায়কে নাম দিয়েছে  
চাষী-কৈবর্ত-খেগো, এই নিয়ে মহা হাসাহাসি পড়েছে ।

পুপু বললে, আচ্ছা দাদামশায়, তুমি কখনো বাঘের উপর কবিতা লিখেছ ?  
হার মানতে মন গেল না । বললুম, হাঁ লিখেছি ।

শোনাও-না ।

গঞ্জির সুরে আবৃত্তি করে গেলুম —

তোমার সৃষ্টিতে কভু শক্তিরে কর না অপমান,  
হে বিধাতা—হিংসারেও করেছ প্রবল হস্তে দান  
আশ্চর্য মহিমা এ কী । প্রথরনখর বিভীষিকা,  
দিয়েছ তারে দেহধারী যেন বজ্রশিখা,  
যেন ধূঁজটির ক্রোধ । তোমার সৃষ্টির ভাণে বাঁধ  
ঝঁঝঁা উচ্ছ্বেল, করে তোমার দয়ার প্রতিবাদ  
বনের যে সদ্য হিংস, ফেনজিহ্র ক্ষুক সমুদ্রের  
যে উদ্কৃত উর্ধ্ব ফণা, ভূমিগর্ভে দানবযুক্তের  
ডমরুনিঃস্বনী স্পর্ধা, গিরিবক্ষভেদী বহিশিখা  
যে আঁকে দিগন্তপটে আপন জুলন্ত জয়টিকা,  
প্রলয়নতিনী বন্যা বিনাশের মদিরবিহুল  
নির্লজ্জ নিষ্ঠুর—এই যত বিশ্ববিপূর্বীর দল  
প্রচও সুন্দর । জীবলোকে যে দুর্দান্ত আনে ত্রাস  
হীনতালাঞ্ছনে সে তো পায় না তোমার পরিহাস ।

চুপ করে রইল পুপু । আমি বললুম, কী দিদি, ভালো লাগল না বুঝি ।  
ও কুষ্ঠিত হয়ে বললে, না না, ভালো লাগবে না কেন । কিন্তু, এর মধ্যে বাঘটা  
কোথায় ।  
আমি বললুম, যেমন সে থাকে ঝোপের মধ্যে, দেখা যায় না তবু আছে ভয়ংকর  
গোপনে ।

পুপু বললে, অনেকদিন আগে গ্রিসেরিন-সোপ-ঝৌজা বাঘের কথা আমাকে  
বলেছিলেন। তার খবরটা কোথা থেকে পেলে সে।

আমার কথা ও করে চুরি, নিজের মুখে সেটা দেয় বসিয়ে।

কিন্তু—

‘কিন্তু’ না তো কী। লিখেছে ভালোই।

কিন্তু—

হাঁ, ঠিক কথা। আমি অমন করে লিখি নে, হয়তো লিখতে পারি নে। আমার  
মালটা ও চুরি করে, তার পরে যখন পালিশ করে দেয় তখন চেনা শক্ত হয়—এমন  
চের দেখেছি। ঠিক গ্রীরকম আর-একটি ছড়া বানিয়েছে।

শোনাও-না।

আচ্ছা, শোনো তবে।—

সুন্দরবনের কেঁদো বাঘ,  
সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ  
যথাকালে ভোজনের  
কম হলে ওজনের  
হত তার ঘোরতর রাগ।

একদিন ডাক দিল গাঁ গাঁ—  
বলে, তোর গিন্নিকে জাগা।  
শোন্ বটুরাম ন্যাড়া,  
পাঁচ জোড়া চাই ভ্যাড়া,  
এখনি ভোজের পাত লাগা।

বটু বলে, এ কেমন কথা  
শিখেছ কি এই ভদ্রতা।  
এত রাতে হাঁকাহাঁকি  
ভালো না, জান না তা কি,  
আদবের এ যে অন্যথা।

মোর ঘৰ নেহাত জঘন্য,  
মহাপশু, হেথায় কী জন্য।  
ঘরেতে বাধনী মাসি  
পথ চেয়ে উপবাসী,  
তুমি খেলে মুখে দেবে অন্ন।

সেথা আছে গোসাপের ঠ্যাঙ।  
আছে তো শুটকে কোলা ব্যাঙ।

আছে বাসি খরগোশ,  
গঙ্কে পাইবে তোষ,  
চলে যাও নেচে ড্যাঙ ড্যাঙ ।

নইলে কাগজে প্যারাফাফ  
ঢিটিবে, ঘটিবে পরিতাপ—  
বাঘ বলে, রামো, রামো,  
বাক্যবাগীশ থামো,  
বকুনির চোটে ধরে হাঁপ ।

তুমি ন্যাড়া, আস্ত পাগল,  
বেরোও তো, খোলো তো আগল ।  
ভালো যদি চাও তবে  
আমারে দেখাতে হবে  
কোন্ ঘরে পুষ্যেছ ছাগল ।

বটু কহে, এ কী অকরণ,  
ধরি তব চতুরণ—  
জীববধ মহাপাপ,  
তারো বেশি লাগে শাপ  
প্রধন করিলে হরণ ।

বাঘ শনে বলে, হরি হরি,  
না খেয়ে আমিই যদি মরি,  
জীবেরই নিধন তাহা—  
সহমরণেতে আহা  
মরিবে যে বাধী সুন্দরী ।

অতএব ছাগলটা চাই,  
না হলে তুমিই আছ ভাই  
এত বলি তোলে থাবা ।  
বটুরাম বলে, বাবা,  
চলো ছাগলেরই ঘরে যাই ।

দ্বার খুলে বলে, পড়ো চুকে,  
ছাগল চিবিয়ে খাও সুখে ।

বাঘ সে চুকলি যেই,  
দ্বিতীয় কথাটি নেই,  
বাহিরে শিকল দিল রুখে ।

বাঘ বলে, এ তো বোৰা ভাৱ,  
তামাশাৰ এ নহে আকাৰ ।  
পাঁঠাৰ দেখি নে টিকি,  
লেজেৱ সিকিৰ সিকি  
নেই তো, শুনি নে ভ্যাভ্যাকাৰ ।

ওৱে হিংসুক শয়তান,  
জীৱেৰ বধিতে চাস্ প্রাণ !  
ওৱে জুৰ, পেলে তোৱে  
থাবায় চাপিয়া ধ'বে  
ৱক্ত শুষিয়া কৱি পান—

ঘৱটাৰ ভীষণ মহলা—  
বটু বলে, মহেশ গয়লা  
ও ঘৱে থাকিত, আজ  
থাকে তোৱ যমোৰাজ  
আৱ থাকে পাথুৱে কয়লা ।

গৌফ ফুলে ওঠে ঘেন ঝাঁটা ।  
বাঘ বলে, গেল কোথা পাঁঠা !  
বটুৱাম বলে নেচে,  
এই পেটে তলিয়েছে,  
খুঁজিলে পাবে না সারা গাঁটা ।

ভালো লাগল ?

তা, যাই বলো দাদামশায়, কিন্তু বাঘেৰ ছড়া খুব ভালো লিখেছে ।  
আমি বললুম, তা হবে, হয়তো ভালোই লিখেছে । কিন্তু, ও ভালো লেখে কি  
আমি ভালো লিখি সে সমক্ষে শেষ অভিমতটা দেবাৰ জন্যে অন্তত আৱো দশটা  
বছৰ অপেক্ষা কোৱো ।

পুপু বললে, আমাৰ বাঘ কিন্তু আমাকে খেতে আসে না ।  
সে তো তোমাকে প্ৰত্যক্ষ দেখেই বুবাতে পাৱছি । তোমাৰ বাঘ কী কৱে ।  
ৱাস্তিৱে যখন শুয়ে থাকি বাহিৱে থেকে ও জানলা আঁচড়ায় । খুলে দিলেই হাসে ।  
তা হতে পাৱে, ওৱা খুব হাসিয়ে জাত । ইংৱেজিতে যাকে বলে হিউমৰাস্ ।  
কথায় কথায় দাঁত বেৱ কৱে ।

পুপে এসে জিগেস করলে, দাদামশায়, তুমি তো বললে শনিবারে সে আসবে  
তোমার নেমন্তন্ত্রে। কী হল।

সবই ঠিক হয়েছিল। হাজি মিএঝা শিক্কাবাব বানিয়েছিল, তোফা হয়েছিল  
খেতে।

তার পরে?

তার পরে নিজে খেলুম তার বাবো-আনা আন্দাজ, আর পাড়ার কালু ছেঁড়াটাকে  
দিলুম বাকিটুকু। কালু বললে, দাদাবাবু, এ-যে আমাদের কাঁচকলার বড়ার চেয়ে  
ভালো।

সে কিছু খেল না?

জো কী।

সে এল না?

সাধ্য কী তার।

তবে সে আছে কোথায়?

কোথাও না।

যারে?

না।

দেশে?

না।

বিলেতে?

না।

তুমি যে বলছিলে, আগামানে যাওয়া ওর এক রকম ঠিক হয়ে আছে। গেল  
নাকি।

দরকার হল না।

তা হলে কী হল আমাকে বলছ না কেন।

ভয় পাবে কিংবা দুঃখ পাবে, তাই বলি নে।

তা হোক, বলতে হবে।

আচ্ছা, তবে শোনো। সেদিন ক্লাস-পড়াবার খাতিরে আমার পড়ে নেবার কথা  
ছিল বিদ্যমুখমণ্ডন'। এক সময় হঠাৎ দেখি, সেটা রয়েছে পড়ে, হাতে উঠে  
এসেছে 'পাঁচপাঁক্কাশির পিস্শান্তি'। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, রাত হবে  
তখন আড়াইটা। স্বপ্ন দেখছি, গরম তেল জুলে উঠে আমাদের কিনি বাম্পির মুখ  
বেবাক গিয়েছে পুড়ে; সাত দিন সাত রাতির হত্যে দিয়ে তারকেশ্বরের প্রসাদ  
পেয়েছে দু'কৌটো লাহিড়ি কোম্পানির মূল্লাইট স্নো; তাই মাথছে মুখে ঘ'ষে  
ঘ'ষে। আমি বুঝিয়ে বললুম, ওতে হবে না গো, মোষের বাঞ্ছার গালের চামড়া  
কেটে নিয়ে মুখে জুড়তে হবে, নহিলে রঙ মিলবে না। শুনেই আমার কাছে সওয়া  
তিন টাকা ধার নিয়ে সে ধর্মতলার বাজারে মোষ কিনতে দৌড়েছে। এমন সময়

ঘরে একটা কী শব্দ শোনা গেল, কে যেন হাওয়ার তৈরি চটিজুতো হুস হুস করে টানতে টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধড়ফড় করে উঠলেম, উস্কে দিলেম লঞ্চনটা। ঘরে একটা-কিছু এসেছে দেখা গেল কিন্তু সে যে কে, সে যে কী, সে যে কেমন, বোঝা গেল না। বুক ধড়ফড় করছে, তবু জোর গলা করে হেঁকে বললুম, কে হে তুমি। পুলিস ডাকব নাকি।

অন্তু হাঁড়িগলায় এই জীবটা বললে, কী দাদা, চিনতে পারছ না? আমি যে তোমার পুপেদিনির সে। এখানে যে আমার নেমন্তন্ত্র ছিল।

আমি বললুম, বাজে কথা বলছ, এ কী চেহারা তোমার!

সে বললে, চেহারাখানা হারিয়ে ফেলেছি।

হারিয়ে ফেলেছ? মানে কী হল।

মানেটা বলি। পুপেদিনির ঘরে ভোজ, সকাল-সকাল নাইতে গেলেম। বেলা তখন সবেমাত্র দেড়টা। তেলেনিপাড়ার ঘাটে বসে ঝামা দিয়ে কবে মুখ মাজ্জিলুম; মাজার চোটে আরামে এমনি ঘূম এল যে, তুলতে তুলতে ঝুঁপ করে পড়লুম জলে; তার পরে কী হল জানি নে। উপরে এসেছি কি নীচে কি কোথায় আছি জানি নে, পঁষ্ট দেখা গেল আমি নেই।

নেই!

তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—

আরে আরে, গা ছুঁতে হবে না, বলে যাও।

চুলকুনি ছিল গায়ে; চুলকতে গিয়ে দেখি, না আছে নখ, না আছে চুলকানি। ভয়ানক দুঃখ হল। হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলুম, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যে হাউহাউটা বিনা মূল্যে পেয়েছিলুম সে গেল কোথায়। যত চেঁচাই চেঁচানোও হয় না, কান্নাও শোনা যায় না। ইচ্ছে হল, মাথা ঠুকি বটগাছটাতে; পুকুরধারে টিকি খুঁজে পাই নে কোথাও। সব চেয়ে দুঃখ—বারোটা বাজল, ‘খিদে কই’ ‘খিদে কই’ বলে পুকুরধারে পাক খেয়ে বেড়াই, খিদে-বাঁদরটার চিহ্ন মেলে না।

কী বক্ছ তুমি, একটু থামো।

ও দাদা, দোহাই তোমার, থামতে বোলো না। থামবার দুঃখ যে কী অ-থামা মানুষ সে তুমি কী বুঝবে। থামব না, আমি থামব না, কিছুতেই থামব না, যতক্ষণ পারি থামব না।

এই বলে ধূপ্ধাপ্ ধূপ্ধাপ্ করে লাফাতে লাগল, শেষকালে ডিগবাজি খেলা শুরু করলে আমার কার্পেটের উপর, জলের মধ্যে শুশ্কের মতো।

করছ কী তুমি।

দাদা, একেবারে বাদশাহি থামা থেমেছিলুম, আর কিছুতেই থামছি নে। মারধোর যদি কর সেও লাগবে ভালো। আন্ত কিলের যোগ্য পিঠ নেই যখন জানতে পারলুম, তখন সাতকড়ি পঞ্চিতমশায়ের কথা মনে করে বুক ফেটে যেতে চাইল, কিন্তু বুক নেই তো ফাটবে কী। কই-মাছের যদি এই দশা হত তা হলে বামুনঠাকুরের হাতে পায়ে ধ্রুত তাকে একবার তণ্ড তেলে এপিঠ ওপিঠ ওল্টাতে

পাল্টাতে। আহা, যে পিঠখানা হারিয়েছে সেই পিঠে পশ্চিমশায়ের কত কিলই খেয়েছি, ইট দিয়ে তৈরি খইয়ের মোয়াগুলোর মতো। আজ মনে হয়, উঃ—দাদা, একবার কিলিয়ে দাও খুব করে দমাদম—

বলে আমার কাছে এসে পিঠ দিলে পেতে।

আমি আঁতকে উঠে বললুম, যাও যাও, সরে যাও।

ও বললে, কথাটা শেষ করে নিই। একখানা গা খুঁজে খুঁজে বেড়ালুম গাঁয়ে গাঁয়ে। বেলা তখন তিন পহর। যতই রোদে বেড়াই কিছুতেই রোদে পুড়ে সারা হচ্ছি নে, এই দুঃখটা যখন অসহ্য এমন সময় দেখি, আমাদের পাতুখুড়ো মুচিখোলার বটগাছতলায় গাঁজা খেয়ে শিবনেত্র। মনে হল, তার প্রাণপুরুষটা বিন্দু হয়ে ব্রহ্মতালুর চূড়োয় এসে জোনাক-পোকার মতো মিট্মিট্ করছে। বুকলুম, হয়েছে সুযোগ। নাকের গর্ত দিয়ে আস্থারামকে ঠেসে চালিয়ে দিলুম তার দেহের মধ্যে, নতুন নাগরা জুতোর ভিতরে যেমন করে পাঁটা ঠেসে গুঁজতে হয়। সে হাঁপিয়ে উঠে ভাঙা গলায় বলে উঠল, কে তুমি বাবা, ভিতরে জায়গা হবে না।

তখন তার গলাটা পেয়েছি দখলে; বললুম, তোমার হবে না জায়গা, আমার হবে। বেরোও তুমি।

সে গো গো করতে করতে বললে, অনেকখানি বেরিয়েছি, একটু বাকি। ঠেলা মারো।

দিলুম ঠেলা, ছস করে গেল বেরিয়ে।

এ দিকে পাতুখুড়োর গিন্ধি এসে বললে, বলি, ও পোড়ারমুখো। কান জুড়িয়ে গেল। বললুম, বলো বলো, আবার বলো, বড়ো মিষ্টি লাগছে, এমন ডাক যে আবার কোনোদিন শুনতে পাব এমন আশাই ছিল না।

বুড়ি ভাবলে ঠাণ্টা করছি, ঝাঁটা আনতে গেল ঘরের মধ্যে। তব হল, পড়ে-পাওয়া দেহটা খোয়াই বুঝি। বাসায় এসে আয়নাতে মুখ দেখলুম, সমস্ত শরীর উঠল শিউরে। ইচ্ছে করল রঁয়াদা দিয়ে মুখটাকে ছুলে নিই।

গা-হারার গা এল, কিন্তু চেহারা-হারার চেহারাখানা সাত বাঁও জলের তলায়, তাকে ফিরে পাবার কী উপায়।

ঠিক এই সময়ে দীর্ঘ বিছেদের পর খিদেটাকে পাওয়া গেল। একেবারে জঠের জুড়ে। সব কটা নাড়ি চৌ চৌ করে উঠেছে এক সঙ্গে। চোখে দেখতে পাই নে পেটের জ্বালায়। যাকে পাই তাকে খাই গোছের অবস্থা। উঃ, কী আনন্দ।

মনে পড়ল, তোমার ঘরে পুপুদিদির নেমন্তন্ত্র। রেলভাড়ার পয়সা নেই। হেঁটে চলতে শুরু করলুম। চলার অসম্ভব মেহন্ততে কী যে আরাম সে আর কী বলব। স্ফূর্তিতে একেবারে গলদৃঢ়ম। এক এক পা ফেলছি আর মনে মনে বলছি, থামছি নে, থামছি নে, চলছি তো চলছিই। এমন বেদম চলা জীবনে কখনো হয় নি। দাদা, পুরো একখানা গা নিয়ে বসে আছ কেদারায়, বুঝাতেই পার না কষ্টতে যে কী মজা। এই কষ্টে বুঝতে পারা যায়, আছি বটে, খুব কষে আছি, শোলো-আনা পেরিয়ে গিয়ে আছি।

আমি বললুম, সব বুঝলুম, এখন কী করতে চাও বলো ।

করবার দায় তোমারই, নেমন্তন্ত্র করেছিলে, খাওয়াতে হবে, সে কথা ভুললে চলবে না ।

রাত এখন তিনটে সে কথা তুমিও ভুললে চলবে না ।

তা হলে চললুম পুপুদিদির কাছে ।

খবরদার !

দাদা, ভয় দেখাছ মিছে, মরার বাড়া গাল নেই । চললুম ।

কিছুতেই না ।

সে বললে, যাবই ।

আমি বললুম, কেমন যাও দেখব ।

সে বলতে লাগল, যাবই, যাবই, যাবই ।

আমার টেবিলের উপর চড়ে নাচতে নাচতে বললে, যাবই, যাবই, যাবই ।

শেষকালে পাঁচালির সুর লাগিয়ে গাইতে লাগল, যাবই, যাবই, যাবই ।

আর থাকতে পারলুম না । ধরলুম ওর লস্বা চুলের বুঁটি । টানাটানিতে গা থেকে, ঢিলে মোজার মতো, দেহটা সর্বস্ব করে খসে ধপ্ত করে পড়ে গেল ।

সর্বনাশ ! গাঁজাখোরের আজ্ঞাপুরুষকে খবর দিই কী করে । চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, আরে আরে, শোনো শোনো, চুকে পড়ো এই গাঁটার মধ্যে, নিয়ে যাও এটাকে ।

কেউ কোথাও নেই । ভাবছি, আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দেব ।

পুপোদিদি এতখানি চোখ করে বললে, সত্যি কি, দাদামশায় ।

আমি বললুম, সত্যির চেয়ে অনেক বেশি—গল্প ।

### ৮

আমি তখন এম. এ. ক্লাসের জন্যে এরিয়োপ্যাজিটিকার নোট লিখছি, মিলিয়ে দেখবার জন্যে বই পড়তে হচ্ছিল ইন্ট্রন্যাশনল মেলিয়ুয়স্ অ্যাব্রা-ক্যাড্যাব্রা, আর পাত কেটে পরিশিষ্ট দেখছিলুম শ্রী হেন্ডেড ইয়ার্স্ অব ইন্ডো-ইণ্ডিটর্মিনেশন্ বইখানার ।

লাইব্রেরি থেকে আনাতে দিয়েছি অনোম্যাটোপিইয়া অব টিনিয়াব্যুলেশন্ । এমন সময় হৃত্তমূড় করে এসে চুকল আমাদের সে ।

আমি বললুম, হয়েছে কী, স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়েছে নাকি ।

ও বললে, নিশ্চয় দিত যদি সে থাকত । কিন্তু, কী কাও বাধিয়েছ বলো দেখি ।

কেন, কী হল ।

আমাকে নিয়ে এ পর্যন্ত বিস্তর আজগবি গল্প বানিয়েছ । ভাগ্যে আমার নামটা দাও নি, নইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দায় হত । দেখলুম পুপুদিদির মজা লাগছে, তাই সহ্য করেছি সব । কিন্তু এবার যে উল্টো হল ।

কেন, কী হল বলোই-না ।

তবে শোনো । পুপুদিদি কাল গিয়েছিল সিনেমায় । মোটরে উঠতে যাচ্ছে, আমি পিছন থেকে এসে বললুম, দিদিমণি, তোমার গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে যাও । তার পরে কী আর বলব দাদা, একেবারে হিটিরিয়া ।

কিরকম ।

হাতে চোখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠে দিদি বললে, যাও যাও, গাঁজাখোরের গা চুরি করে আমার গাড়িতে উঠতে পাবে না । চার দিক থেকে লোক এল ছুটে, আমাকে পুলিসে ধরে নিয়ে যায় আর-কি । জীবনে অনেক নিন্দে শুনেছি, কিন্তু এরকম ওরিজিন্যাল নিন্দে শুনি নি কখনো । গাঁজাখোরের গা চুরি করা ! আমার অতিবড়ো প্রাণের বক্সুও এমন নিন্দে আমার নামে রটায় নি । বাড়ি ফিরে এসে সমস্ত ব্যাপারটা শোনা গেল । এ তোমারই কীর্তি ।

আমারই তো বটে । কী করি বলো । তোমাকে নিয়ে আর কাঁহাতক গল্প বানাই । বয়স হয়ে গেছে, কলমটাকে যেন বাতে ধরল, পুপুদিদির ফরমাশ-মতো অসম্ভব গল্প বলার হালকা চাল আর নেই কলমের । তাই এই শেষ গল্পটাতে তোমাকে একেবারে খতম করে দিয়েছি ।

অতম হতে রাজি নই, দাদা । দোহাই তোমার, পুপুদিদির ভয় ভাঙিয়ে দাও । বুঝিয়ে বলো, ওটা গল্প ।

বলেছিলুম, কিন্তু ভয় ভাঙতে চায় না । নাড়ীতে জড়িয়ে গেছে । উপায় না দেখে হয়ৎ সেই পাতু গেঁজেলকে আনলুম তার সামনে, উল্টো হল ফল । পাতুর গা'খানা প'রে যে তুমই ঘূরে বেড়াচ্ছ তারই প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে গেল ।

তা হলে দাদা, গল্পটাকে উল্টিয়ে দাও, ধনুষ্ঠানে মরুক পাতু । গাঁজাখোরের গা'খানাকে নিমতলার ঘাটে পুড়িয়ে ফেলো । ঘটা করে তার শাক করব, পুপুদিদিকে করব তাতে নেমস্তন ; খরচ যত পড়ে দেব নিজের পকেট থেকে । আমি হলুম দিদির গল্পের বহুরূপী, হঠাৎ এত বড়ো পদ থেকে আমাকে অপদস্থ করলে বাঁচব না ।

আচ্ছা, গল্পের উল্টোরথে তোমাকে পুপুদিদির ঘরে আবার ফিরিয়ে আনব ।

পরদিন সন্ধ্যার সময় সে এল, আমি শুরু করলুম গল্পটা । —

বললুম, পাতুর স্ত্রী স্বামীর স্বত্ত্ব পাবার জন্যে তোমার নামে আদালতে নালিশ করেছে ।

এইটুকু শুনেই সে বলে উঠল, এ চলবে না, দাদা । পাতুর স্ত্রীকে তুমি চক্ষে দেখ নি তো । মকদ্দমায় ঐ মহিলাটি যদি জেতে তা হলে যে আসামীপক্ষ আফিম খেয়ে মরবে ।

ভয় কী, কথা দিচ্ছি, হার হোক, জিত হোক, টিকিয়ে রাখব তোমাকে ।

আচ্ছা, বলে যাও ।

হাত জোড় করে তুমি হাকিমকে বললে, হজুর, ধর্মাবতার, সাত পুরুষে আমি  
ওর স্বামী নই ।

উকিল চোখ রাঙিয়ে বললে, স্বামী নও, তার মানে কী ।

তুমি বললে, তার মানে, এ পর্যন্ত আমি ওকে বিয়ে করি নি, দ্বিতীয় আর কোনো  
মানে আপাতত কিছুতেই ভেবে পাছি নে ।

রামসদয় মোক্তার খুব একটা ধর্মক দিয়ে বললে, আলবৎ তুমি ওর স্বামী, মিথ্যে  
কথা বোলো না ।

তুমি জজসাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে, জীবনে বিস্তর মিথ্যে বলেছি, কিন্তু ঐ  
বুড়িকে সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় বিয়ে করেছি, এত বড়ো দিগ্গংজ মিথ্যে বানিয়ে বলবার  
তাকত আমার নেই । মনে করতে বুক কেঁপে ওঠে ।

তখন ওরা সাক্ষী তলব করলে পঁয়ত্রিশজন গাঁজাখোরকে । একে একে তারা  
গাঁজাটোপা আঙুল তোমার মুখে বুলিয়ে বলে গেল, চেহারাটা একেবারে হ্বহু পাতুর  
; এমন-কি, বাঁ কপালের আবটা পর্যন্ত । তবে কি না—

মোক্তার তেরিয়া হয়ে উঠে বললে, ‘তবে কি না’ আবার কিসের ।

ওরা বললে, সেই রকমের পাতুই বটে, কিন্তু সেই পাতুই, হলপ করে এমন  
কথা বলি কী করে । ঠাকুরকে তো জানি, বন্ধু কম দুঃখ পায় নি, অনেক ঝাঁটা  
শয়ে গেছে ওর পিঠে । তার দাম বাঁচালে গাঁজার খরচে টানাটানি পড়ত না । তাই  
বলছি হজুর, আদালতে হলপ করে ভদ্রলোকের সর্বনাশ করতে পারব না ।

মোক্তার চোখ রাঙিয়ে বললে, তা হলে এ লোকটা কে বলো । দ্বিতীয় পাতু  
বানাবার শক্তি ভগবানেরও নেই ।

গেঁজেলের সর্দার বললে, ঠিক বলেছ বাবা, এরকম মিষ্টি দৈবাং হয় । ভগবান  
নাকে খত দিয়েছেন, এমন কাজ আর করবেন না । তবু তো শ্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি  
যে, একটা কোনো শয়তান ভগবানের পাল্টা জবাব দিয়েছে । একেবারে ওস্তাদের  
হাতের নকল, পাকা জালিয়াতের কাজ । পাতুর দেহখানা শুকিয়ে শুকিয়ে ওর নাক  
চিম্সিয়ে বেঁকে গিয়েছিল, সেই বক্ষিমচন্দুরে নাকটি পর্যন্ত যেন কেটে ওর মুখের  
মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে । ওর হাতের চামড়া নকল করতে বোধ করি হাজার  
চামচিকের ডানা খরচ করতে হয়েছে ।

তুমি দেখলে মকদ্দমা আর টেঁকে না ; সাহেবকে বললে, এক হঞ্চা সময় দিন,  
খাঁটি পাতু পক্ষীরাজকে হাজির করে দেব এই আদালতে ।

তখনই ছুটলে তেলিনিপাড়ার দিঘির ঘাটে । কপাল ভালো, ঠিক তক্ষুনি তোমার  
দেহটা উঠছে ভেসে । পাতুর দেহ ডাঙ্গায় চিত করে ফেলে পুরোনো খোলটা জুড়ে  
বসলে ! মন্ত একটা হাঁপ ছেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলে, ওরে পাতু !

তখনই ওর দেহটা উঠল খাড়া হয়ে । পাতু বললে, ভায়া, সঙ্গে সঙ্গেই ছিলুম ।  
মনটা অস্ত্র ছিল গাঁজার মৌতাতে । ইচ্ছে করত, আঘাত্যে করি, কিন্তু সে রাস্তাও  
তুমি জুড়ে বসেছিলে । বেঁচে যখন ছিলুম তখন বেঁচে থাকবার শখ ছিল  
ঘোলো-আনা ; যেমনি মরেছি অমনি আর যে কোনোমতেই কোনো কালেই মরতে

পারব না, এই দুঃখ অসহ্য হয়ে উঠল। সামান্য একটা দড়ি নিয়ে গলায় ফাঁস  
লাগাব, এটুকু ঘোগ্যতাও রইল না।

তুমি বললে, যা হবার তা তো হল, এখন চলো আদালতে। জজসাহেবকে বলে  
তোমার গৌজার বরাদ্দ করে দেব।

গেলে আদালতে। জজসাহেব পাতুকে ধমক দিয়ে বললে, এ বুড়ি তোমার স্ত্রী  
কি না সত্যি করে বলো।

পাতু বললে, হজুর, সত্যি করে বলতে মন যায় না। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে  
মিথ্যে বলে পাপ করব কেন। নিশ্চয় জানি যে, পাপের সঙ্গে সঙ্গে উনিই পিছন  
পিছন ছুটবেন। উনিই আমার প্রথম পক্ষের পরিবার।

সাহেব জিগেস করলেন, আরো আছে না কি।

পাতু বললে, না থাকলে মান রক্ষা হয় না যে। কুলীনের ছেলে। নৈকব্যকুলীন।

রবিবার দিনে পুপুদিদি পড়েছে গল্পটা। আমাকে জিগেস করলে, আচ্ছা  
দাদামশায়, তুমি যে লিখেছ একরাশ ইংরেজি বই নিয়ে কোন কলেজের জন্যে বই  
লিখছ। তোমার আবার কলেজ কোথায়, তা ছাড়া কখনো তো দেখি নি ঐ রকমের  
বই খুলতে। তুমি তো লেখ কেবল ছড়া।

স্পষ্ট জবাব না দিয়ে একটুখানি হাসলুম।

আচ্ছা দাদামশায়, তুমি কি সংকৃত জ্ঞান।

দেখো পুপুদিদি, এরকম প্রশ্নগুলো বড়ো ঝঢ়। মুখের সামনে জিগেস করতে  
নেই।

## ৯

সকালবেলায় পুপুদিদি উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে, দাদামশায় সে'কে নিয়ে সব গল্প  
কি ফুরিয়ে গেল।

দাদামশায় খবরের কাগজ ফেলে রেখে চশমা কপালে তুলে বললে, গল্প ফুরোয়  
না, গল্প-বলিয়ের দিন ফুরোয়।

আচ্ছা ; ও তো গা ফিরিয়ে পেলে, তার পরে কী হল বলো-না।

আবার ওকে গা খাটিয়ে মরতে হবে, গায়ে প'ড়ে নিতে হবে নানা দায়। কখনো  
গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে। কখনো গালমন্দ গা পেতে নেবে, কখনো নেবে না।  
কখনো কাজে গা লাগবে, কখনো লাগবে না। ওর গা থাকা সত্ত্বেও কুঁড়েমি দেখে  
লোকে বলবে, কিছুতে ওর গা নেই। কখনো গা ঘুরবে, কখনো গা কেমন করবে,  
গা ঘুলিয়ে যাবে। কখনো গা ভার হবে, কখনো গা মাটি-মাটি করবে, গা  
ম্যাজ্ম্যাজ্জ করবে, গা সির্সির করবে, গা ঘিন্ঘিন করতে থাকবে। সংসারটা  
কখনো হবে গা-সওয়া, কখনো হবে উল্টো। কারও কথায় গা জুলৈ যাবে, কারও  
কথায় গা যাবে জুড়িয়ে। বন্ধুবন্ধিবের কথা শুনে গায়ে জুর আসবে। এত মুশকিল  
একখানা গা নিয়ে।

আচ্ছা, দাদামশায়, ও যখন আর-একজনের গা নিয়ে বেড়াত তখন মুশকিল হত কার। গা কেমন করলে ওর করত কি তার করত।

শক্ত কথা। আমি তো বলতে পারব না, ওকে জিগেস করলে ওরও মাথা ঘুরে যাবে।

দাদামশায়, গা নিয়ে এত হঙ্গাম আমি কখনো ভাবি নি।

ঐ হঙ্গামগুলো জোড়া দিয়েই তো যত গল্প। গায়ের উপর সওয়ার হয়ে গল্প ছুটেছে চার দিকে। কোনো গা গল্পের গাধা, কোনো গা গল্পের রাজহস্তী।

তোমার গা কী, দাদামশায়।

বলব না। অহংকার করতে বারণ করে শাস্ত্রে।

দাদামশায়, সে'র গল্প তুমি থামিয়ে দিলে কেন।

বলি তা হলে। কুঁড়েমির স্বর্গ সকল স্বর্গের উপরে। সেখানে যে ইন্দ্র বসে অমৃত খাচ্ছেন হাজার চক্ষু আধখানা বুজে, তিনি হলেন গল্পের দেবতা। আমি তাঁর ভক্ত; কিন্তু তাঁর সভায় আজকাল চুকতেই পারি নে। আমার ভাগে গল্পের প্রসাদ অনেকদিন থেকে বন্ধ।

কেন।

পথ ভুল হয়ে গিয়েছিল।

কী করে।

অমরাবতীর যে সুরধূনীনদীর এক পারে ইন্দ্রলোক, তারই ভাঁটিতে আছে আর-এক স্বর্গ। কারখানাঘরের কালো ধোয়ার পতাকা উড়েছে সেখানকার আকাশে। সেটা হল কাজের স্বর্গ। সেখানে হাফপ্যান্ট-পরা দেবতা বিশ্বকর্মা। একদিন শর ঝকালের সকালে পুজোর থালায় শিউলিফুল সাজিয়ে রাস্তায় চলেছি; ঘাড়ের উপর এসে পড়ল বাইক-চড়া এক পাণ্ড। তার ঝুঁটিতে একতাড়া খাতা; বুকের পকেটে একটা লাল কালির, একটা কালো কালির ফাউন্টেন্পেন! খবরের কাগজের কাটা টুকরোর বাণিল চায়না-কোটের দুই পকেট ছাঢ়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে; ডান হাতের কজিঘড়িতে স্ট্যাভার্ড টাইম, বাঁ হাতে কলকাতা টাইম; ব্যাগে ই.আই.আর., এ.বি. আর., এন. ডব্লু. আর., বি. এন. আর., বি. বি. আর., এস. আই. আর.-এর টাইম-টেবিল। বুকের পকেটে নেটবই ডায়রি-সূচন। ধাক্কা খেয়ে মুখ খুবড়িয়ে পড়ি আর-কি। সে বললে, আকাশের দিকে তাকিয়ে চলেছ কোন চুলোয়।

আমি বললুম, রাগ কোরো না, পাঞ্জাজি। মন্দিরে পুজো দিতে যাব, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি নে।

সে বললে, তোমরা বুঝি মেঘের-দিকে-হাঁ-করে-তাকানো রাস্তা-খোজার দল ! চলো, পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমাকে হিড়ুহিড়ু করে করে টেনে নিয়ে এল বিশ্বকর্মাঠাকুরের মন্দিরে। হাঁ-না করবার সময় দিলে না। কিছু জিগেস করবার আগেই বললে, রাখো এইখানে থালা, পকেট থেকে বের করো পাঁচ-সিকে দক্ষিণে।

বোকার মতো পুজো দিলেম। তখনই হিসেব সে টুকে নিলে তার নোটবইয়ে।  
কজিভড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, হয়েছে কাজ, এখন বেরোও। সময় নেই।

পরদিন থেকেই দেখি ফল ফলেছে। ভোর তখন সাড়ে চারটে। ডাকাত পড়েছে  
ভেবে ধড়ফড় করে ঘূম ভেঙে শুনি, অনাথতারিণী সভার সভ্যেরা বারো-তেরো  
বছরের পঁচিশটা ছেলে জুটিয়ে দরজায় এসে চীৎকারস্বরে গান জুড়ে দিয়েছে—

যত পেটে ধরে তার চেয়ে ভর পেটে,

টাকা পয়সায় পকেট পড়ছে ফেটে—

হিসেব খতিয়ে দেখলে বুঝতে পার

অনাথজনের কত ধার তুমি ধার'।

তারো, গরিবেরে তারো,

তারো, তারো, তারো।

'তারো তারো' করতে করতে ভীষণ চাঁটি পড়তে লাগল খোলে। মনে মনে যত  
খতিয়ে দেখছি তহবিলে কত টাকা বাকি, চাঁটি ততই কানে তালা ধরিয়ে দিলে।  
সঙ্গে সঙ্গে বাজল কাঁসর; 'তারো তারো তারো' করে নাচ জুড়ে দিলে ছেলেগুলো।  
অসহ্য হয়ে এল। দেরাজ খুলে থলিটা বের করলেম! সাত দিনের  
না-কামানো-দাঢ়ি-ওয়ালা ওদের সর্দার উৎসাহিত হয়ে চাদর পেতে ধরলে। থলি  
ঝাড়তে বেরোল এক টাকা, ন আনা, তিন পয়সা। মাসের দু দিন বাকি, দর্জির  
দেনার জন্যে টানাটানি করে ঐটুকু বেথেছিলেম।

গান ছেড়ে গাল শুরু করলে। বললে, অগাধ টাকা, চিরটা দিন পায়ের উপর পা  
দিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে আছ ; ভুলেছ, যেদিন মরবে সেদিন তোমার মতো  
লক্ষপতির যে দর আর আমাদের ছেঁড়া-ট্যানা-পরা ভিত্তিরিও সেই দর।

এ কথাগুলো পুরোনো ঠেকল, কিন্তু ঐ লক্ষপতি বিশেষটাতে শরীর রোমাঞ্চিত  
হয়ে উঠল।

এই হল শুরু। তার পরে ইতিমধ্যে পঁচিশটা সভার সভ্য হয়েছি। বাংলাদেশে  
সরকারি সভাপতি হয়ে দাঁড়ালেম। আদি ভারতীয় সংগীতসভা, কচুরিপানা-ধৰ্মসন  
সভা, মৃতসৎকার সভা, সাহিত্যশোধন সভা, তিন চাতুরাসের সমন্বয় সভা,  
ইক্ষুছিবড়ের পণ্যপরিগতি সভা, খন্যানে খনার লুণ্ডিটা-সংস্কারসভা, পিজরাপোলের  
উন্নতিসাধিনী সভা, ক্ষৌরব্যয়নিবারিণী-দাঢ়ি-গৌঁফ-রক্ষণী সভা—ইত্যাদি সভার  
বিশিষ্ট সভ্য হয়েছি। অনুরোধ আসছে, ধনুষকারত্ব বইখানির ভূমিকা লিখতে,  
নব্যগণিতপাঠের অভিমত দিতে, ভূবনভাঙ্গায় ভবভূতির জন্মস্থাননির্ণয় পুস্তিকার  
ঘস্থকারকে আশীর্বাদ পাঠাতে, রাগুলপিণ্ডির ফরেন্ট অফিসারের কন্যার নামকরণ  
করতে, দাঢ়িকামানো সাবানের প্রশংসা জানাতে, পাগলামির ওয়ুধ সম্বন্ধে নিজের  
অভিজ্ঞতা প্রচার করতে।

দাদামশায়, মিছিমিছি তুমি এত বেশি বক যে তোমার সময় নেই বললে কেউ  
বিশ্বাস করে না। আজ তোমাকে বলতেই হবে, গা ফিরে পেয়ে কী করলে সে।

বিষম খুশি হয়ে চল গেল দমদমে ।

দমদমে কেন ।

অনেক দিন পরে নিজের কান দুটো ফিরে পেয়ে স্বকর্ণে আওয়াজ শোনবার শখ  
ওর কিছুতে মিটতে চায় না । শ্যামবাজারের মোড়ে কান পেতে থাকে ট্রামের  
বাসের ঘড়ঘড়নিতে । টিটেগড়ের চটকলের দারোয়ানের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছে,  
তার ঘরে বসে কলের গর্জন শুনে ওর চোখ বুজে আসে । ঠোংয় করে রসগোল্লা  
আর আলুর দম নিয়ে বারুন্ধ কোম্পানির কামারের দোকানে বসে খেতে যায় ।  
বলুকের তাক অভ্যেস করতে গোড়া ফৌজ গেছে দমদমে, ও তারই ধূম ধূম শব্দ  
শুনছিল আরামে, টার্গেটের ও পারে ব'সে । আনন্দে আর থাকতে পারলে না,  
টার্গেটের এ ধারে মুখ বাড়িয়ে দেখতে এসেছে, লাগল একটা গুলি ওর মাথায় ।—  
বাস্ ।

বাস্ কী, দাদামশায় ।

বাস্ মানে সব গল্প গেল একদম ফুরিয়ে ।

না, না, সে হতেই পারে না । আমাকে ফাঁকি দিছে । এমন করে তো সব গল্পই  
ফুরোতে পারে ।

ফুরোয় তো বটেই ।

না, সে হবে না কিছুতেই । তার পরে কী হল বলো ।

বল কী—মরার পরেও ?

হাঁ, মরার পরে ।

তুমি গল্পের সাবিত্রী হয়ে উঠলে দেখছি !

না, অমন করে আমাকে ভোলাতে পারবে না, বলো কী হল ।

আচ্ছা, বেশ । লোকে বলে মরার বাড়া গাল নেই । মরার বাড়াও গাল আছে,  
সেই কথাটা বলি তবে । ফৌজের ডাঙ্কার ছিল তাঁবুতে, মন্ত ডাঙ্কার সে । সে যখন  
খবর পেলে মানুষটা মগজে গুলি লেগে মরেছে, বিষম খুশি হয়ে লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে  
উঠল—হুরুরা ।

খুশি হল কেন ।

ও বললে, এইবার মগজ বদল করার পরীক্ষা হবে ।

মগজ বদল হবে কী করে ।

বিজ্ঞানের বাহাদুরি । জু থেকে চেয়ে নিলে একটা বনমানুষ । বের করলে তার  
মগজ । আর, সে'র মাথার খুলি খুলে ফেললে । তার মধ্যে বাঁদরের মগজ পুরে  
দিয়ে খড়ির পলেন্টারা দিয়ে মাথাটা বেঁধে রাখলে পনেরো দিন । খুলি জুড়ে গেল ।  
বিছানা ছেড়ে সে যখন উঠল, তখন সে কথা বিষম কাও । যাকে দেখে তার দিকে  
দাঁত খিচিয়ে কিচিমিচি করে ওঠে । নর্স দিলে দৌড় । ডাঙ্কারসাহেব বজ্রমুঠিতে ওর  
দুই হাত চেপে ধরে জোর গলায় বললেন, স্থির হয়ে বোসো এইখানে । ও হক্কারটা  
বুঝলে, কিন্তু ভাষাটা বুঝলে না । ও চৌকিতে বসতে চায় না, ও লাফ দিয়ে উঠে  
বসতে চায় টেবিলের উপরে । কিন্তু, লাফ দিতে পারে না, ধপ্ করে পড়ে যায়

মেজের উপর। দরজাটা খোলা ছিল, বাইরে ছিল একটা অশ্থগাছ। সবার হাত এড়িয়ে ছুটল সেই গাছের দিকে। ভাবলে, এক লাফে চড়তে পারবে ডালে। বার বার লাফ দিতে থাকে অথচ ডালে পৌছতে পারে না, ধপ্ করে পড়ে যায়। বুঝতেই পারে না, কেন পারছে না। রেগে রেগে ওঠে। ওর লফ দেখে চার দিকে মেডিকেল কলেজের ছেলেরা হো-হো করে হাসতে থাকে। ও দাঁত খিচিয়ে তেড়ে তেড়ে যায়। একজন ফিরিঙ্গি ছেলে গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে কোলে ঝুমাল পেতে রুটি মাখন দিয়ে কলা দিয়ে আরামে খাচ্ছিল, ও হঠাৎ গিয়ে তার কলা ছিনিয়ে নিয়ে দিলে মুখে পুরে; ছেলেটা রেগে ওকে মারতে যায়, বক্সুদের হাসি কিছুতে থামতে চায় না।

মহা ভাবনা পড়ে গেল ওর জিম্মে নেবে কে। কেউ বললে পাঠাও জু'তে, কেউ বললে অনাথ-আশ্রমে। জু'র কর্তা বললে, এখানে মানুষ পোষা আমাদের বরাদ্দে নেই। অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ বললে, এখানে বাঁদর পোষা আমাদের নিয়মে কুলোবে না।

দাদামশায়, থামলে কেন।

দিদিমণি, জগতের সব-কিছুর সব-শেষে আছে থামা।

না, এ কিন্তু এখনো থামে নি। কলা ছিনিয়ে খাওয়া ও তো যে-সে পারে।

আজ্ঞা, কাল হবে, আজ কাজ আছে।

কাল কী হবে বলো-না, অল্প একটুখানি।

জান তো ওর বিয়ের সম্বন্ধ আগেই হয়েছে? ওর যে মগজ বদল হয়ে গেছে সে খবরটা কনের বাড়িতে পৌছয় নি। দিন স্থির, লগ্ন স্থির। বরের পিসে ওকে মস্ত দু ছড়া কলা খাইয়ে ঠাণ্ডা করে বিয়ের জায়গায় নিয়ে গেছেন। তার পরে বিয়ে বাড়িতে যে কাষটা হল তা ভালো করে ফলিয়ে বললে তখন তুমই বলবে, গল্লের মতো গল্ল হয়েছে। এর পরে আর ওকে মেরে ফেলবার দরকার হবে না। সে মরার বাড়া হবে।

সক্ষেবেলায় বসেছি ছাদে। দিব্য দক্ষিণের হাওয়া দিচ্ছে। শুক্রা চতুর্থীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। পুপুদিদি একটি আকন্দের মালা গোথে এনেছে কাঁচপাত্রে, গল্ল বলা শেষ হলে বক্ষিশ মিলবে।

হেনকালে হাঁপাতে হাঁপাতে সে উপস্থিত। বললে, আজ থেকে আমার গল্ল জোগানের কাজে আমি ইস্তফা দিলুম। আমাকে পাতু গেঁজেলের গা পরিয়েছিলে, সেও সহ্য করেছি। শেষকালে বাঁদরের মগজ পুরেছ আমার খুলির মধ্যে, এ সইবে না। এর পরে হয়তো আমাকে চামটিকে কি টিকটিকি কি গুবরে পোকা বানিয়ে দেবে। তোমাদের অসাধ্য কিছুই নেই। আজ আপিসে গিয়ে কেদারা টেনে বসেছি। দেখি ডেক্সের উপরে এক ছড়া মর্তমান কলা। সহজ অবস্থায় কলা আমি ভালোই বাসি, কিন্তু এখন থেকে আমাকে কলা খাওয়া ছেড়েই দিতে হবে। পুপুদিদি, এর পরে তোমার ঐ দাদামশায় আমাকে নিয়ে যদি ব্রহ্মদত্তি কিংবা কক্কাটা বানান, তা

হলে কাগজে না ছাপান যেন। ইতিমধ্যে কন্যাকর্তা এসেছিলেন আমার ঘরে। বিয়েতে আশি ভবি সোনা দেবার কথা পাকা ছিল; একদম নেমে গেছে তেরো ভবিতে। ওরা বুঝেছে, আমার ভাগ্যে এর পরে কনে জোটা দায় হবে। এই তবে বিদায় নিলেম।

## ১০

সঙ্কেবেলায় বসে আছি দক্ষিণ দিকের চাতালে। সামনে কতকগুলো পুরোনো কালের প্রবীণ শিরীষগাছ আকাশের তারা আড়াল করে জোনাকির আলো দিয়ে যেন একশোটা চোখ টিপে ইশারা করছে।

পুপেদি'কে বললেম, বুদ্ধি তোমার অত্যন্ত পেকে উঠছে, তাই মনে করছি আজ তোমাকে শ্বরণ করিয়ে দেব, একদিন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে।

দিদি হেসে উঠে বললে, ঐখানে তোমার জিত। তুমিও এক কালে ছেলেমানুষ ছিলে, সে কথা শ্বরণ করিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে নেই।

আমি নিষ্পাস ফেলে বললুম, বোধ হয় আজকের দিনে কারও হাতেই নেই। আমিও শিশু ছিলুম, তার একমাত্র সাক্ষী আছে ঐ আকাশের তারা। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি তোমার একদিনকার ছেলেমানুষির কথা বলব। তোমার ভালো লাগবে কি না জানি নে, আমার মিষ্টি লাগবে।

আচ্ছা, বলে যাও।

বোধ হচ্ছে, ফালুন মাস পড়েছে। তার আগেই ক'দিন ধরে রামায়ণের গল্প শুনেছিলে সেই চিকচিকে-টাক-ওয়ালা কিশোরী চট্টোর কাছে। আমি সকালবেলায় চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছি, তুমি এতখানি চোখ করে এসে উপস্থিত। আমি বললেম, হয়েছে কী।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আমাকে হরণ করে নিয়েছে।

কী সর্বনাশ ! কে এমন কাজ করলে।

এ প্রশ্নের উত্তরটা তখনো তোমার মাথায় তৈরি হয় নি। বলতে পারতে রাবণ, কিন্তু কথাটা সত্য হত না বলে তোমার সংকোচ ছিল। কেননা, আগের সঙ্কেবেলাতেই রাবণ যুদ্ধে মারা গিয়েছে, তার একটা মৃগ্নও বাকি ছিল না। উপায় না দেখে একটু থম্ভকে গিয়ে তুমি বললে, সে আমাকে বলতে বারণ করেছে।

তবেই তো বিপদ বাধালে। তোমাকে এখন উদ্ধার করা যায় কী করে। কোন দিক দিয়ে নিয়ে গেল।

সে একটা নতুন দেশ।

খন্দেশ নয় তো ?

না।

বুদ্দেলখণ্ড নয় ?

না।

কী রকমের দেশ।

নদী আছে, পাহাড় আছে, বড়ো বড়ো গাছ আছে। খানিকটা আলো, খানিকটা অঙ্ককার।

সে তো অনেক দেশেই আছে। রাক্ষস গোছের কিছু দেখতে পেয়েছিলে ? জিব-বের-করা কাঁটাওয়ালা ?

হঁ হাঁ, সে একবার জিব মেলেই কোথায় মিলিয়ে গেল।

বড়ো তো ফাঁকি দিলে, নইলে ধরতুম তার ঝুঁটি। যাই হোক, একটা কিছুতে করে তো তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল। রথে ?

না।

ঘোড়ায় ?

না।

হাতিতে ?

ফস করে বলে ফেললে, খরগোশে। ঐ জন্তুটার কথা খুব মনে জাগছে ; জন্মাদিনে পেয়েছিলে একজোড়া বাবার কাছ থেকে।

আমি বললেম, তবেই তো চোর কে তা জানা গেল।

চিপিটিপি হেসে তুমি বললে, কে বলো তো।

এ নিঃসন্দেহে চাঁদামামার কাজ।

কী করে জানলে।

তারও যে অনেক কালের বাতিক খরগোশ পোশা।

কোথায় পেয়েছিল খরগোশ।

তোমার বাবা দেয় নি।

তবে কে দিয়েছিল।

ও চুরি করেছিল ব্রহ্মার চিড়িয়াখানায় ঢুকে।

ছিঃ।

ছিঃই তো। তাই ওর গায়ে কলঙ্ক লেগেছে, দাগা দিয়েছেন ব্রহ্মা।

বেশ হয়েছে।

কিন্তু শিশু হল কই। আবার তো তোমাকে চুরি করলে। বোধ হয় তোমার হাত দিয়ে ওর খরগোশকে ফুলকপির পাতা খাওয়াবে।

খুশি হলে তনে। আমার বুদ্ধির পরখ করবার জন্যে বললে, আচ্ছা, বলো দেখি, খরগোশ কী করে আমাকে পিঠে করে নিলে।

নিশ্চয় তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

ঘুমলে কি মানুষ হালকা হয়ে যায়।

হয় বৈকি। তুমি ঘুমিয়ে কখনো ওড় নি ?

হঁ, উড়েছি তো।

তবে আর শক্তা কী। খরগোশ তো সহজ, ইচ্ছে করলে কোলা ব্যাঞ্জের পিঠে চড়িয়ে তোমাকে মাঠময় ব্যাঙ-দৌড় করিয়ে বেড়াতে পারত।

ব্যাঙ ! ছি ছি ! শুনলেও গা কেমন করে ।

না, ভয় নেই—ব্যাঙের উৎপাত নেই চাঁদের দেশে । একটা কথা জিগেস করি, পথের ব্যাঙমাদাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি কি ।

হাঁ, হয়েছিল বৈকি ।

কিরকম ।

বাউগাছের উপর থেকে নীচে এসে থাড়া হয়ে দাঁড়ালো । বললে, পুপেদিদিকে কে চুরি করে নিয়ে যায় । শুনে খরগোশ এমন দৌড় দৌড়ল যে ব্যাঙমাদাদা পারল না তাকে ধরতে । —আচ্ছা, তার পরে ?

কার পরে ।

খরগোশ তো নিয়ে গেল, তার পরে কী হল বলো-না ।

আমি কী বলব । তোমাকেই তো বলতে হবে ।

বাঃ, আমি তো ঘূমিয়ে পড়েছিলুম, কেমন করে জানব ।

সেই তো মুশ্কিল হয়েছে । ঠিকানাই পাছি নে কোথায় তোমাকে নিয়ে গেল । উদ্ধার করতে যাই কোন্ রাস্তায় । একটা কথা জিগেস করি, যখন রাস্তা দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, ঘন্টা শুনতে পাচ্ছিলে কি ।

হাঁ হাঁ, পাচ্ছিলুম ঢঙ ঢঙ ঢঙ ।

তা হলে রাস্তাটা সোজা গেছে ঘন্টাকর্ণদের পাড়া দিয়ে ।

ঘন্টাকর্ণ ! তারা কিরকম ।

তাদের দুটো কান দুটো ঘন্টা । আর, দুটো লেজে দুটো হাতুড়ি । লেজের ঝাপটা দিয়ে একবার এ কানে বাজায় ঢঙ, একবার ও কানে বাজায় ঢঙ । দু জাতের ঘন্টাকর্ণ আছে, একটা আছে হিংস্র, কাঁসরের মতো যখন আওয়াজ দেয় ; আর-একটা গম্ভীর শব্দ ।

তুমি কখনো তার শব্দ শুনতে পাও, দাদামশায় ?

পাই বৈকি । এই কাল রাত্তিরেই বই পড়তে পড়তে হঠাৎ শুনলেম ঘন্টাকর্ণ চলেছেন ঘোর অঙ্ককারের ভিতর দিয়ে । বারোটা বাজালেন যখন তখন আর থাকতে পারলুম না । তাড়াতাড়ি বই ফেলে দিয়ে চমকে উঠে দৌড় দিলুম বিছানায়, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে চোখ বুঁৰো রাইলুম পড়ে ।

খরগোশের সঙ্গে ঘন্টাকর্ণের ভাব আছে ?

খুব ভাব । খরগোশটা তারই আওয়াজের দিকে কান পেতে চলতে থাকে সঙ্গৰ্ষিপাড়ার ছায়াপথ দিয়ে ।

তার পরে ?

তার পরে যখন একটা বাজে, দুটো বাজে, তিনটে বাজে, চারটে বাজে, পাঁচটা বাজে, তখন রাস্তা শেষ হয়ে যায় ।

তার পরে ?

তার পরে পৌছয় তন্দ্রা-তেপান্তরের ও পারে আলোর দেশে । আর দেখা যায় না ।

আমি কি পৌঁচেছি সেই দেশে ।

নিশ্চয় পৌঁচেছ ।

এখন তা হলে আমি খরগোশের পিঠে নেই ?

থাকলে যে তার পিঠ ভেঙে যেত ।

ওঃ, ভুলে গেছি, এখন যে আমি ভারী হয়েছি । তার পরে ?

তার পরে তোমাকে উদ্ধার করা চাই তো ।

নিশ্চয় চাই । কেমন করে করবে ।

সেই কথাটাই তো ভাবছি । রাজপুত্রের শরণ নিতে হল দেখছি ।

কোথায় পাবে ।

ঐ-যে তোমাদের সুকুমার ।

শুনে এক মুহূর্তে তোমার মুখ গঞ্জির হয়ে উঠল । একটু কঠিন সুরেই বললে, তুমি তাকে খুব ভালোবাস । তোমার কাছে সে পড়া বলে নিতে আসে । তাই তো সে আমাকে অঙ্কে এগিয়ে যায় ।

এগিয়ে যাবার অন্য স্বাভাবিক কারণও আছে । সে কথাটা আলোচনা করলুম না ।  
বললুম, তা, তাকে ভালোবাসি আর না বাসি, সেই আছে এক রাজপুত্র ।

কেমন করে জানলে ।

আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে তবে সে ঐ পদটা পাকা করে নিয়েছে ।

তুমি বেশ একটু ভুঁক কুঁচকে বললে, তোমারই সঙ্গে ওর যত বোঝাপড়া !

কী করে বলো, কোনোমতে ও মানতে চায় না—ওর চেয়ে আমি বয়সে খুব  
বেশি বড়ো ।

ওকে তুমি বল রাজপুত্র ! ওকে আমি জটায়ুপাখি বলেও মনে করি নে । ভারি  
তো !

একটু শাস্ত হও, এখন ঘোর বিপদে পড়া গেছে ! তুমি কোথায় তার তো  
ঠিকানাই নেই । তা এবারকার মতো কাজ উদ্ধার করে দিক, আমরা নিষ্পেস ফেলে  
বাঁচি । এর পরে ওকে সেতুবন্ধনের কাঠবিড়ালি বানিয়ে দেব ।

উদ্ধার করতে ও রাজি হবে কেন । ওর একজামিনের পড়া আছে ।

রাজি হবার বারো-আনা আছে । এই পরও শনিবারে ওদের ওখানে গিয়েছিলুম ।  
বেলা তিনিটে । সেই রোদ্দুরে মাকে ফাঁকি দিয়ে ও দেখি ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়ির  
ছাদে । আমি বললুম, ব্যাপার কী ।

বাঁকানি দিয়ে মাথাটা উপরে তুলে বললে, আমি রাজপুত্র ।

তলোয়ার কোথায় ।

দেয়ালির রাত্রে ওদের ছাদে আধপোড়া তুবড়িবাজির একটা কাঠি পড়েছিল,  
কোমরে সেইটেকে ফিরে দিয়ে বেঁধেছে ! আমাকে দেখিয়ে দিলে ।

আমি বললুম, তলোয়ার বটে । কিন্তু, ঘোড়া চাই তো ?

বললে, আস্তাবলে আছে ।

বলে ছাদের কোণ থেকে ওর জ্যাঠামশায়ের বহুক্লে বেহায়া একটা ছেঁড়া ছাতা  
টেনে নিয়ে এল। দুই পায়ের মধ্যে তাকে চেপে ধরে হ্যাট্হ্যাট্ আওয়াজ করতে  
করতে ছাদময় একবার দৌড় করিয়ে আনলে। আমি বললুম, ঘোড়া বটে !

এর পক্ষীরাজের চেহারা দেখতে যাও ?

চাই বৈকি ।

ছাতাটা ফস্ক করে খুলে দিলে। ছাতার পেটের মধ্যে ঘোড়ার খাবার দানা ছিল,  
সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল ছাদে।

আমি বললুম, আশ্চর্য ! কী আশ্চর্য ! এ জন্মে পক্ষীরাজ দেখব, কোনোদিন এমন  
আশাই করি নি ।

এইবার আমি উড়ছি, দাদা। চোখ বুজে থাকো, তা হলে বুঝতে পারবে, আমি  
ঐ মেঘের কাছে গিয়ে ঠেকেছি। একেবারে অঙ্ককার !

চোখ বোজবার দরকার করে না আমার। স্পষ্টই জানতে পারছি, তুমি খুব উড়ছ,  
পক্ষীরাজের ডানা মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

আচ্ছা, দাদামশায়, আমার ঘোড়াটার একটা নাম দিয়ে দাও তো ।

আমি বললুম, ছত্রপতি ।

নামটা পছন্দ হল। রাজপুত্রের ছাতার পিঠ চাপড়িয়ে বললে, ছত্রপতি !

নিজেই ঘোড়ার হয়ে তার জবাব দিলে, আজ্জে !

আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি ভাবছ, আমি বললুম। আজ্জে, না নয়,  
ঘোড়া বললে ।

সে কথাও কি আমাকে বলতে হবে। আমি কি এত কালা ।

রাজপুত্রের বললে, ছত্রপতি, আর ভালো লাগছে না চুপচাপ পড়ে থাকতে ।

তারই মুখ থেকে উত্তর পাওয়া গেল, কী হুকুম বলো ।

তেপাস্তরের মাঠ পেরোনো চাই ।

রাজি আছি ।

আমি তো আর থাকতে পারি নে, কাজ আছে ; রাসে ভঙ্গ দিয়ে বলতে হল,  
রাজপুত্রের, কিন্তু তোমার মাট্টার যে বসে আছে। দেখে এলুম, তার মেজাজটা চট্টা ।

শুনে রাজপুত্রের মনটা ছট্টফ্ট্ট করে উঠল। ছাতাটাকে থাব্বড়া মেরে বললে,  
এখনি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পার না কি ।

বেচারা ঘোড়ার হয়ে আমাকেই বলতে হল, রাস্তির না হলে ও তো উড়তে পারে  
না। দিনেরা বেলায় ও ন্যাকামি করে ছাতা সাজে ; তুমি ঘুমোলেই ও ডানা  
মেলবে। এখনকার মতো পড়তে যাও, নইলে বিপদ বাধবে ।

সুকুমার মাট্টারের কাছে পড়তে গেল। যাবার সময় আমাকে বললে, কিন্তু সব  
কথা এখনো শেষ হয় নি ।

আমি বললুম, কথা কি কথনোই শেষ হতে পারে। শেষ হলে মজা কিসের ।

পাঁচটার সময় পড়া শেষ হয়ে যাবে। দাদু, তখন তুমি এসো ।

আমি বললুম, থর্ড নস্বর ঝীড়রের পরে মুখ বদলাবার জন্মে পয়লা নস্বরের গল্প  
চাই। নিশ্চয় আসব ।

মাটারমশায়কে দেখলুম গলির মোড়ে, ট্রামের প্রত্যাশায় দাঢ়িয়ে আছেন। আমি যখন গেলুম সুকুমারদের বাড়ির ছাদে, তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। সামনের তেতালা বাড়িটাতে পড়তি বেলাকার রোদনুর আড়াল করছে। গিয়ে দেখি, চিলেকোঠার সামনে সুকুমার চূপ করে বসে। ছাদের কোণটাতে বিশ্রাম করছে তার ছত্রপতি। পিছন দিকের সিডি দিয়ে যখন উপরে উঠে এলুম, তখনো আমার পায়ের শব্দ ওর কানে পৌছল না। খানিক বাদে ডাক দিলুম, রাজপুত্র !

ওর যেন স্বপ্ন গেল ভেঙে, চমকে উঠল ।

জিগেস করলুম, বসে কী ভাবছ ভাই ।

ও বললে, শুকসারীর কথা শনছি ।

শুকসারীর দেখা পেলে কোথায় ।

ঐ যে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে বন। ডালে ডালে ফুল ছড়াছড়ি—হল্দে, লাল, নীল, যেন সন্ধ্যাবেলাকার মেঘের মতো। তারই ভিতর থেকে শুকসারীর গলা শোনা যাচ্ছে ।

তাদের দেখতে পাচ্ছ তো ?

হঁ, পাচ্ছি। খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা ঢাকা ।

তা, কী বলছে ওরা ।

এইবার মুশকিলে পড়ল আমাদের রাজপুত্র। খানিকটা আমৃতা আমৃতা করে বললে, তুমিই বলো-না, দাদু, ওরা কী বলছে ।

ঐ তো পষ্ট শোনা যাচ্ছে, ওরা তর্ক করছে ।

কিসের তর্ক ।

শুক বলছে, আমি এবার উড়ব। সারী বলছে, কোথায় উড়বে। শুক বলছে, যেখানে কোথাও বলে কিছুই নেই, কেবল ওড়াই আছে; তুমিও চলো আমার সঙ্গে ।

সারী বললে, আমি ভালোবাসি এই বনকে; এখানে ডালে জড়িয়ে উঠেছে ঝুমকো লতা, এখানে ফল আছে বটের, এখানে শিমুলের ফুল যখন ফোটে তখন কাকের সঙ্গে ঝগড়া করে ভালো লাগে তার মধ্য থেকে; এখানে রাণিরে জোনাকিতে ছেয়ে যায় ঐ কাম্রাঙ্গার ঝোপ, আর বাদলায় বৃষ্টি যখন ঝরতে থাকে তখন দুলতে থাকে নারকেলের ডাল ঝর্ঝর শব্দ করে—আর, তোমার আকাশে কীই বা আছে। শুক বললে, আমার আকাশে আছে সকাল, আছে সন্ধে, আছে মাঝরাত্রের তারা, আছে দক্ষিণ হাত্তার যাওয়া আসা, আর আছে কিছুই না—কিছুই না—কিছুই না ।

সুকুমার জিগেস করলে, কিছুই-না থাকে কী করে, দাদু ।

সেই কথা তো এইমাত্র সারী জিগেস করলে শুককে ।

শুক কী বলছে ।

শুক বলছে, আকাশের সব চেয়ে অমূল্যধন ঐ কিছুই-না। ঐ কিছুই-না আমাকে ডাক দেয় ভোরের বেলায়। ওরই জন্যে আমার মন কেমন করে যখন বনের মধ্যে

বাসা বাঁধি । ঐ কিছুই-না কেবল খেলা করে রঙের খেলা নীল আঙ্গিনায় ; মাঘের শেষে আমের বোলের নিমজ্জন-চিঠিশুলি ঐ কিছুই-না'র ওড়না বেয়ে হু হু করে উড়ে আসে, মৌমাছিরা খবর পেয়ে চক্ষণ হয়ে ওঠে ।

উৎসাহে সুকুমার লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ; বললে, আমার পক্ষীরাজকে ঐ কিছুই-না'র রান্তা দিয়েই তো চালাতে হবে ।

নিশ্চয়ই । পুপুদিদির হরণব্যাপারটা আগাগোড়াই ঐ কিছুই-না'র তেপান্তরে ।

সুকুমার হাত মুঠো করে বললে, সেইখানে দিয়েই আমি তাকে ফিরিয়ে আনব, নিশ্চয় আনব ।

বুঝতে পারছ তো, পুপুদি ? — রাজপুত্র তৈরিই আছে, তোমাকে উদ্ধার করতে দেরি হবে না । এতক্ষণে ছাদের উপরে তার ঘোড়াটা একবার পাখা খুলছে, আবার বন্ধ করছে ।

তুমি খুব বাজিয়ে উঠে বললে, দরকার নেই ।

বল কী, এত বড়ো বিপদ থেকে তোমার উদ্ধার হল না, আর আমরা নিশ্চিন্ত থাকব ?

হয়ে গেছে উদ্ধার ।

কখন হল ।

শুনলে না ? একটু আগেই ঘট্টাকর্ণ এসে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল ।

কখন ঘটল এটা ।

ঐ-যে, ঢঙ ঢঙ করে দিলে নটা বাজিয়ে ।

কোন্ জাতের ঘট্টাকর্ণ ।

হিংস্র জাতের । এখন ইঙ্গুলে যাবার সময় এগিয়ে আসছে । বিচ্ছিরি লেগেছে আওয়াজটা ।

গল্পটা অকালে গেল ভেঙে । দুস্রা রাজপুত্রের খুঁজে বের করা উচিত ছিল । এ তো অকের হরণ পূরণ নয় — ওরকম ঝ্লাস-পেরোনো ছেলে তেপান্তর পেরোবার স্পর্ধা করবে, এ তুমি কিছুতেই সইতে পারলে না । আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম, লাখখানেক বিঁঁঁি পোকা আমদানি করব আমাদের পানাপুকুরের ধারের স্যাওড়াবন থেকে । তারা চাঁদামার নিদমহলের পশ্চিম দিকের খিড়কির দরজা দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে চুকে সবাই মিলে তোমার বিছানার চাদরটাকে দিত টান সুড়সুড় করে । তার উপরে তোমাকে নামিয়ে আনত । তাদের বিঁঁঁি বিঁঁঁি শব্দে চাঁদনি-চকে বিমিয়ে পড়ত চাঁদের পাহারাওয়ালা । সমস্ত রান্তায় বায়না দিয়ে রেখেছিলুম জোনাকির আলোধারীর দলকে । বাঁশতলার বাঁকা গলি দিয়ে তোমাকে নিয়ে চলত, খস্ খস্ শব্দ করত ঝরে-পড়া শুকনো পাতাগুলো । ঝরু ঝরু করতে থাকত নারকেলের ডাল । গঙ্কে-ভূর-ভূর সর্পেখ্তের আল বেয়ে যখন এসে পড়তে তির্পুরির ঘাটে তখন ধামা-ভরা বিন্নিধানের খই নিয়ে ডাক দিতুম গঙ্গামায়ের ঝঁড়তোলা মকরকে, তোমাকে চড়িয়ে দিতেম তার পিঠে । ভাইনে বায়ে তার

লেজের ঠেলায় জল উঠত কল্কলিয়ে। তিনপহর রাতে শেয়ালগুলো ডাঙায় দাঢ়িয়ে জিগেস করত, ক্যা হয়া, ক্যা হয়া ! আমি বলতুম, রও, কুছ নেই হয়া। এই যাত্রাপথে পেঁচা আর বাদুড়ের সঙ্গেও কিছু আপসে বন্দোবস্তের কথা ছিল। তাদের কাজে লাগাতুম। ভোর সাড়ে চারটের সময় শুকতারা নেমে পড়ত পশ্চিম-আকাশে, পূর্ব-আকাশে আলোর রেখায় দেখা দিত সকালবেলার তর্জনীতে সোনার আংটি থেকে ঠিক্রে-পড়া সংকেত। সদ্য জেগে-ওঠা কাক তেঁতুলের ডালে বসে অস্ত্র হয়ে প্রশ্ন করত, কা-কা ? আমি যেমনি বলতুম ‘কিছু না’, অমনি দেখতে দেখতে সব যেত মিলিয়ে—তুমি জেগে উঠতে তোমার বিছানায়।

পুপুদিনি একটুখানি হেসে বললে, এই-যে আমার ছেলেমানুষির কাহিনীটি শোনা গেল—এটি এত ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে তোমার কী আনন্দ হল। আমার হিংসুকে স্বভাব ছিল, এইটে জানাবার জন্যে তোমার এতই উৎসাহ ! আর, আমাদের বিলিতিআমড়া গাছের পাকা আমড়াগুলো পেড়ে নিয়ে সুকুমারদাকে লুকিয়ে দিয়ে আসতুম, আমড়া সে ভালোবাসত বলে ; চুরির অপবাদটা হত আমার, আর ভোগ করত সে —সে কথাটা চেপে গেছে। সুকুমারদা নাহয় অঙ্গই ভালো কষত, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে একদিন সে ‘অবধান’ কথাটার মানে ভেবে পাছিল না, আমি স্নেটে লিখে আড় করে ধরে তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলুম—এ কথাগুলো বুঝি তোমার গঁজের মধ্যে পড়ে না ?

আমি বললুম, আমার খুশির কারণ এ নয় যে, মনের জ্বালায় তুমি সুকুমারদার ঘৌবরাজ্য মানতে চাও নি। তার উপরে তোমার হিংসের কারণ ছিল আমার উপর তোমার অনুরাগবশত —আমার আনন্দের স্মৃতি রয়েছে ঐখানেই।

আচ্ছা, তোমার অহংকার নিয়ে তুমি থাকো। একটা কথা তোমাকে জিগেস করি, সেই-যে তোমার নামহারা বানানো মানুষটি যাকে বলতে সে, তার হল কী।

আমি বললেম, তার বয়স বেড়ে গেছে।

ভালোই তো।

সে এখন চিন্তা করে, মাথায় তার দুঃসমস্যার ভিমরূপে চাক বেঁধেছে, তর্কে তার সঙ্গে পারবার জো নেই।

দেখছি আমারই প্যারাল্যাল লাইনেই চলেছে।

তা হতে পারে, কিন্তু গঁজের এলেকা ছাড়িয়ে গেছে। থেকে থেকে সে হাত মুঠো করে ঘোকে ঘোকে বলে উঠছে, শক্ত হতে হবে।

বলুক-না। শক্ত ছাঁদেই গঁজ জয়ুক-না। চুমুক দিয়ে খাওয়া নাই হল, চিবিয়ে খাওয়া চলবে তো। হয়তো আমার পছন্দ হবে।

পাছে আক্ষেল দাঁতের অভাবে তাকে কায়দা করতে না পার, এই ভয়ে অনেকদিন তাকে চুপ করিয়ে রেখেছি।

ইস ! তোমার ভাবনা দেখে হাসি পায়। তুমি ঠাউরে রেখেছ, আমার যথেষ্ট বয়স হয় নি।

সর্বনাশ ! এতবড়ো নিন্দে অতিবড়ো শক্তি করতে পারবে না ।

তা হলে ডাকো-না তাকে তোমার আসরে, তার বর্তমান মেজাজটা বুঝে নিই ।  
তাই সই ।

১২

ঝগড় কে বললেম, কোথায় আছে সেই বাঁদরটা । যেখানে পাও বোলাও উস্কো ।

এল সে তার কাঁটাওয়ালা মোটা গোলাপের গুঁড়ির লাঠিখানা ঠক্ঠক্ করতে করতে । মালকোঁচা-মারা ধূতি, চান্দরখানা জড়ানো কোমরে, হাঁটু পর্যন্ত কালো পশমের মোটা মোজা, লাল ডেরা-কাটা জামার উপর হাতাহীন বিলিতি ওয়েষ্টকোট সবুজ বনাতের, সাদা রোয়াওয়ালা রাশিয়ান টুপি মাথায় — পুরোনো মালের দোকান থেকে কেনা — বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে ন্যাকড়া জড়ানো — কোনো একটা সদ্য অপঘাতের প্রত্যক্ষ সাক্ষী । কড়া চামড়ার জুতোর মস্মসানি শোনা যায় গলির মোড় থেকে । ঘন ভুক্কন্দুটোর নীচে চোখদুটো যেন মন্ত্রে-থেমে-যাওয়া দুটো বুলেটের মতো ।

বললে, হয়েছে কী । শুকনো মটর চিবোছিলুম দাঁত শক্ত করবার জন্যে, ছাড়ল না তোমার ঝগড় । বললে, বাবুর চোখদুটো ভীষণ লাল হয়েছে, বোধ হয় ডাক্তার ডাকতে হবে । শুনেই তাড়াতাড়ি গয়লাবাড়ি থেকে এক-ভাড় চোনা এনেছি মোচার খোলায় করে ফেঁটা ফেঁটা ঢালতে থাকো, সাফ হয়ে যাবে চোখ ।

আমি বললুম, যতক্ষণ তুমি আছ আমার ত্রিসীমানায়, আমার চোখের লাল কিছুতেই ঘুচবে না । ভোরবেলাতেই তোমাদের পাড়ার যত মাতবর আমার দরজায় ধন্না দিয়ে পড়েছে ।

বিচলিত হ্বার কী কারণ ।

তুমি থাকতে দোসরা কারণের দরকার নেই । খবর পাওয়া গেল, তোমার চেলা কংসারি মুলি, যার মুখ দেখলে অ্যাত্তা, তোমার ছাদে বসে একখানা রামশিঙে তুলে ধরে ফুঁক দিচ্ছে ; আর গাঁজার লোভ দেখিয়ে জড়ো করেছে যত ফাটা-গলার ফৌজ, তারা প্রাণপণে চেঁচানি অভ্যেস করছে । ভদ্রলোকেরা বলছে, হয় তারা ছাড়বে পাড়া নয় তোমাকে ছাড়বে ।

মহা উৎসাহে লাফ দিয়ে উঠে সে চীৎকারস্বরে বললে, প্রমাণ হয়েছে !

কিসের প্রমাণ ।

বেসুরের দুঃসহ জোর । একেবারে ডাইনামাইট । বদ্সুরের ভিতর থেকে চাড়া পেয়েছে দুর্জয় বেগ, উড়ে গিয়েছে পাড়ার ঘুম, দৌড় দিয়েছে পাড়ার শান্তি, পালাই-পালাই রব উঠেছে চার দিকে । প্রচণ্ড আসুরিক শক্তি । এর ধাক্কা একদিন টের পেয়েছিলেন স্বর্গের ভালো-মানুষরা । বসে বসে আধ চোখ বুজে অমৃত খাচ্ছিলেন । গঞ্জব ওতাদেরা তম্বুরা ঘাড়ে অতি নির্খুত স্বরে তান লাগাচ্ছিলেন পরজ-বসন্তে, আর নৃপুরঝংকারিগী অঙ্গরীরা নিপুণ তালে তেহাই দিয়ে নৃত্য জয়িয়েছিলেন । এ দিকে মৃত্যুবরণ নীল অঙ্ককারে তিন যুগ ধরে অসুরের দল

ରସାତଳ-କୋଠାୟ ତିମିମାଛେର ଲେଜେର ଝାପ୍ଟାୟ ବେଲୟେ ବେସୁର ସାଧନା କରଛିଲ । ଅବଶେଷେ ଏକଦିନ ଶନିତେ କଲିତେ ମିଳେ ଦିଲେ ସିଗ୍ନାଲ, ଏସେ ପଡ଼ିଲ ବେସୁର-ସଂଗତେର କାଳାପାହାଡ଼େର ଦଲ ସୁରୋଯାଲାଦେର ସମେ-ନାଡ଼ା-ଦେଓୟା ଘାଡ଼େ ହେକାର କ୍ରେଙ୍କାର ଝନ୍ବନ୍କାର ଧ୍ରୁମକାର ଦୁଡ଼ ମକାର ଗଡ଼-ଗଡ଼ୁଗଡ଼ୁକାର ଶଦେ । ତୀଏ ବେସୁରେର ତେଲେବେଣୁଣି ଜୁଲନେ ପିତାମହ-ପିତାମହ ଡାକ ଛେଡ଼େ ତାଁରା ଲୁକୋଲେନ ବ୍ରକ୍ଷାଗୀର ଅନ୍ଦରମହଲେ । ତୋମାକେ ବଲବ କୀ ଆର, ତୋମାର ତୋ ଜାନା ଆଛେ ସକଳ ଶାନ୍ତି ।

ଜାନା ଯେ ନେଇ ଆଜ ତା ବୋଝା ଗେଲ ତୋମାର କଥା ଶୁଣେ ।

ଦାଦା, ତୋମାଦେର ବଈ-ପଡ଼ା ବିଦ୍ୟେ, ଆସଲ ଖବର କାନେ ପୌଛୟ ନା । ଆମି ଘୁରେ ବେଡ଼ାଇ ଶ୍ରାଣେ ମଶାନେ, ଗୃଚ୍ଛତ୍ତ୍ଵ ପାଇ ସାଧକଦେର କାହିଁ ଥେକେ । ଆମାର ଉତ୍କଟଦନ୍ତୀ ଗୁରୁର ମୁଖକନ୍ଦର ଥେକେ ବେସୁରତ୍ତ୍ଵ ଅଞ୍ଚ କିଛୁ ଜେନେଛିଲୁମ, ତାଁର ପାଯେ ଅନେକଦିନ ଭେରେଣ୍ଟାର ବିରେଚକ ତୈଲ ମର୍ଦନ କରେ ।

ବେସୁରତ୍ତ୍ଵ ଆୟନ୍ତ କରତେ ତୋମାର ବିଲସି ହୟ ନି ସେଟୋ ବୁଝିତେ ପାରଛି । ଅଧିକାରଭେଦ ମାନି ଆମି ।

ଦାଦା, ଐ ତୋ ଆମାର ଗର୍ବେର କଥା । ପୁରୁଷ ହୟେ ଜନ୍ମାଲେଇ ପୁରୁଷ ହୟ ନା, ପୁରୁଷତାର ପ୍ରତିଭା ଥାକା ଚାଇ । ଏକଦିନ ଆମାର ଗୁରୁର ଅତି ଅଗ୍ରବ ବିଶ୍ରୀମୁଖ ଥେକେ—

ଗୁରୁମୁଖକେ ଆମରା ବଲେ ଥାକି ଶ୍ରୀମୁଖ, ତୁମି ବଲଲେ ବିଶ୍ରୀମୁଖ !

ଗୁରୁର ଆଦେଶ । ତିନି ବଲେନ, ଶ୍ରୀମୁଖଟା ନିତାନ୍ତ ମେଯେଲି, ବିଶ୍ରୀ ମୁଖେଇ ପୁରୁଷେର ଗୌରବ । ଓର ଜୋରଟା ଆକର୍ଷଣେର ନୟ, ବିପ୍ରକର୍ଷଣେର । ମାନ କି ନା ।

ମାନତେ ଯେ ହତଭାଗ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୟ, ସେ ମାନେ ବୈକି ।

ମଧୁର ରସେ ତୋମାର ମୌତାତ ପାକା ହୟେ ଗେଛେ ଦାଦା, କଠୋର ସତ୍ୟ ମୁଖେ ରୋଚେ ନା, ଭାଙ୍ଗିତେ ହବେ ତୋମାଦେର ଦୁର୍ବଲତା—ମିଠେ ସୁରେ ଯାର ନାମ ଦିଯେଇ ସୁରୁଚି, ବିଶ୍ରୀକେ ସହ୍ୟ କରବାର ଶକ୍ତି ନେଇ ଯାର ।

ଦୁର୍ବଲତା ଭାଙ୍ଗା ସବଲତା ଭାଙ୍ଗାର ଚେଯେ ଅନେକ ଶକ୍ତି । ବିଶ୍ରୀତତ୍ତ୍ଵର ଗୁରୁବାକ୍ୟ ଶୋନାତେ ଚାହିଁଲେ, ଶୁଣିଯେ ଦାଓ ।

ଏକେବାରେ ଆଦିପର୍ବ ଥେକେ ଗୁରୁ ଆରଣ୍ଟ କରଲେନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ । ବଲେନ, ମାନବ ସୃଷ୍ଟିର ଶୁରୁତେ ଚତୁର୍ମୁଖ ତାଁର ସାମନେର ଦିକେର ଦାଢ଼ି-କାମାନୋ ଦୁଟୋ ମୁଖ ଥେକେ ମିହି ସୁର ବେର କରଲେନ । କୋମଳ ରେଖାର ଥେକେ ମଧୁର ଧାରାର ମସ୍ତନ ମିଡ଼ର ଉପର ଦିଯେ ପିଛଲେ ଗଡ଼ିଯେ ଏଲ କୋମଳ ନିଖାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ସେଇ ସୁକୁମାର ଦ୍ୱରଲହରୀ ପ୍ରତ୍ୟମେର ଅରୁଣବର୍ଣ୍ଣ ମେଘର ଥେକେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମେର ଦୋଳା ଲାଗାଲେ ଅତିଶ୍ୟ ମିଠେ ହାଓୟାଯ । ତାରଇ ମୃଦୁ ହିଲ୍ଲୋଲେ ଦୋଳାଯିତ ନୃତ୍ୟଚଛନ୍ଦେ ରୂପ ନିଯେ ଦେଖା ଦିଲ ନାରୀ । ସ୍ଵର୍ଗେ ଶୀଘ୍ର ବାଜାତେ ଲାଗଲେନ ବର୍ଣ୍ଣଦେବେର ଘରନୀ ।

ବର୍ଣ୍ଣଦେବେର ଘରନୀ କେନ ।

ତିନି ଯେ ଜଲଦେବୀ । ନାରୀ ଜାତଟା ବିଶ୍ଵଦ ଜଲୀଯ ; ତାର କାଠିନ୍ୟ ନେଇ, ଚକ୍ରଲ୍ୟ ଆଛେ, ଚକ୍ରଲ କରେଓ । ଭ୍ରବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଡ଼ାତେଇ ଜଲରାଶି । ସେଇ ଜଲେ ପାନକୌଡ଼ିର ପିଠେ ଚଢ଼େ ଯତ ସବ ନାରୀ ଭେବେ ବେଡ଼ାତେ ଲାଗଲ ସାରିଗାନ ଗାଇତେ ଗାଇତେ ।

ଅତି ଚମତ୍କାର । କିନ୍ତୁ, ତଥନ ପାନକୌଡ଼ିର ସୃଷ୍ଟି ହୟେଛେ ନା କି ।

হয়েছে বৈকি । পাখিদের গলাতেই প্রথম সূর বাঁধা চলছিল । দুর্বলতার সঙ্গেই মাধুর্যের অনবচিন্ন ঘোগ, এই তত্ত্বটির প্রথম পরীক্ষা হল ঐ দুর্বল জীবগুলির ডানায় এবং কঠে । একটা কথা বলি, রাগ করবে না তো ?

না রাগতে চেষ্টা করব ।

যুগান্তের পিতামহ যখন মানবসমাজে দুর্বলতাকেই মহিমাভিত করবার কাজে কবিসৃষ্টি করেছিলেন, তখন সেই সৃষ্টির ছাঁচ পেয়েছিলেন এই পাখির থেকেই । সেদিন একটা সাহিত্যসম্মিলন গোছের ব্যাপার হল তাঁর সভামণ্ডপে ; সভাপতিরূপে কবিদের আহ্বান করে বলে দিলেন, তোমরা মনে মনে উড়তে থাকো শুন্যে, আর ছন্দে ছন্দে গান করো বিনা কারণে, যা-কিছু কঠিন তা তরল হয়ে যাক, যা-কিছু বলিষ্ঠ তা এলিয়ে পড়ে যাক আর্দ্ধ হয়ে । —কবিসম্মাট, আজ পর্যন্ত তুমি তাঁর কথা রক্ষা করে চলেছ ।

চলতেই হবে যতদিন না ছাঁচ বদল হয় ।

আধুনিক যুগ শুকিয়ে শক্ত হয়ে আসছে, মোমের ছাঁচ আর মিলবেই না । এখন সেদিন নেই যখন নারীদেবতার জলের বাসাটি দোল খেদ পন্থে, যখন মনোহর দুর্বলতায় পৃথিবী ছিল অতলে নিমগ্ন ।

সৃষ্টি ঐ মোলায়েমের ছন্দে এসেই থামল না কেন ।

গোটা কয়েক যুগ যেতে না যেতেই ধরণীদেবী আর্ত বাক্যে আবেদনপত্র পাঠালেন চতুর্মুখের দরবারে । বললেন, ললনানের এই লকারবহুল লালিত্য আর তো সহ্য হয় না । স্বয়ং নারীরাই করুণ ক঳োলে ঘোষণা করতে লাগল, ভালো লাগছে না । উর্ধ্বলোক থেকে প্রশ্ন এল, কী ভালো লাগছে না । সুকুমারীরা বললে, বলতে পারি নে । —কী চাই । —কী চাই তারও সন্ধান পাচ্ছ নে ।

ওদের মধ্যে পাড়াকুঁদুলিরও কি অভিব্যক্তি হয় নি । আগাগোড়াই কি সুবচনীর পালা ।

কৌন্দলের উপযুক্ত উপলক্ষ্টি না থাকাতেই বাক্যবাণের টৎকার নিমগ্ন রইল অতলে, ঝাঁটার কাঠির অঙ্কুর স্থান পেল না অকুলে ।

এত বড়ো দুঃখের সংবাদে চতুর্মুখ লজ্জিত হলেন বোধ করি ?

লজ্জা বলে লজ্জা ! চার মুণ্ড হেঁট হয়ে গেল । স্তুষ্টি হয়ে বসে রইলেন রাজহৎসের কোটি-যোজন-জোড়া ডানাদুটোর 'পরে পুরো একটা ব্রহ্মযুগ । এ দিকে আদিকালের লোকবিশ্বত সাধী পরম-পানকৌড়ীনী, শুভ্রতায় যিনি ব্রহ্মার পরমহৎসের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধনায় হাজার বার করে জলে ডুব দিয়ে দিয়ে চপ্পলর্ষণে পালকগুলোকে ঢঁটাসার করে ফেলছিলেন, তিনি পর্যন্ত বলে উঠলেন, নির্মলতাই যেখানে নিরতিশয় সেখানে শুচিতার সর্পধান সুখটাই বাদ পড়ে, যথা, পরকে খোঁটা দেওয়া ; শুন্দসন্তু হবার মজাটাই থাকে না । প্রার্থনা করলেন, হে দেব, মলিনতা চাই, ভূরিপরিমাণে, অনতিবিলম্বে এবং প্রবল বেগে । বিধি তখন অস্ত্রিল হয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, ভূল হয়েছে সংশোধন করতে হবে । বাসুরে, কী গলা । মনে হল মহাদেবের মহাবৃষ্টিটার ঘাড়ে এসে পড়েছে মহাদেবীর

মহাসিংহটা—অতিলৌকিক সিংহনাদে আর বৃষ্টগর্জনে মিলে দুঃলোকের নীলমণি মণিত ভিতরটা দিলে ফাটল ধরিয়ে। মজার আশায় বিশ্বলোক থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন নারদ। তাঁর চেকির পিঠ খাবড়িয়ে বললেন, বাবা চেকি, শুনে রাখো ভাবিলোকের বিশ্ব-বেসুরের আদিমন্ত্র, যথাকালে ঘর ভাঙ্গাবার কাজে লাগবে। স্ফুর্ক ব্রহ্মার চার গলার ট্রাকতান আওয়াজের সঙ্গে যোগ দিলে দিঙ্নাগেরা গুঁড় তুলে, শব্দের ধাক্কায় দিগঙ্গনাদের বেণীবন্ধ খুলে দিয়ে আকাশ আগাগোড়া ঠাসা হয়ে গেল এলোচুলে—বোধ হল কালো-পাল-তোলা ব্যোমতরী ছুটল কালপুরুষের শৃশানঘাটে।

হাজার হোক, সৃষ্টিকর্তা পুরুষ তো বটে।

পৌরুষ চাপা রাইল না। তাঁর পিছনের দাঢ়িওয়ালা দুই মুখের চার নাসাফলক উঠল ফুলে, হাঁফিয়ে উঠা বিরাট হাপরের মতো। চার নাসারজ্ঞ থেকে একসঙ্গে ঝড় ছুটল আকাশের চার দিককে তাড়না করে। ব্রহ্মাও সেই প্রথম ছাড়া পেল দুর্জয়শক্তিমান বেসুরপ্রবাহ—গো-গোঁ-গাঁ-গাঁ হুড়মুড় দুর্দাঁড় গড়ুগড় ঘড়ুঘড় ঘড়াঙ। গন্ধর্বেরা কাঁধে তম্ভুরা নিয়ে দলে দলে দৌড় দিল ইন্দ্রলোকের খিড়কির আঙ্গিনায়, যেখানে শচীদেবী স্নানান্তে মন্দারকুঞ্জছায়ায় পারিজাতকেশরের ধূপধূমে চুল শুকোতে যান। ধরণীদেবী ভয়ে কম্পারিতা ; ইষ্টমন্ত্র জপতে জপতে ভাবতে লাগলেন, ভুল করেছি বা। সেই বেসুরো ঝড়ের উল্টোপাল্টা ধাক্কায় কামানের মুখের তণ্ড গোলার মতো ধক্কধক্ শব্দে বেরিয়ে পড়তে লাগল পুরুষ—কী দানা, চুপচাপ যে। কথাশুলো মনে লাগছে তো?

লাগছে বৈকি। একেবারে দুম্দাম শব্দে লাগছে।

সৃষ্টির সর্বপ্রধান পর্বে বেসুরেরই রাজতু, এ কথাটা বুঝতে পেরেছ তো ?  
বুঁধিয়ে দাও-না।

তরল জলের কোমল একাধিপত্যকে টুঁ মেরে, গুঁতো মেরে, লাথি মেরে, কিল মেরে, ঘুঁঘো মেরে, ধাক্কা মেরে, উঠে পড়তে লাগল ডাঙা তার পাথুরে নেড়া মুগ্ধগুলো তুলে। ভূলোকের ইতিহাসে এইটেকেই সব চেয়ে বড়ো পর্ব বলে মান কি না।

মানি বৈকি।

এত কাল পরে বিধাতার পৌরুষ প্রকাশ পেল ডাঙ্গায় ; পুরুষের স্বাক্ষর পড়ল সৃষ্টির শক্ত জরিতে। গোড়াতেই কী বীভৎস পালোয়ানি। কখনো আশুনে পোড়ানো, কখনো বরফে জমানো, কখনো ভূমিকম্পের জবদন্তির যোগে মাটিকে হাঁ করিয়ে কবিরাজি বড়ির মতো পাহাড়গুলোকে গিলিয়ে খাওয়ানো—এর মধ্যে মেয়েলি কিছু নেই, সে কথা মান কি না।

মানি বৈকি।

জলে ওঠে কলধনি, হাওয়ায় বাঁশি বাজে সৌ-সৌ—কিন্তু বিচলিত ডাঙা যখন ডাক পাড়তে থাকে তখন ভরতের সংগীত শান্ত্রটাকে পিণ্ডি পাকিয়ে দেয়। তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে, কথাটা ভালো লাগছে না। কী ভাবছ বলেই ফেলো-না।

আমি ভাবছি, আর্ট মাত্রেরই একটা পুরাগত বনেদ আছে যাকে বলে ট্র্যাডিশন। তোমার বেসুরধনির আর্টকে বনেদি বলে প্রমাণ করতে পার কি।

খুব পারি। তোমাদের সুরের মূল ট্র্যাডিশন মেয়ে-দেবতার বাদ্যযন্ত্রে। যদি বেসুরের উভ্রে খুঁজতে চাও তবে সিধে চলে যাও পৌরাণিক মেয়েমহল পেরিয়ে পুরুষদেবতা জটাধারীর দরজায়। কৈলাসে বীণাযন্ত্র বে-আইনি, উর্বশী সেখানে নাচের বায়না নেয় নি। যিনি সেখানে ভীষণ বেতালে তাওবন্ত্য করেন তাঁর নন্দীভূঁসী ফুঁকতে থাকে শিঙে, তিনি বাজান ববম্বম গালবাদ্য, আর কড়াকড় কড়াকড় ডমরু। ধন্সে পড়তে থাকে কৈলাসের পিণ্ড পিণ্ড পাথর। মহাবেসুরের আদি-উৎপন্নিটা স্পষ্ট হয়েছে তো?

হয়েছে।

মনে রেখো সুরের হার, বেসুরের জিত, এই নিয়েই পালা রচনা হয়েছে পুরাণে দক্ষযজ্ঞের। একদা যজ্ঞসভায় জমা হয়েছিলেন দেবতারা—দুই কানে কুণ্ডল, দুই বাহুতে অঙ্গদ, গলায় মণিমাল্য। কী বাহার! ঋষিমুনিদের দেহ থেকে আলো পড়ছিল ঠিকৰিয়ে। কঠ থেকে উঠছিল অনিন্দ্যসুন্দর সুরে সুমধুর সামগান, ত্রিভুবনের শরীর রোমাঞ্চিত। হঠাৎ দুড়দাঢ় করে এসে পড়ল বিশ্রীবিরূপের বেসুরি দল, শুচিসুন্দরের সৌকুমার্য মুহূর্তে লওভও। কৃশ্মীর কাছে সুশ্রীর হার, বেসুরের কাছে সুরের—পুরাণে এ কথা কীর্তিত হয়েছে কী আনন্দে, কী অট্টহাস্যে, অনন্দামঙ্গলের পাতা ওল্টালেই তা টের পাবে। এই তো দেখছ বেসুরের শান্ত্রসম্মত ট্র্যাডিশন। ঐ-যে তুন্দিলতনু গজানন সর্বাত্মে পেয়ে থাকেন পুজো, এটাই তো চোখ-ভোলানো দুর্বল ললিতকলার বিরুদ্ধে স্থূলতম প্রোটেস্ট। বর্তমান যুগে ঐ গনেশের পুঁড়ই তো চিম্নি-মূর্তি ধরে পাশ্চাত্য পণ্যযজ্ঞশালায় বৃহ্তিতধনি করছে। গণনায়কের এই কৃৎসিত বেসুরের জোরেই কি ওরা সিদ্ধিলাভ করছে না। চিন্তা করে দেখো।

দেখব।

যখন করবে তখন এ কথাটাও ভেবে দেখো, বেসুরের অজ্ঞেয় মাহাত্ম্য কঠিন ডাঙাতেই। সিংহ বলো, ব্যাঘ বলো, বলদ বলো, যাদের সঙ্গে সগর্বে বীরপুরুষদের তুলনা করা হয় তারা কোনো কালে ওস্তাদজির কাছে গলা সাধে না। এ কথায় তোমার সন্দেহ আছে কি।

তিলমাত্র না।

এমন-কি, ডাঙার অধম পণ্ড যে গর্দভ, যত দুর্বল সে হোক-না, বীণাপাণির আসরে সে সাক্ষেপ করতে যায় নি, এ কথা তার শক্ত মিত্র এক বাক্যে স্বীকার করবে।

তা করবে।

ঘোড়া তো পোষমানা জীব—লাথি মারবার যোগ্য খুর থাকা সঙ্গেও নির্বিবাদে চাবুক খেয়ে মরে—তার উচিত ছিল, আস্তাবলে খাড়া দাঁড়িয়ে বিশিষ্টখাস্তাজ আলাপ করা। তার চিহ্ন হিহি-শব্দে সে রাশি রাশি সফেন চন্দ্রবিন্দুবর্ষণ করে বটে, তবু

বেসুরো অনুনাসিকে সে ডাঙ্গার সম্মান রক্ষা করতে ভোলে না। আর গজরাজ, তাঁর কথা বলাই বাহ্য। পশুপতির কাছে দীক্ষাপ্রাণ এই-সমস্ত স্থলচর জীবের মধ্যে কি একটাও কোকিলকষ্ঠ বের করতে পার। ঐ-যে তোমার বুলডগ ফ্রেডি চীৎকারে ঘুমছাড়া করে পাড়া, ওর গলায় দয়া করে বা মজা করে বিধাতা যদি দেন শ্যামা-দোয়েলের শিস, তা হলে নিজের মধুর কষ্টের অসহ্য ধিক্কারে তোমার চল্লিং মোটরের তলায় গিয়ে বাঁপিয়ে পড়বে এ আমি বাজি রাখতে পারি। আচ্ছা, সত্য করে বলো কালীঘাটের পাঁঠা যদি কর্কশ ভ্যাভ্যা না করে রামকেলি ভাঁজতে থাকে, তা হলে তুমি তাকে জগন্নাতার পবিত্র মন্দির থেকে দূর-দূর করে খেদিয়ে দেবে না কি।

নিচয় দেব।

তা হলে বুঝতে পারছ আমরা যে সুমহৎ ব্রত নিয়েছি তার সার্থকতা। আমরা শক্ত ডাঙ্গার শাক্ত সন্তান, বেসুরমন্ত্রে দীক্ষিত। আধমরা দেশের চিকিৎসায় প্রয়োগ করতে চাই চরম মুষ্টিযোগ। জাগরণ চাই, বল চাই। জাগরণ শুরু হয়েছে পাড়ায়; প্রতিবেশীদের বলিষ্ঠতা দুর্মাম শব্দে দুর্দাম হচ্ছে, পৃষ্ঠদেশে তার প্রমাণ পাচ্ছে আমার চেলারা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোতোয়ালরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, টনক নড়েছে শাসনকর্তাদের।

তোমার গুরু বলছেন কী।

তিনি মহানন্দে মগ্ন। দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, বেসুরের নবযুগ এসেছে সমস্ত জগতে। সভ্য জাতোরা আজ বলছে, বেসুরটাতেই বাস্তব, ওতেই পুঁজীভূত পৌরুষ, সুরের মেয়েমানুষিই দুর্বল করেছে সভ্যতা। ওদের শাসনকর্তা বলছে জোর চাই, খৃষ্টানি চাই নে। রাষ্ট্রবিধিতে বেসুর চড়ে যাচ্ছে পর্দায় পর্দায়। সেটা কি তোমার চোখে পড়ে নি, দাদা।

চোখে পড়বার দরকার কী, ভাই। পিঠে পড়ছে দমাদম।

এ দিকে বেতালপঞ্চবিংশতিই চাপল সাহিত্যের ঘাড়ে। আনন্দ করো, বাংলা ও ওদের পাছু ধরেছে।

সে তো দেখছি। পাছু ধরতে বাংলা কোনোদিন পিছপাও নয়।

এ দিকে গুরুর আদেশে বেসুরমন্ত্র সাধন করবার জন্যে আমরা হৈহেসংঘ স্থাপন করেছি। দলে একজন কবি জুটেছে। তার চেহারা দেখে আশা হয়েছিল নবযুগ মূর্তিমান। রচনা দেখে ভুল ভাঙ্গল ; দেখি তোমারই চেলা। হাজার বার করে বলছি, ছন্দের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলো গদাঘাতে। বলছি, অর্থমনর্থৎ ভাবয়নিত্যম্। বুঝিয়ে দিলেম, কথার মানেটাকে সম্মান করায় কেবল দাসবুদ্ধির গাঁঠপড়া মনটাই ধরা পড়ে। ফল হচ্ছে না। বেচারার দোষ নেই—গলদ্ধর্ম হয়ে ওঠে, তবু অন্দলোকি কাব্যের ছাঁদ ঘোঢ়াতে পারে না। ওকে রেখেছি পরীক্ষাধীনে। প্রথম নমুনা যেটা সমিতির কাছে দাখিল করেছে সেটা শুনিয়ে দিই। সুর দিয়ে শোনাতে পারব না।

সেইজন্যেই তোমাকে ঘরে চুকতে দিতে সাহস হয়।

তবে অবধান করো—

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,  
 হৈহেপড়া ছেড়ে দূর দিয়ে যাইয়ে ।  
 হেথা সা-রে গা-মা পা'য়ে সুরাসুরে যুদ্ধ,  
 শৰ্ক কোমলগুলো বেবাক অশুন্দ—  
 অভেদ রাগিণীরাগে ভগিনী ও ভাইয়ে—  
 তার-ছেঁড়া তসুরা, তাল-কাটা বাজিয়ে—  
 দিনরাত বেধে যায় কাজিয়ে  
 ঝাপতালে দাদৰায় চৌতালে ধামারে  
 এলোমেলো ঘা মারে—  
 তেরে কেটে মেরে কেটে ধা ধা ধা ধাইয়ে ।

সভাসুন্দ একবাক্যে বলে উঠলুম, এ চলবে না । এখনো জাতের মায়া ছাড়তে  
 পারে নি—শুচিবাযুগ্মত, নাড়ী দুর্বল । আমরা বেছন্দ চাই বেপরোয়া । কবির মেয়াদ  
 বাড়িয়ে দেওয়া গেল । বললুম, আরো একবার কোমর বেঁধে লাগো, বাঙালি  
 ছেলেদের কানে জোরের কথা হাতুড়ি পিটিয়ে চালিয়ে দাও, মনে রেখো পিটুনির  
 চোটে ঠেলা মেরে জোর চালানো আজ পৃতিবীর সর্বত্রই প্রচলিত—বাঙালি শুধু কি  
 ঘুমায়ে রয় । দেখলুম, লোকটার অস্তংকরণ পাক খেয়ে উঠেছে । বলে উঠল, নয়  
 নয়, কখনোই নয় । কলমটাকে কামড়ে ধরে ছুটে গিয়ে বসল টেবিলে । করজোড়ে  
 গণেশকে বললে, তোমার কলাবধূকে পাঠিয়ে দাও অস্তঃপুরে সিদ্ধিদাতা । লাগাও  
 তোমার তুঁড়ের আছাড় আমার মগজে, ভূমিকম্প লাঞ্চক আমার মাত্তাষায়, জোরের  
 তপ্তপক্ষ উৎসারিত হোক কলমের মুখে, দুশ্শাব্যের চোটে বাঙালির ছেলেকে দিক  
 জাগিয়ে । কবি মিনিট পনেরো পরে বেরিয়ে চীৎকার সুরে আবৃত্তি শুরু করলে । মুখ  
 চোখ লাল, চুলগুলো উঞ্জোখুঞ্জো, দশা পাবার দশা ।—

মারু মারু মারু রবে মারু গাঁষ্টা,  
 মারহাট্টা, ওরে মারহাট্টা,  
 ছুটে আয় দুন্দাড়,  
 ভাঙ মাথা, ভাঙ হাড়,  
 কোথা তোর বাসা আছে হাড়কাটা ।  
 আনু ঘুষো, আনু কিল,  
 আনু ঢেলা, আনু ঢিল,  
 নাক মুখ থেতো করে দিক ঠাট্টা ।  
 আগ্রূম বাগ্রূম  
 দুম্দাম ধুমাধুম,  
 ভেঙে চুরে চুরমার হোক খাট্টা ।  
 সুম যাক, মারো কষে মাল্সাটা ।  
 বাঁশিগুলা চুপ রাও,  
 টান মেরে উপ্ডাও

ধরা হতে ললিতলবঙ্গলতা ।  
 বেল জুই চম্পক  
 দূরে দিক ঝম্পক,  
 উপবনে জমা হোক জঙ্গলতা ।

আমি অস্থির হয়ে দুই হাত তুলে বললুম, থামো থামো, আর নয় । জয়দেবের  
 ভূত এখনো কাঁধে বসে ছন্দের সার্কাস করছে, কানের দখল ছাড়ে নি । গয়াধামে ঐ  
 লেখাটার যদি পিণ্ডি দিতে চাও তবে ওর উপরে হানো মুশল, ওটাকে ছিরুকুটে  
 নাস্তানাবুদ করে তার উপরে ফুট্কি বৃষ্টি করো । কবি হাত জোড় করে বললে, আমি  
 পারব না, তুমি হাত লাগাও । আমি বললুম, ঐ-যে মারহাটা শব্দটা তোমার মাথায়  
 এসেছে, ঐটেতেই তোমার ভবিষ্যতের আশা । চলন্তিকা থেকে কথাটাকে ছিড়ে  
 ফেলেছ, অর্থের শিকড়টা রয়ে গেল মাটির নীচে । শুধু ডাঁটা ধরে খাড়া রয়েছে  
 ধনির মারমূর্তি । এইবার সমস্তটাকে ছন্নছাড়া করে দিই—দেখো, কী মূর্তি  
 বেরোয়—

হৈ রে হৈ মারহাটা  
 গালপাটা  
 আঁটসাটা ।

\* \* \*

হারকাটা কঁা কোঁ কীচ  
 গড়গড় গড়গড় ।...  
 হড় দনুম দনুড়  
 ডাখা  
 ধপাং  
 ঠাখা  
 কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার

\* \* \*

মডুমডু মডুমডু  
 দুড় ম...  
 হড় মুড় হড়মুড়  
 দেউকিনদন  
 ঝঞ্জন পাও  
 কুন্দন গাড়োয়ান

বাঁকে বিহুরী

তড়ুবড়ু তড়ুবড়ু তড়ুবড়ু তড়ুবড়ু

খট্খটি মসৃমসৃ

ধড়াধড়

ধড়ুফড়ু ধড়ুফড়ু

হো হো হু হু হা হা—

ট ঠ ড ঢ ঢ ঢ হঃ—

ইনফর্নো হেডিস লিষ্টো ।

দাদা, তোমার নকল করি নি এই সার্টিফিকেট আমাকে দিতে হবে ।

খুমি হয়ে দেব ।

নবযুগের মহাকাব্য তোমাকে লিখতে হবে দাদা ।

যদি পারি । বিষয়টা কী ।

বেসুর-হিড়িষের দিঘিজয় ।

পুপুদিদিকে জিগেস করলুম, কেমন লাগল ।

পুপু বললে, ধাঁধা লাগল ।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ, সুরাসুরের যুক্তে অসুরের জয়টা কেন আমার তেমন খারাপ লাগল না, তাই ভাবছি । বিশ্বি গৌয়ারটা দিকেই রায় দিতে চাচ্ছে মন ।

তার কারণ, তুমি স্ত্রীজাতীয় । অত্যাচারের মোহ কাটে নি । মার খেয়ে আনন্দ পাও, মারবার শক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখে ।

অত্যাচারের আক্রমণ পছন্দসই তা বলতে পারি নে—কিন্তু বীভৎসমূর্তিতে যে পৌরুষ ঘূষি উঁচিয়ে দাঁড়ায় তাকে মনে হয় সারাইম ।

আমার মতটা বলি । দুঃশাসনের আক্ষালনটা পৌরুষ নয়, একেবারে উল্টো । আজ পর্যন্ত পুরুষই সৃষ্টি করেছে সুন্দর, লড়াই করেছে বেসুরের সঙ্গে । অসুর সেই পরিমাণেই জোরের ভান করে যে পরিমাণে পুরুষ হয় কাপুরুষ । আজ পৃথিবীতে তারই প্রমাণ পাচ্ছি ।

১৩

পুপুদিদির মনে হল, আমি ওর ওর মর্যাদাহানি করেছি । তখন সক্ষে হয়ে আসছে । কেদারায় হেলান দিয়ে ও বসল আমার কাছে । অন্য দিকে মুখ করে বললে, তুমি আমাকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কেবল ছেলেমানুষি করছ, এতে তোমার কী সুখ ।

আজকাল ওর কথা শুনে হাসতে সাহস হয় না । ভালোমানুষের মতো মুখ করেই বললুম, তোমার বয়সে পাকা বুদ্ধির প্রমাণ দিতেই তোমাদের আগ্রহ, আমার বয়সে ভাবতে ভালো লাগে যে মজাটা এখনো আছে কাঁচা । সুযোগ পেলে মশ্শুল হয়ে ছেলেমানুষি করি বানিয়ে, হয়তো মানানসই হয় না ।

তাই বলে আগাগোড়াই যদি ছেলেমানুষি কর, তা হলে সত্যিকার ছেলেমানুষিই হয় না। ছেলে বয়সের ভিতরে ভিতরে বড়ো বয়সের মিশল থাকে।

দিনি, এটা একটা কথার মতো কথা বলেছ। শিশুর কোমল দেহেও শক্ত হাড়ের গোড়াপতন থাকে। এ কথাটা আমি ভুলেছিলুম না কি।

তোমার বকুনি শুনে মনে হয়, যখন আমি ছোটো ছিলুম তখনকার দিনে এমন কিছুই ছিল না যা ব্যঙ্গ করবার নয় অথচ মজা করবার।

একটা উদাহরণ দেখাও।

মনে করো, আমাদের মাস্টারমশায়। তিনি অস্তুত ছিলেন, কিন্তু খাটি অস্তুত। তাই তাঁকে এত ভালো লাগত।

আচ্ছা, তাঁর কথাটা একটু ধরিয়ে দাও-না।

আজও তাঁর মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে। ক্লাসে বসতেন যেন আলগোছে, বইগুলো ছিল কঠিন। উপরের দিকে তাকিয়ে পাঠ বলে যেতেন, কথাগুলো যেন সদ্য ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। আমরা ক্লাসে উপস্থিত থাকব, মন দিয়ে পড়া শুনব, সে গরজটা সম্পূর্ণ আমাদেরই বলে তিনি মনে করতেন।

তিনি তোমাদের মুখ চেনবার সুযোগ পান নি বোধ হয়।

চেষ্টাও করেন নি। একদিন ছাঁটির দরবার নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি শশব্যস্ত হয়ে চৌকি ছেড়ে উঠে পড়লেন; মনে করলেন, আমি বুঝি যাকে বলে একজন রীতিমত মহিলা।

অমনতরো অভাবনীয় ভুল করা তাঁর অভ্যন্তর ছিল।

ছিল বৈকি। তোমার দাঢ়ি দেখে কোনোদিন তোমাকে নবাব খাজের্খার প্রাইভেট সেক্রেটারি বলে ভুল করেন নি তো? না, ঠাট্টা নয়, তিনি তো তোমার বক্স ছিলেন, বলো-না তাঁর কথা।

তাঁর শক্ত কেউ ছিল না, কিন্তু সমজদার বক্স ছিলুম একলা আমি। লোকে যখন তাঁর খ্যাপামির কথা রটাত তিনি আশ্রয় হয়ে যেতেন। একদিন আমাকে এসে বললেন, সবাই বলছে, আমি ক্লাস পড়াই কিন্তু ক্লাসের দিকে তাকাই নে।

আমি বললুম, তোমার সাঙ্গীরা তোমার বিদ্যের দোষ ধরতে পারে না, তোমার বুদ্ধির দোষ ধরে। তারা বলে, তোমার পড়ানোর ভুল হয় না কিন্তু পড়াচ্ছ যে সেইটৈই ভুলে যাও।

পড়াচ্ছ যদি না ভুলি তবে পড়াতে পারতুম না, নিছক মাস্টারিই করে যেতুম। পড়ানোটা নিঃশেষে হজম হয়ে গেছে, ওটা নিয়ে মনটা আইচাই করে না।

জলচর জলে সাঁতার দিলে টের পাওয়া যায় না, স্থলচর দিলে সেটা খুবই মালুম হয়। তুমি অধ্যাপন-সরোবরের গভীর জলের মাছ।

আমি যদি ছাত্রদের দিকে তাকাই তবে ক্লাসের দিকে মন দেব কী করে।

তোমার সেই ক্লাসটা আছে কোথায়।

কোথাও না, সেইজন্যেই তো বাধা পাই নে। ছাত্ররাই যদি আমার চোখ জুড়ে

বসে তা হলে ক্লাসের আঞ্চলিক পড়ে যে ।

‘পরো বাবা আঞ্চলিক’ এই বকি তোমার বুলি ?

পড়াচ্ছি কই । আমার আঞ্চলিককেই টহল দেওয়াচ্ছি ।

তোমার প্রণালীটা কিরকম ।

গঙ্গাধারার বহে যাবার প্রণালী যেরকম । ডাইনে বাঁয়ে কোথাও মরু, কোথাও ফসল, কোথাও শূশান, কোথাও শহর । এই নিয়ে গঙ্গামাঝীকে পদে পদে বিচার করতে যদি হত তা হলে আজ পর্যন্ত সগরসন্তানদের উদ্ধার হত না । যাদের যতটা হবার তাই হয়, বিধাতার সঙ্গে টকার দিয়ে তার চেয়ে বেশি হওয়াতে গেলেই চলা বন্ধ । আমার পড়ানো চলে যেঘের মতো শূন্য দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা খেতে, ফসল ফলে খেত-অনুসারে । অসমবকে নিয়ে ঠেলাঠেলি করে সময় নষ্ট করি নে বলে হেডমাস্টার হন ক্ষাপা । এই হেডমাস্টারটিকেও অত্যন্ত সত্য বলে গণ্য করলে অত্যন্ত ভুল করা হয় ।

পুপু বললে, ছাত্রীদের অনেকে মনে মনে খুঁতখুঁত করত । তাদের লক্ষ্য করে একদিন বলেছিলেন, এখানে যে মাস্টারটা আছে তাকে নেই করে দিয়েছি, তোমাদের নিজের মনকেই বেড়ে ওঠবার জায়গা করে দেবার জন্যেই । আর-একদিন তিনি বলেছিলেন, মাস্টারিতে আমি হচ্ছি ক্লাসিক, আর সিধুবাবু রোমান্টিক । বলা বাহ্য্য, মাস্টারমশায়ের কথাটা আমরা কিছুই বুঝতে পারি নি ।

মনে হচ্ছে মাস্টার সমগ্র ক্লাসকেই দিতেন উপরে তুলে, আর সিধু ছাত্রদের একে একে নিজের কাঁধে ঢাকিয়ে গর্তগাঢ়ি পার করত । বুঝেছ ?

না, বোঝবার দরকার নেই । তুমি তাঁর কথা বলে যাও, মজা লাগে শুনতে ।

আমারও লাগে, কেননা লোকটাকে বুঝতে লাগে দেরি । একদিন চীন-দাশনিকের দোহাই দিয়ে মাস্টার আমাকে বললে, যে রাজ্যে রাজত্বটা নেই সেই রাজ্যই সকল রাজ্যের সেরা ।

পুপে সর্বে বললে, আমাদের ক্লাস সেরা ক্লাস ছিল সন্দেহ নেই ।

আমি বললুম, তার কারণ, প্রমাণ সত্ত্বেও তোমার কম বুদ্ধির লক্ষণ মাস্টার লক্ষ্য করতেন না ।

পুপে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, এটাকে কি গাল বলব না ঠাণ্টা ।

আমি বললুম, পাশ দিয়ে যেতে যেতে তোমার চুলটা টেনে দিই, এ ঠাণ্টা সেই স্মিক্ষ জাতের । এতে ক্যাসাস ব্যালাই অর্থাৎ ‘অদ্য যুক্ত তৃয়া ময়া’র ঘোষণা নেই ।

পুপে বললে, মাস্টারমশায়ের ব্যবস্থা ছিল মজার রকমের । তিনি বলতেন, তোমাদের নিজের খবর নিজেই রাখবে ; তোমাদের খবরদারি করবার কাজ আমার নয় । প্রতিদিনের পড়ার ফল নিজেরাই রাখতুম ; মার্কা দেবার নিয়ম জানা ছিল ।

তার ফল কী হল ।

মার্কা বরঞ্চ কম করেই দিতুম ।

কখনো কি ঠকাতে না ।

বাইরের কেউ মার্কা দেবার থাকলে তাকে ঠকাবার লোভ হতে পারত।  
নিজেকে ঠকানো বোকামি। বিশেষত তিনি তো দেখতেন না।

তার পরে ?

তার পরে প্রত্যেক তিন মাস অন্তর নিজেরাই হিসেব করে জানতুম উঠছি কি  
নাবাছি।

তোমাদের কি সত্যযুগের হাইস্কুল, অত্যন্ত হাই ? ফাঁকি দেবার লোকই বুঝি  
ছিল না ?

মাষ্টারমশায় ছিলেন অবিচলিত। তিনি বলতেন, সংসারে একদল লোক ফাঁকি  
দেবেই। কিন্তু, নিজের দায় যাদের নিজের হাতে, ওরই মধ্যে তারাই কম ফাঁকি  
দেয়। আমাদের শাস্তিও ছিল ঐ জাতের। বাইরে থেকে না। একদিন হাজিরি  
নাম-ডাক উপলক্ষে প্রিয়সন্ধীর পর্সেন্টেজ বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলে  
ফেলেছিলুম। তিনি বললেন, অঙ্গটি হয়েছ, প্রায়শিত্ব কোরো। তিনি জানতেও  
চাইতেন না করেছি কি না।

প্রায়শিত্ব কি করেছিলে।

নিশ্চয়ই করেছিলুম।

অর্থাৎ, তোমার পাউডরের কৌটোটা ঐ প্রিয়সন্ধীকে দান করেছিলে ?

আমি কথ্যনো পাউডর মাখি নে।

বলতে চাও, তোমার ঐ মুখের রঙ তোমার খাস নিজেরাই ?

আর যাই হোক তোমার কাছ থেকে ধার নিই নি, মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে  
পারবে।

ছি, আমাকে নিয়ে তোমার দৃষ্টিতে যদি ভেদবুদ্ধি দেখা দেয় তা হলে জাতে  
দোষারোপ ঘটে। আমরা যে সর্ব—বর্ণভেদের জো কী। হাতের কাছে কবি থাকলে  
বলতেন, তোমার গায়ের রঙ ফুটে বেরিয়েছে ব্রহ্মার হাসি থেকে।

আর তোমার রঙ তাঁর ঠাট্টার হাসি থেকে।

একেই বলে আন্যোন্যস্তুতি, মুচুয়ল অ্যাড্মিরেশন। পিতামহের দুই জাতের  
হাসি আছে—একটা দন্ত্য, একটা মূর্ধন্য। আমাতে লেগেছে মূর্ধন্য হাসি,  
ইংরেজিতে তাকে বলে উইট।

দাদামশায়, নিজের গুণগান তোমার মুখে কথনো বাধে না।

সেইটেই আমার প্রধান গুণ। আপনাকে যারা জানে আমি সেই অসামান্যের  
দলে।

মুখ খুলে গেছে, কিন্তু আর নয়, এবার থামো। মাষ্টারমশায়ের কথা হচ্ছিল,  
এখন উঠে পড়ল তোমার নিজের কথা।

তাতে দোষ হয়েছে কী। বিষয়টা তো উপাদেয়, যাকে বলে ইন্টারেষ্টিং।

বিষয়টা সর্বদাই রয়েছে সামনে। তাকে তো শ্বরণ করবার দরকার হয় না।  
তাকে যে ভোলাই শক্ত।

আচ্ছা, তা হলে মাস্টারের একটা বিশেষ পরিচয় দিই তোমাকে। এটা টুকে  
রাখবার যোগ্য। একদিন সঙ্কেবেলায় মাস্টার জনকয়েক লোককে নেমত্তন  
করেছিল। খবরটা তার মনে আছে কি না জানবার জন্যে সকাল-সকাল গেলুম তার  
বাড়িতে। সেবক কানাইয়ের সঙ্গে তার যে আলোচনাটা চলছিল, বলি সে কথাটা।  
কানাই বললে, জগন্নাতীপুজোর বাজারে গলদা চিংড়ির দাম চড়ে গেছে, তাই  
এনেছি ডিমওয়ালা কাঁকড়া।

মাস্টার ঈষৎ চিন্তিত হয়ে বলে, কাঁকড়া কী হবে।

ও বললে, লাউ দিয়ে ঝোল, সে তোফা হবে।

আমি বললুম, মাস্টার, গল্দা চিংড়ির উপর তোমার লোভ ছিল?

মাস্টার বললে, ছিল বৈকি।

তা হলে তো লোভ সংবরণ করতে হবে।

তা কেন। লোভটা প্রস্তুত হয়েই আছে, তাকে শান্ত করে চালিয়ে দেব কাঁকড়ার  
লাইন।

দেখছি, তোমাকে বিস্তর শান্ত করতে হয়।

মাস্টার বললে, কাঁকড়ার ঝোল তো খেয়েছি অনেকবার সম্পূর্ণ মন দিই নি।  
এবার যখন দেখলুম কানাইয়ের জিভে জল এসেছে, তখন তার সিঙ্গ রসনার  
নির্দেশে খাবার সময় মনটা ঝুঁকে পড়বে কাঁকড়ার দিকে, রসটা পাব বেশি করে।  
কাঁকড়ার ঝোলটাকে ও যেন লাল পেন্সিলে আন্ডরলাইন করে দিলে; ওটাকে  
ভালো করে মুখস্থ করবার পক্ষে সুবিধে হল আমার।

মাস্টার জিগেস করলে, আঁষ্ঠি-বাধা ওটা কী এনেছিস।

কানাই বললে, সজনের ডাঁটা।

মাস্টার সগর্বে আমার দিকে চেয়ে বললে, এই দেখো মজা। ও বাজারে যাবার  
সময় আমার মনে ছিল লাউডগা। ও বাজার থেকে ফিরে এল, আমি পেয়ে গেলুম  
সজনের ডাঁটা। হ্রস্ব না করবার এই সুবিধে।

আমি বললুম, সজনের ডাঁটা না এনে ও যদি আনত চিচিঙ্গে?

মাস্টার জবাব দিলেন, তা হলে শব্দকালের জন্যে ভাবনা করতে হত। নাম  
জিনিসটার প্রভাব আছে। চিচিঙ্গে শব্দটা লোভজনক নয়। কিন্তু, কানাই, যদি ওটা  
বিশেষ করে বাছাই করে আনত, তা হলে সংক্ষার কাটাবার একটা উপলক্ষ হত।  
জীবনে সব-প্রথমে ভেবে দেখবার সুযোগ হত ‘দেখাই যাক-না’; হয়তো আবিক্ষার  
করতুম, ওটা মন্দ চলে না। চিচিঙ্গে পদার্থটার বিরুদ্ধে অক্ষ বিরাগ দূর হয়ে  
উপভোগের সীমানা বেড়ে যেত। এমনি করেই কাব্যে কবিরা তো নিজের রূচিতে  
আমাদের রূচির প্রসার বাড়িয়ে দিছে। সৃষ্টিকে আন্ডরলাইন করাই তাদের কাজ।

তোমার রূচির প্রসার বাড়াবার কাজে কানাইয়ের আরো এমন হাত আছে?

আছে বৈকি। ও না থাকলে পিড়িৎ শাকে আমি কোনোদিন মনোযোগই দিতুম  
না। শব্দটা আমাকে মারত ধাক্কা। সংসারে সংক্ষারমুক্তিই তো অধিকারব্যাপ্তি।

সেই মহৎ কাজে আছে তোমার কানাই।

তা মানতে হবে, ভাই। ওর ইচ্ছার যোগে ইচ্ছার সংকীর্ণতা ঘুচে যায় প্রতিদিন।  
আমি একলা থাকলে এমনটা ঘটত না।

বুবলুম, কিন্তু কানাইয়ের ইচ্ছার সীমান্টা —

বাড়িয়েছি বৈকি। পূর্বস্মের লোক, কলাইয়ের ডালের নাম শুনতে পারত না।  
আজকাল হিং দিয়ে কলাইয়ের ডাল ও খাচ্ছে বেশ।

এমন সময়ে কানাইয়ের পুনঃপ্রবেশ। বললে, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি,  
আজ দইটা আনি নি। কবরেজমশায় বলেন, রাত্রে দইটা বারণ।

দইয়ের দাম চড়ে গেছে বললে দ্বিরুক্তি হয়, এইজন্যে কবরেজমশায়কে  
পাঢ়তে হল। সাম্মনা দেবার জন্যে বললে, অঙ্গ একটু আদার রস মিশিয়ে পাতলা চা  
বানিয়ে দেব, শীতের রাত্রে উপকার দেবে।

আমি জিগেস করলেম, কী বল হে মাটার, আদা দিয়ে চা সবাইকে খাওয়াবে না  
কি।

সবাইকার কথা বলব কী করে। যারা খাবে তারা খাবে। হতে পারে উপকার।  
যারা খাবে না তাদের অপকার হবে না।

আমি বললুম, মাটার, চীন-দার্শনিকের উপদেশমতে তোমার গেরস্থালিতে মনিব  
নেই বুঝি?

না।

তা হলে চাকরই বা আছে কেন।

মনিব না থাকলেই চাকর স্বতই থাকে না।

তোমার এখানে চাকরে মনিবে বেমালুম মিশিয়ে গিয়ে একটা যৌগিক পদার্থ  
খাড়া হয়েছে বুঝি?

মাটার হেসে বললে, অক্সিজেন হাইড্রোজেনের দাহ্য মেজাজ ঘুচে গিয়ে দোহে  
মিলে একেবারে জল।

আমি বললুম, যদি বিয়ে করতে ভায়া, পাড়া ছেড়ে চীনের দর্শন দৌড় দিত।  
থেকেও থাকবে না, গিন্নি এমন নির্বিশেষ পদার্থ নয়। মুখের উপর ঘোমটা টেনেও  
তোমার সংসারে সে হত অতিশয় স্পষ্ট। তার রাজ্যে রাজতৃটা তার কটাক্ষে থেত  
দোলা; সর্বদা ধাক্কা লাগাত, কখনো পিঠে, কখনো বুকে।

মাটার বললে, তা হলে কর্তা রিটৱ্রন্ টিকিট না কিনেই দৌড় মারত  
ডেরাগাজিখায়ে, গিন্নিত্ব অন্তর্ধান করত ইন্টারন্ বেঙ্গল রেলের রাস্তা বেয়ে বাপের  
বাড়িতে।

মাটার মাঝে মাঝে হাসির কথা বলে, কিন্তু হাসে না।

পুপুদিদি বললে, আমাদের মাটারমশায়কে নিয়ে যদি গঞ্জের পালা বাঁধতে হয়  
কিরকম করে বাঁধ।

তা হলে দশ লক্ষ বছর বাদ দিই।

তার মানে, আজগুবি গল্প বানাতে, অথচ আজকের দিনের বিরুদ্ধ-পক্ষের সাক্ষীর শক্তা থাকত না।

কোনো সাহিত্যওয়ালা কখনো সাক্ষীর ভয় করে না। আসল কথা, আমার গল্পটা ফুটে উঠতে যুগান্তরের দরকার করবে। কেন, সেইটে বুঝিয়ে বলি—পৃথিবী-সৃষ্টির গোড়াকার মালমসলা ছিল পাথর লোহা প্রভৃতি মোটামোটা ভারী ভারী জিনিস। তারই ঢালাই পেটাই চলেছিল অনেককাল। কঠোরের বে-আকৃতা ছিল বহু যুগ ধরে। অবশেষে নরম মাটি পৃথিবীকে শ্যামল আন্তরণে ঢাকা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার যেন লজ্জা রক্ষা করলে। তখন জীবজন্তু আসরে নামল স্তূপাকার হাড়মাংসের বোঝাই নিয়ে ; মোটা মোটা বর্ম পরে তার দুশো পাঁচশো মোন অসভ্য লেজ টেনে বেড়াতে লাগল।

তারা ছিল দর্শনধারী জীব। কিন্তু সেই মাংসবাহীর দল সৃষ্টিকর্তার পছন্দসই হল না। আবার চলল বহু যুগ ধরে নিষ্ঠুর পরীক্ষা। শেষকালে এল মনোবাহী মানুষ। লেজের বাহুল্য গেল যুচে, হাড়মাংস হল পরিমিত, কড়া চামড়াটা নরম হয়ে এল তুকে। না রইল শিঙ, না রইল ক্ষুর, না রইল নখের জোর, চার পা এসে ঠেকল দুটিমাত্র পায়ে। বোঝা গেল, বিধাতা তাঁর হাতিয়ার চালাচ্ছেন সৃষ্টির যুগটাকে ত্রুণ সূক্ষ্ম করে আনবার জন্যে। স্থুলে সূক্ষ্মে জড়িয়ে আছে মানুষ। মনের সঙ্গে মাংসের চলেছে ঠেলাঠেলি, মারামারি। বিধাতা পুনশ্চ মাথা নাড়ছেন, উঁহ, হল না। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, এটাও টিকবে না ; এ আপনিই আপনাকে নিকেশ করে দেবে আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে। যাবে কয়েক লক্ষ বছর কেটে। মাংস পড়বে বারে, মন উঠবে একেশ্বর হয়ে। সেই বিশুদ্ধ মনের যুগে তোমার মাস্টারমশায় বসেছেন শরীররিক্ত ক্লাসে। মনে করে দেখো, তাঁর শিক্ষা দেবার প্রণালী হচ্ছে ছাত্রদের মধ্যে নিজেকে মেলাতে থাকা মনের উপর মন বিছিয়ে, বাইরের বাধা নেই বললেই হয়।

স্থুল বুদ্ধির বাধাও নেই ?

সেটা না থাকলে বুদ্ধি মাত্রই হয়ে পড়ে বেকার। ভালো-মন্দ বোকা-বুদ্ধিমানের ভেদ আছেই। চরিত্র আছে নানা রকমের। ভাবের বৈচিত্র্য আছে, ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য আছে। এখন তিনিই ভালো মাস্টার যিনি সেই অনেকের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, শিক্ষা এখন অন্তরে অন্তরে।

দাদামশায়, ইঙ্গুলিটা কোথায় আছে সেটা ঠিক মনে আনতে পারছি নে।

পৃথিবীতে তিনটে বাসা আছে—এক সমুদ্রতলে, আর এক ভূতলে, আর আছে আকাশে যেখানে সূক্ষ্ম হাওয়া আর সূক্ষ্মতর আলো। এইখানটা আজ আছে খালি আগামী যুগের জন্যে।

তা হলে তোমার ক্লাস চলেছে সেই হাওয়ায় সেই আলোয়। কিন্তু, ছাত্রদের চেহারাটা কিরকম।

বুঝিয়ে বলা শক্ত, তাদের আকার নিশ্চয় আছে, কিন্তু আকারের আধার নেই।

তা হলে বোধ হচ্ছে নানা রঙের আলোয় তারা গড়া।

সেইটেই সম্ভব। তোমাদের বিজ্ঞান-মাস্টার তো সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন,

বিশ্বজগতে সৃষ্টি আলোর কণাই বহুরূপী হয়ে স্থুল রূপের ভান করছে। সেদিন  
আলো আপন আদিম সৃষ্টিরূপেই প্রকাশ পাবে। তাসে তোমরা সবাই আলো করে  
বসবে। সেদিন ওটিন স্নে-ওয়ালারা একেবারে দেউলে হয়ে গেছে।

দেউলে কেন, আলো হয়ে গেছে।

দেউলে হয়ে যাওয়ার মানেই তো আলো হয়ে যাওয়া।

আমি কোন্ রঙের আলো হব, দাদামশায়।

সোনার রঙের।

আর তুমি ?

আমি একেবারে বিশুদ্ধ রেডিয়ম।

সেদিন আলোয় আলোয় লড়াই হবে না তো ? ইলেক্ট্রন নিয়ে হবে না কি  
কাড়াকাড়ি।

ভাবনা ধরিয়ে দিলে। লীগ অব লাইট্স-এর দরকার হবে বোধ হচ্ছে। ইলেক্ট্রন  
নিয়ে টানাটানির গুজব এখনই শুনতে পাচ্ছি।

ভালোই তো দাদামশায়। বীরবসের কবিতা তোমার ভাষায় উজ্জ্বল বর্ণে বর্ণিত  
হবে। ঐ যাঃ, ভাষা থাকবে তো ?

শব্দের ভাষা নিছক ভাবের ভাষায় গিয়ে পৌছবে, ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হবে না।

আচ্ছা, গান ?

গান হবে রঙের সংগত। বড়ো সহজ হবে না। তান যখন ঠিকরে পড়তে  
থাকবে, ঝলক মারবে আকাশের দিকে দিকে। তখনকার তানসেনরা দিগন্তে  
অরোরা বোরিয়ালিস বানিয়ে দেবে।

আর, তোমার গদ্যকাব্য কী হবে বলো তো।

তাতে লোহার ইলেক্ট্রন্ড মিশবে, আবার সোনারও।

সেদিনকার দিদিমা পছন্দ করবে না।

আমার ভরসা আছে সেদিনকার আধুনিক নাতনিরা মুক্ষ হয়ে যাবে।

তা হলে সেই আলোর যুগে তোমার নাতনি হয়েই জন্মাব। এবারকার মতো  
দেহধারণীর 'পরে ধৈর্য রক্ষা কোরো। এখন চললুম সিনেমায়।

কিসের পালা।

বৈদেহীর বনবাস।

## ১৪

পরদিন সকালবেলায় প্রাতরাশে আমার নির্দেশমত পুপেদিদি নিয়ে এল পাথরের  
পাত্রে ছোলাভিজে এবং গুড়। বর্তমান যুগে পুরাকালীন গৌড়ীয় খাদ্যবিধির  
রেনেসাস-প্রবর্তনে লেগেছি। দিদিমণি জিগেস করলে, চা হবে কি।

আমি বললুম, না, খেজুর-রস।

দিদি বললে, আজ তোমার মুখখানা অমন দেখছি কেন। কোনো খারাপ স্ফু  
দেখেছ না কি।

আমি বললুম, স্বপ্নের ছায়া তো মনের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করছেই—স্বপ্নও মিলিয়ে যায়, ছায়ারও চিহ্ন থাকে না। আজ তোমার ছেলেমানুষির একটা কথা বার বার মনে পড়ছে, ইচ্ছে করছে বলি।

বলো-না।

সেদিন লেখা বন্ধ করে বারান্দায় বসে ছিলুম। তুমি ছিলে, সুকুমারও ছিল। সঙ্গে হয়ে এল, রাস্তার বাতি জ্বালিয়ে গেল, আমি বসে বসে সত্যযুগের কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছিলুম।

বানিয়ে বলেছিলে ! তার মানে ওটাকে অসত্যযুগ করে তুলেছিলে।

ওকে অসত্য বলে না। যে রশ্মি বেগনির সীমা পেরিয়ে গেছে তাকে দেখা যায় না বলেই সে মিথ্যে নয়, সেও আলো। ইতিহাসের সেই বেগনি পেরোনো আলোতেই মানুষের সত্যযুগের সৃষ্টি। তাকে প্রাণৈতিহাসিক বলব না, সে আল্ট্রা-এতিহাসিক।

আর তোমার ব্যাখ্যা করতে হবে না। কী বলছিলে বলো।

আমি তোমাদের বলছিলুম, সত্যযুগে মানুষ বই পড়ে শিখত না, খবর শুনে জানত না, তাদের জানা ছিল হয়ে-উঠে জানা।

কী মানে হল বুঝতে পারছি নে।

একটু মন দিয়ে শোনো বলি। বোধ হয় তোমার বিশ্বাস তুমি আমাকে জান ?

দৃঢ় বিশ্বাস।

জান কিন্তু সে জানায় সাড়ে-পনেরো আনাই বাদ পড়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই তুমি যদি ভিতরে ভিতরে আমি হয়ে যেতে পারতে তা হলেই তোমার জানাটা সম্পূর্ণ সত্য হত।

তা হলে তুমি বলতে চাও আমরা কিছুই জানি নে ?

জানিই নে তো। সবাই মিলে ধরে নিয়েছি যে জানি, সেই আপসে ধরে নেওয়ার উপরেই আমাদের কারবার।

কারবার তো ভালোই চলছে।

চলছে, কিন্তু এ সত্যযুগের চলা নয়। সেই কথাই তোমাদের বলছিলুম—সত্যযুগের মানুষ দেখার জানা জানত না, ছোওয়ার জানা জানত না, জানত একেবারে হওয়ার জানা।

মেয়েদের মন প্রত্যক্ষকে আঁকড়ে থাকে ; ভেবেছিলেম আমার কথাটা অত্যন্ত অবস্থা ঠেকবে পুপুর কাছে, ভালোই লাগবে না। দেখলুম একটু ঔৎসুক্য হয়েছে। বললে, বেশ মজা।

একটু উন্মেষিত হয়ে উঠেই বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, আজকাল তো সায়াসে অনেক বুজ্জর্ণগি করছে ; মরা মানুষের গান শোনাচ্ছে, দূরের মানুষের চেহারা দেখাচ্ছে, আবার শুনছি সীসেকে সোনা করছে—তেমনি একদিন হয়তো এমন একটা বিদ্যুতের খেলা খেলাবে যে ইচ্ছে করলে একজন আর-একজনের মধ্যে মিলে যেতে পারবে।

অসম্ভব নয়। কিন্তু, তুমি তা হলে কী করবে। কিছুই লুকোতে পারবে না।

সর্বনাশ! সব মানুষেরই যে লুকোবার আছে অনেক।

লুকোনো আছে বলেই লুকোবার আছে। যদি কারও কিছুই লুকোনো না থাকত তা হলে দেখা-বিন্তি খেলার মতো সবার সত জেনেই লোকব্যবহার হত।

কিন্তু, লজ্জার কথা যে অনেক আছে।

লজ্জার কথা সকলেরই প্রকাশ হলে লজ্জার ধার চলে যেত।

আচ্ছা, আমার কথা কী বলতে যাইলৈ তুমি।

সেদিন আমি তোমাকে জিগেস করেছিলুম, তুমি যদি সত্যযুগে জন্মাতে তবে আপনাকে কী হয়ে দেখতে তোমার ইচ্ছে হত। তুমি ফস্ক করে বলে ফেললে, কাবুলি বেড়াল।

পুপে মন্ত ক্ষাপা হয়ে বলে উঠল, কখ্যনো না। তুমি বানিয়ে বলছ।

আমার সত্যযুগটা আমার বানানো হতে পারে কিন্তু তোমার মুখের কথাটা তোমারই। ওটা ফস্ক করে আমি-হেন বাচালও বানাতে পারতুম না।

এর থেকে তুমি কি মনে করেছিলে আমি খুব বোকা।

এই মনে করেছিলুম যে, কাবুলি বেড়ালের উপর অত্যন্ত লোভ করেছিলে অথচ কাবুলি বেড়াল পাবার পথ তোমার ছিল না, তোমার বাবা বেড়াল জন্মটাকে দেখতে পারতেন না। আমার মতে সত্যযুগে বেড়াল কিনতেও হত না, পেতেও হত না, ইচ্ছে করলেই বেড়াল হতে পারা যেত।

মানুষ ছিলুম, বেড়াল হলুম—এতে কী সুবিধেটা হল। তার চেয়ে যে বেড়াল কেনাও ভালো, না কিনতে পারলে না পাওয়া ভালো।

ঐ দেখো, সত্যযুগের মহিমাটা মনে ধারণা করতে পারছ না। সত্যযুগের পুপে আপনার সীমানা বাড়িয়ে দিত বেড়ালের মধ্যে। সীমানা লোপ করত না। তুমি তুমিও থাকতে, বেড়ালও হতে।

তোমার এ-সব কথার কোনো মানে নেই।

সত্যযুগের ভাষায় মানে আছে। সেদিন তো তোমাদের অধ্যাপক প্রথমবাবুর কাছে শুনেছিলে, আলোকের অণুপরমাণু বৃষ্টির মতো কর্ণাবর্ষণও বটে আবার নদীর মতো তরঙ্গধারাও বটে। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝি, হয় এটা নয় ওটা; কিন্তু বিজ্ঞানের বুদ্ধিতে একই কালে দুটোকেই মেনে নেয়। তেমনি একই কালে তুমি পুপুও বটে, বেড়ালও বটে—এটা সত্যযুগের কথা।

দাদামশায়, যতই তোমার বয়স এগিয়ে চলছে ততই তোমার কথাগুলো অবোধ্য হয়ে উঠছে, তোমার কবিতারই মতো।

অবশ্যে সম্পূর্ণ নীরু হয়ে যাব তারই পূর্বলক্ষণ।

সেদিনকার কথাটা কি ঐ কাবুলি বেড়ালের পরে আর এগোল না।

এগিয়েছিল। সুকুমার এক কোণে বসে ছিল, সে স্বপ্নে কথা বলার মতো বলে উঠল, আমার ইচ্ছে করে শালগাছ হয়ে দেখতে।

সুকুমারকে উপহসিত করবার সুযোগ পেলে তুমি খুশি হতে। ও শালগাছ হতে চায় শুনে তুমি তো হেসে অস্থির। ও চমকে উঠল লজ্জায়। কাজেই ও বেচারির পক্ষ নিয়ে আমি বললেম—দক্ষিণের হাওয়া দিল কোথা থেকে, গাছটার ডাল গেল ফুরে, ওর মজ্জার ভিতর দিয়ে কী মায়ামন্ত্রের অদৃশ্য প্রবাহ বয়ে যায় যাতে ঐ কুপের গঙ্কের ভোজবাজি চলতে থাকে। ভিতরের থেকে সেই আবেগটা জানতে ইচ্ছা করে বৈকি! গাছ না হতে পারলে বসন্তে গাছের সেই অপরিমিত রোমাঞ্চ অনুভব করব কী করে।

আমার কথা শুনে সুকুমার উৎসাহিত হয়ে উঠল; বললে, আমার শোবার ঘরের জানলা থেকে যে শালগাছটা দেখা যায়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার মাথাটা আমি দেখতে পাই; মনে হয়, ও স্বপ্ন দেখছে।

শালগাছ স্বপ্ন দেখছে শুনে বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলে, কী বোকার মতো কথা। বাধা দিয়ে বলে উঠলুম, শালগাছের সমস্ত জীবনটাই স্বপ্ন। ও স্বপ্নে চলে এসেছে বীজের থেকে অঙ্কুরে, অঙ্কুর থেকে গাছে। পাতাগুলোই তো ওর স্বপ্নে-কওয়া কথা।

সুকুমারকে বললুম, সেদিন যখন সকালবেলায় ঘন মেঘ করে বৃষ্টি হচ্ছিল আমি দেখলুম, তুমি উত্তরের বারান্দায় রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলে। কী ভাবছিলে বলো দেখি।

সুকুমার বললে, জানি নে তো কী ভাবছিলুম।

আমি বললুম, সেই না-জানা ভাবনায় ভ'রে গিয়েছিল তোমার সমস্ত মন মেঘেভরা আকাশের মতো। সেইরকম গাছগুলো যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ওদের মধ্যে যেন একটা না-জানা ভাব আছে। সেই ভাবনাই বর্ধার মেঘের ছায়ায় নিবিড় হয়, শীতের সকালের রৌদ্রে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই না-জানা ভাবনার ভাষায় কঢ়ি পাতায় ওদের ডালে বকুনি জাগে, গান ওঠে ফুলের মঞ্জুরিতে।

আজও মনে পড়ে সুকুমারের চোখ দুটো কিরকম এতখানি হয়ে উঠল। সে বললে, আমি যদি গাছ হতে পারতুম তা হলে সেই বকুনি সির্সিরি করে আমার সমস্ত গা বেয়ে উঠত আকাশের মেঘের দিকে।

তুমি দেখলে সুকুমার আসরটা দখল করে নিছে। ওকে নেপথ্যে সরিয়ে তুমি এলে সামনে। কথা পাঢ়লে, আচ্ছা, দাদামশায়, এখন যদি সত্যযুগ আসে তুমি কী হতে চাও।

তোমার বিশ্বাস ছিল, আমি ম্যাস্টোডন কিংবা মেগাথেরিয়ম হতে চাইব—কেননা, জীব-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের প্রাণীদের সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে এর কিছুদিন আগেই আলোচনা করেছি। তখন তরুণ পৃথিবীর হাড় ছিল কাঁচা, পাকা রকম করে জমাট হয়ে ওঠে নি তার মহাদেশ, গাছপালাগুলোর চেহারা ছিল বিশ্বকর্তার প্রথম তুলির টানের। সেইদিনকার আদিম অরণ্যে সেইদিনকার অনিশ্চিত শীতগ্রীষ্মের অধিকারে এই-সব ভীমকায় জন্মগুলোর জীবব্যাত্রা চরছে করকম করে তা স্পষ্টরূপে কল্পনা করতে পারছে না আজকের দিনের মানুষ, এই কথাটা তোমার

শোনা ছিল আমার মুখে। পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম অভিযানের সেই মহাকাব্য-যুগটাকে স্পষ্ট করে জানবার ব্যাকুলতা তুমি আমার কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলে। তাই আমি যদি হঠাত বলে উঠতুম ‘সেকালের রঁওয়াওয়ালা চার-দাঁত-ওয়ালা হাতি হওয়া আমার ইচ্ছে’ তা হলে তুমি খুশি হতে। তোমার কাবুলি বেড়াল হওয়ার থেকে এই ইচ্ছে বেশি দূরে পড়ত না, আমাকে তোমার দলে পেতে। হয়তো আমার মুখে ঐ ইচ্ছেটাই ব্যক্ত হত। কিন্তু, সুকুমারের কথাটা আমার মনকে টেনে নিয়েছিল অন্য দিকে।

পুপে বলে উঠল, জানি জানি, সুকুমারদার সঙ্গেই তোমার মনের মিল ছিল বেশি।

আমি বললুম, তার একমাত্র কারণ, ও ছিল ছেলে, আমিও ছেলে হয়েই জন্মেছিলুম একদিন। ওর ভাবনার ছাঁচ ছিল আমারই শিশু ভাবনার ছাঁচে। তুমি সেদিন তোমার খেলার ইঁড়িকুঁড়ি নিয়ে ভাবী গৃহস্থালির যে স্বপ্নলোক বানিয়ে তুলে খুশি হতে সেটা দেখতে পেতুম একটু তফাত থেকে। তুমি তোমার খেলার খোকাকে কোলে করে যখন নাচাতে, তার মেহের রস্টা ঘোলো-আনা পাবার সাধ্য আমার ছিল না।

পুপু বললে, আজ্ঞা, সে কথা থাক, সেদিন তুমি কী হতে ইচ্ছে করেছিলে বলো।

আমি হতে চেয়েছিলুম, একখানা দৃশ্য অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সকালবেলার প্রথম প্রহর, মাঘের শেষে হাওয়া হয়েছে উত্তলা, পুরোনো অশথগাছটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে ছেলেমানুষের মতো, নদীর জলে উঠেছে করলব, উচুনিচু ডাঙায় বাপসা দেখাচ্ছে দলবাঁধা গাছ। সমন্টটা পিছনে খোলা আকাশ ; সেই আকাশে একটা সুদূরতা, মনে হচ্ছে যেন অনেক দূরের ও-পারে থেকে একটা ঘন্টার ধ্বনি ক্ষীণতম হয়ে গেছে বাতাসে, যেন রোদুরে শিশিরে দিয়েছে তার কথাটাকে ; বেলা যায়। তোমার মুখ দেখে বোঝা গেল। এককানা গাছ হাওয়ার চেয়ে নদী বন আকাশ নিয়ে একখানা সমগ্র ভূদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কল্পনা তোমার কাছে অনেক বেশি সৃষ্টিছাড়া বোধ হল।

সুকুমার বললে, গাছপালা নদী সবটার উপরে তুমি ছড়িয়ে মিলিয়ে গেছ মনে করতে আমার ভাবি মজা লাগছে। আজ্ঞা, সত্যযুগ কি কোনোদিন আসবে।

যতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে, কবিতা আছে। আপনাকে ভুলে গিয়ে আর-কিছু হয়ে যাবার ঐ একটা বড়ো রাস্তা।

সুকুমার বললে, তুমি যেটা বললে ওটা কি ছবিতে এঁকেছ।

হ্যাঁ, এঁকেছি।

আমিও একটা আঁকব।

সুকুমারের স্পর্ধার কথা শুনে তুমি বলে উঠলে, পারবে না কি তুমি আঁকতে।

আমি বললুম, ঠিক পারবে। আঁকা হয়ে গেলে ভাই, তোমারটা আমি নেব,  
আমারটা তোমাকে দেব।

সেদিন এই পর্যন্ত হল আমাদের আলাপ।

এইবার আমাদের সেদিনকার আসরের শেষ কথাটা বলে নিই। তুমি চলে  
গেলে তোমার পায়রাকে ধান খাওয়াতে। সুকুমার তখনো বসে বসে কী ভাবতে  
লাগল। আমি তাকে বললুম, তুমি কী ভাবছ বলব?

সুকুমার বললে, বলো দেখি।

তুমি ভেবে দেখছ, আরো কী হয়ে যেতে পারলে ভালো হয়—হয়তো  
প্রথম-মেঘকরা আষাঢ়ের বৃষ্টি-ভেজা আকাশ, হয়তো পুজোর ছুটিতে ঘরমুখো  
পাল-তোলা পাসিনৌকোখানি। এই উপলক্ষে আমি তোমাকে আমার জীবনের  
একটা কথা বলি। তুমি জান ধীরুকে আমি কত ভালোবাসতুম। হঠাৎ টেলিথামে  
খবর পেলুম তার টাইফয়েড, সেই বিকেলেই চলে গেলুম মুসিগঞ্জে তাদের  
বাড়িতে। সাত দিন, সাত রাত কাটল। সেদিন ছিল অত্যন্ত গরম, রৌদ্র প্রথর।  
দূরে একটা কুকুর কর্কশ সুরে আর্তনাদ করে উঠছিল; শুনে মন খারাপ হয়ে যায়।  
বিকেলে রোদ পড়ে আসছে, পশ্চিম দিক থেকে ডুমুরগাছের ছায়া পড়েছে বারান্দার  
উপরে। পাড়ার গয়লানি এসে জিগেস করলে, তোমাদের খোবাবাবু কেমন আছে  
গা। আমি বললুম, মাথার কষ্ট, গা-জুলা আজ কমেছে। যারা সেবা করছিল তারা  
আজ কেউ কেউ ছুটি নেবার অবকাশ পেলে। দুজন ডাঙ্কার রঞ্জি দেখে বেরিয়ে  
এসে ফিসু ফিসু করে কী পরামর্শ করলে; বুবলেম, আশাৰ লক্ষণ নয়। চুপ করে  
বসে রইলুম; মনে হল, কী হবে শুনে। সায়াহের ছায়া ঘনিয়ে এল। দেখা গেল  
সামনের মহানিমগাছের মাথার উপরে সক্ষ্যাতারা দেখা দিয়েছে। দূরের বাস্তায়  
পাট-বোৰাই গোরুর গাড়ির শব্দ আৱ শোনা যায় না। সমস্ত আকাশটা যেন  
ঝিমঝিম করছে। কী জানি কেন মনে বলছি, পশ্চিম-আকাশ থেকে ঐ আসছে  
ৱাত্রিকপীণী শান্তি, স্থিষ্ঠ, কালো, স্তুত। প্রতিদিনই তো আসে কিন্তু আজ এল বিশেষ  
একটি মূর্তি নিয়ে, স্পৰ্শ নিয়ে। চোখ বুঁৰো সেই ধীরে-চলে-আসা ৱাত্রির আবিৰ্ভাৰ  
আমার সমস্ত অঙ্গকে মনকে যেন আবৃত করে দিলে। মনে মনে বললুম, ওগো  
শান্তি, ওগো ৱাত্রি, তুমি আমার দিদি, আমার অনাদি কালের দিদি। দিন-অবসানের  
দৱজার কাছে দাঁড়িয়ে টেনে নাও তোমার বুকের কাছে আমার ধীরুভাইকে; তার  
সকল জুলা যাক জুড়িয়ে একেবারে।—দুই পহু পেরিয়ে গেল; একটা কান্নার  
ধ্বনি উঠল রোগীৰ শিয়াৰের কাছ থেকে; নিষ্ঠক রাস্তা বেয়ে গেল চলে ডাঙ্কারের  
গাড়ি তার ঘৰে ফিরে। সেদিন আমার সমস্ত-মন-ভৱা একটি ৱাত্রিৰ রূপ দেখেছি;  
আমি তাতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলুম, পৃথিবী যেমন তার স্বাতন্ত্র্য মিলিয়ে দেয়  
নিশ্চাথের ধ্যানাবৰণে।

কী জানি সুকুমারের কী মনে হল; সে অধীর হয়ে বলে উঠল, আমাকে কিন্তু  
তোমার ঐ দিদি অক্ষকারের ভিতৰ দিয়ে অমন চুপিচুপি নিয়ে যাবে না। পুজোৱ

ছুটির দিনে যেদিন সকাল দশটা বাজবে, কাউকে ইঙ্গুলে যেতে হবে না, ছেলেরা সবাই যেদিন গেছে রথতলার মাঠে ব্যাট্বল খেলতে, সেইদিন আমি খেলার মতো করেই হঠাৎ মিলিয়ে যাব আকাশে ছুটির দিনের রোদ্দুরে ।

ওনে আমি চুপ করে রইলুম ; কিছু বললুম না ।

পুপেদিদি বললে, কাল থেকে সুকুমারদার কথা তুমি প্রায়ই বলছ । তার মধ্যে আমার উপরে একটুখানি খোঁচা থাকে তুমি কি মনে কর তোমার ভালোবাসার অংশ নিয়ে সুকুমারদার সঙ্গে আমার ছেলেবেলাকার যে ঝগড়া ছিল সেটা এখনো আছে ।

হয়তো একটুখানি আছে বা । সেইটকে একেবারে ক্ষইয়ে দেব বলেই বার বার তার কথা তুলি । আরো একটুখানি কারণ আছে ।

কী কারণ বলোই-না ।

কিছুদিন আগে সুকুমারের বাবা ডাঙ্কার নিতাই এসেছিলেন আমার কাছে বিদায় নিতে ।

কেন, বিদায় নিতে কেন ।

তোমাকে বলব মনে করেছিলুম, বলা হয় নি । আজ বলি । নিতাই চাইলে সুকুমার আইন পড়ে, সুকুমার চাইলে সে ছবি আঁকা শেখে নন্দলালবাবুর কাছে । নিতাই বললে, ছবি আঁকা বিদ্যেয় আঙুল চলে, পেট চলে না ।

সুকুমার বললে, আমার ছবির খিদে যত পেটের খিদে তত বেশি নয় ।

নিতাই কিছু কড়া করে বললে, সে কথাটা তোমার প্রমাণ করে দেবার দরকার হয় নি, পেট সহজেই চলে যাচ্ছে ।

কথাটা বিশ্বী লাগল তার মনে, কিন্তু হেসে বললে, কথাটা সত্যি—এর প্রমাণ দেওয়া উচিত ।

বাবা ভাবলে, এইবার ছেলে আইন পড়তে বসবে । সুকুমারের বরিশালের মাতামহ খেপা গোছের মানুষ ; সুকুমারের স্বভাবটা তাঁরই ছাঁচের, চেহারাও সাদৃশ্য আছে । দুজনের 'পরে দুজনের ভালোবাসা পরম বক্তুর মতো । পরামর্শ হল দুজনে মিলে ; সুকুমার টাকা পেল কিছু, কখন চলে গেল বিলেতে কেউ জানে না । বাবাকে চিঠি লিখে গেল, আপনি চান না আমি ছবি আঁকা শিখি, শিখব না । আপনি চান অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করব, তাই করতে চললুম । যখন সমাঞ্ছ হবে প্রণাম করতে আসব, আশীর্বাদ করবেন ।

কোন্ বিদ্যে শিখতে গেল কাউকে বলে নি । একটা ডায়ারি পাওয়া গেল তার ডেক্সে । তার থেকে বোঝা গেল, সে যুরোপে গেছে উড়ো জাহাজের মাঝিগিরি শিখতে । তার শেষ দিকটা কপি করে এনেছি । ও লিখছে—

মনে আছে, একদিন আমার ছত্রপতি পঙ্কজীরাজে চড়ে পুপুদিদিকে চন্দলোক থেকে উদ্ধার করতে যাত্রা করেছিলুম আমাদের ছাদের এক ধার থেকে আর-এক ধারে । এবার চলেছি কলের পঙ্কজীরাজকে বাগ মানাতে । যুরোপে চন্দলোকে যাবার

আয়োজন চলেছে। যদি সুবিধা পাই যাত্রীর দলে আমিও নাম লেখাব। আপাতত পৃথিবীর আকাশ-প্রদক্ষিণে হাত পাকিয়ে নিতে চাই। একদিন আমি তার দাদামশায়ের দেখাদেখি যে ছবি একেছিলুম, দেখে পুপুদিনি হেসেছিল। সেইদিন থেকে দশ বছর ধরে ছবি আঁকা অভ্যাস করেছি, কাউকে দেখাই নি। এখনকার আঁকা দুখানা ছবি রেখে গেলুম পুপের দাদামশায়ের জন্যে। একটা ছবি জল-স্তুল-আকাশের একতান সংগত নিয়ে, আর-একটা আমার বরিশালের দাদামশায়ের। পুপের দাদামশায় ছবি দুটো দেখিয়ে পুপেদিনির সেদিনকার হ্যাসি যদি ফিরিয়ে নিতে পারেন তো ভালোই, নইলে যেন ছিঁড়ে ফেলেন। আমার এবারকার যাত্রায় চন্দ্রলোকের মাঝপথেই পক্ষীরাজের পাখা ভাঙ্গা অসম্ভব নয়। যদি ভাঙ্গে তবে এক নিমেষে সত্যলোকে পৌছব, সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে একেবারে মিলে যাব পৃথিবীর সঙ্গে। যদি বেঁচে থাকি, আকাশের খেয়া-পারাপারে যদি নৈপুণ্য ঘটে, তা হলে একদিন পুপুদিনিকে নিয়ে শূন্যপথে পাড়ি দিয়ে আসব, মনে এই ইচ্ছে রইল। সত্যযুগে বোধ হয় ইচ্ছে আর ঘটনা একই ছিল। চেষ্টা করব ধ্যানযোগে ইচ্ছেকেই ঘটনা বলে ধরে নিতে। ছেলেবেলা থেকে অকারণে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার অভ্যাস। ঐ আকাশটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছে দিয়ে পূর্ণ। এই বিলীয়মান ইচ্ছেগুলো বিশ্বসৃষ্টির কোনু কাজে লাগে কী জানি। বেড়াক উড়ে আমার দীর্ঘনিশ্চাসে উৎসারিত ইচ্ছেগুলো সেই আকাশেই যে আকাশে আজ আমি উড়তে চলেছি।

পুপুদিনি ব্যাকুল হয়ে উঠে জিগেস করলে, সুকুমারদার এখনকার খবর কী।

আমি বললুম, সেইটেই পাওয়া যাচ্ছে না বলেই তার বাবা বিলেতে সকান করতে চলেছেন।

বির্বণ হয়ে গেল দিদির মুখ। আন্তে আন্তে উঠে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলে।

আমি জানি, সুকুমারের আঁকা সেই ছেলেমানুষি পুপুদিনি আপন ডেকে লুকিয়ে রেখেছে।

আমি চশমাটা মুছে ফেলে চলে গেলুম সুকুমারদের বাড়ির ছাদে। সেই ভাঙ্গ ছাতাটা সেখানে নেই, নেই সেই আতসবাজির আধপোড়া কাঠি।

## ଗନ୍ଧସନ୍ଧ



ଶତିଷ୍ଠାପନାତ୍ମକ

নন্দিতাকে

শেষ পারানির খেয়ায় ভূমি  
দিনশেষের নেয়ে  
অনেক জানার থেকে এলে  
নৃতন-জানা মেয়ে।  
ফেরাবে মুখ যাবে যখন  
ঘাটের পারে আনি,  
হয়তো হাতে দিয়ে যাবে  
রাতের প্রদীপখানি।

১২ মার্চ ১৯৪১

আমারে পড়েছে আজ ডাক,  
কথা কিছু বলতেই হবে।  
বিশ্বাস করা পড়ে থাক,  
পর যদি মন নাও তবে।  
ফিসুফিস্য কর যদি ব'সে  
থস্খস্ মেজেতে পা ষ'ষে—  
অভ্যাস হয়ে গেছে এ ব্যাঘাত যত,  
যেন কিছু হয় নাই থাকি এইমতো।  
গঞ্জির হয়ে করি প্রফেটের ভান;  
তনে যে ঘুমিয়ে পড়ে সে বুদ্ধিমান।

আমাদের কাল থেকে ভাই,  
এ কালটা আছে বহু দুরে—  
মোটা মোটা কথাগুলো তাই  
ব'লে থাকি খুব মোটা সুরে।  
পিছনেতে লাগে নাকো ফেউ  
বৃক্ষের প্রতি সম্মানে,  
মারতে আসে না ছুটে কেউ  
কথা যদি নাও লয় কানে।  
বিধাতা পরিয়ে দিল আজ  
নারদমুনির এই সাজ।  
তাই তো নিয়েছি কাজ উপদেষ্টার;  
এ কাজটা সবচেয়ে কম চেষ্টার।

তবে শোনো—মন্দ সে মন্দই,  
হোক-না সে শপিনাথ, হোক-না সে নন্দই।  
আর শোনো—ভালো যে সে ভালো,  
চোখ তার কটা হোক, হোক বা সে কালো।  
অল্প যা বললেম দেবো তাই ভেবে,  
পাছে ভুলে যাও তাই নোট লিখে নেবে।  
যদি বল, পুরাতন এই কথাগুলো—  
আমিও যে পুরাতন সেটা নাহি ভুলো।

৮ মার্চ ১৯৪০

## বিজ্ঞানী

দাদামশায়, নীলমণিবাবুকে তোমার এত কেন ভালো লাগে আমি তো বুঝতে পারি নে।

এই প্রশ্নটা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত প্রশ্ন, এর ঠিক উত্তর ক'জন লোক দিতে পারে।

তোমার হেঁয়ালি রাখো। অমন এলোমেলো আলুখালু অগোছালো লোককে মেয়েরা দেখতে পারে না।

ওটা তো হল সাটিফিকেট, অর্থাৎ লোকটা খাঁটি পুরুষমানুষ।

জান না তুমি, উনি কথায় কথায় কী রকম হলুস্তুল বাধিয়ে তোলেন। হাতের কাছে যেটা আছে সেটা ওঁর হাতেই ঠেকে না। সেটা উনি খুঁজে বেড়ান পাড়ায় পাড়ায়।

ভক্তি হচ্ছে তো লোকটার উপরে।

কেন শুনি।

হাতের কাছের জিনিসটাই যে সবচেয়ে দূরের সে ক'জন লোক জানে, অথচ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে।

একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেরি।

যেমন তুমি।

আমাকে তুমি খুঁজে পাও নি বুবি?

খুঁজে পেলে যে রস মারা যেত, যত খুঁজছি তত অবাক হচ্ছি।

আবার তোমার হেঁয়ালি।

উপায় নেই। দিদি, আমার কাছে আজও তুমি সহজ নও, নিত্যি নৃতন।

কুসমি দাদামশায়ের গলা জড়িয়ে বললে, দাদামশায়, এটা কিন্তু শোনাচ্ছে ভালো। কিন্তু, ও কথা থাক্। নীলুবাবুর বাড়িতে কাল কী রকম হলুস্তুল বেধেছিল সে খবরটা বিধুমামার কাছে শোনো-না।

কী গো মামা, কী হয়েছিল শুনি।

অন্তু—বিধুমামা বললেন, পাড়ায় রব উঠল নীলুবাবুর কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না; খোঁজ পড়ে গেল মশারির চালে পর্যন্ত। ডেকে পাঠালে পাড়ার মাধুবাবুকে।

বললে, ওহে মাধু, আমার কলমটা?

মাধুবাবু বললেন, জানলে খবর দিতুম।

ধোবাকে ডাক পড়ল, ডাক পড়ল হারং নাপিতকে। বাড়িসুন্দ সবাই যখন হাল

ছেড়ে দিয়েছে তখন তার ভাগ্নে এসে বললে, কলম যে তোমার কানেই আছে গোঁজা।

যখন কোনো সন্দেহ রইল না তখন ভাগ্নের গালে এক চড় মেরে বললে, বোকা কোথাকার, যে কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না সেটাই খুঁজছি।

বান্নাঘর থেকে স্ত্রী এল বেরিয়ে; বললে, বাড়ি মাথায় করেছ যে।

নীলু বললে, যে কলমটা চাই ঠিক সেই কলমটা খুঁজে পাচ্ছি না।

বউদি বললে, যেটা পেয়েছ সেই দিয়েই কাজ চালিয়ে নও, যেটা পাও নি সেটা কোথাও পাবে না।

নীলু বললে, অন্তত সেটা পাওয়া যেতে পারে কুণ্ডের দোকানে।

বউদি বললে, না গো, দোকানে সে মাল মেলে না।

নীলু বললে, তা হলে সেটা চুরি গিয়েছে।

তোমার সব জিনিসই তো চুরি গিয়েছে, যখন চোখে পাও না দেখতে। এখন চুপচাপ করে এই কলম নিয়েই লেখো, আমাকেও কাজ করতে দাও। পাড়াসুন্দ অঙ্গির করে তুলেছ।

আমান্য একটা কলম পাব না কেন শুনি।

বিনি পয়সায় মেলে না বলে।

দেব টাকা — ওরে ভূতো।

আজ্ঞে —

টাকার থলিটা যে খুঁজে পাচ্ছি না।

ভূতো বললে, সেটা যে ছিল আপনার জামার পকেটে।

তাই নাকি।

পকেট খুঁজে দেখলে থলি আছে, থলিতে টাকা নেই। টাকা কোথায় গেল।

খুঁজতে বেরোল টাকা। ডেকে পাঠালে ধোবাকে।

আমার পকেটের থলি থেকে টাকা গেল কোথায়।

ধোবা বললে, আমি কী জানি। ও জামা আমি কাচি নি।

ডাকল ওসমান দর্জিকে।

আমার থলি থেকে টাকা গেল কোথায়।

ওসমান রেগে উঠে বললে, আছে আপনার লোহার সিন্দুকে।

জামাইবাড়ি থেকে স্ত্রী ফিরে এসে বললে, হয়েছে কী।

নীলমণি বললে, বাড়িতে ডাকাত পুষেছি। পকেট থেকে টাকা নিয়ে গেছে।

স্ত্রী বললে, হয় রে কপাল — সেদিন যে বাড়িওয়ালাকে বাড়িভাড়া শোধ করে দিলে ৩৫ টাকা।

তাই নাকি। বাড়িওয়ালা যে বাড়ি ছাড়বার জন্য আমাকে নোটিস পাঠিয়েছিল।

ভূমি ভাড়া শোধ করে দিয়েছিলে তার পরেই।

সে কী কথা। আমি যে বাদুড়-বাগানে নিমচ্ছাদ হালদারের কাছে গিয়ে তার বাড়ি ভাড়া নিয়েছি।

স্ত্রী বললে, বাদুড়-বাগান, সে আবার কোন্ চুলোয় ।

নীলমণি বললে, রোসো, ভেবে দেখি । সে যে কোন্ গলিতে কোন্ নম্বরে তা তো মনে পড়ছে না । কিন্তু লোকটির সঙ্গে লেখাপড়া হয়ে গেছে—দেড় বছরের জন্য ভাড়া নিতে হবে ।

স্ত্রী বললে, বেশ করেছ, এখন দুটো বাড়ির ভাড়া সামলাবে কে ।

নীলমণি বললে, সেটা তো ভাবনার কথা নয় । আমি ভাবছি কোন্ নম্বর, কোন্ গলি । আমার নোট-বুকে বাদুড়-বাগানের বাসা লেখা আছে । কিন্তু, মনে পড়ছে না, গলিটার নম্বর লেখা আছে কি না ।

তা, তোমার নোট-বইটা বের করো-না ।

মুশকিল হয়েছে যে, তিন দিন ধরে নোট-বইটা খুঁজে পাচ্ছি না ।

ভাগ্নে বললে, মামা, মনে নেই? সেটা যে তুমি দিদিকে দিয়েছিলে স্কুলের কপি লিখতে ।

তোর দিদি কোথায় গেল ।

তিনি তো গেছেন এলাহাবাদে মেসোমশায়ের বাড়িতে ।

মুশকিলে ফেললি দেখছি । এখন কোথায় খুঁজে পাই, কোন্ গলি, কোন্ নম্বর ।

এমন সময়ে এসে পড়ল নিমচ্চাঁদ হালদারের কেরানি । সে বললে, বাদুড়বাগানের বাড়ির ভাড়া চাইতে এসেছি ।

কোন্ বাড়ি ।

সেই যে ১৩ নম্বর শিবু সমাদারের গলি ।

বাঁচা গেল, বাঁচা গেল । শুনছ, গিন্নি? ১৩ নম্বর শিবু সমাদারের গলি । আর ভাবনা নেই ।

শুনে আমার মাথামুছু হবে কী ।

একটা ঠিকানা পাওয়া গেল ।

সে তো পাওয়া গেল । এখন দুটো বাড়ির ভাড়া সামলাবে কেমন করে ।

সে কথা পরে হবে । কিন্তু, বাড়ির নম্বর ১৩, গলির নাম শিবু সমাদারের গলি ।

কেরানির হাত ধরে বললে, ভায়া বাঁচালে আমাকে । তোমার নাম কী বলো, আমি নোট-বইয়ে লিখে রাখি ।

পকেট চাপড়ে বললে, ঐ যা । নোট-বই আছে এলাহাবাদে । মুখস্থ করে রাখব—১৩ নম্বর, শিবু সমাদারের গলি ।

কুসমি বললে, এই কলম হারানো ব্যাপারটা তো সামান্য কথা । যেদিন ওঁর একপাটি চটিজুতো পাওয়া যাচ্ছিল না, সেদিন নীলমণিবাবুর ঘরে কী ধূস্তুমারই বেধে গিয়েছিল ! ওঁর স্ত্রী পণ করলেন, তিনি বাপের বাড়ি চলে যাবেন । ঢাকর-বাকররা একজোট হয়ে বললে, যদি একপাটি চটিজুতো নিয়ে তাদের সন্দেহ করা হয় তবে তারা কাজে ইন্তফা দেবে—তার উপরে সে চঢ়িতে তিন তালি দেওয়া ।

আমি বললুম, খবরটা আমারও কানে এসেছিল; দেখলেম ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে । গেলুম নীলুর বাড়িতে । বললুম, ভায়া, তোমার চটি হারিয়েছে?

সে বললে, দাদা, হারায় নি, চুরি গিয়েছে, আমি তার প্রমাণ দিতে পারি।

প্রমাণের কথা তুলতেই আমি ভয় পেয়ে গেলুম। লোকটা বৈজ্ঞানিক; একটা দুটো তিনটে করে যখন প্রমাণ বের করতে থাকবে আমার নাওয়া-খাওয়া যাবে ঘুচে। আমাকে বলতে হল, নিশ্চয় চুরি গিয়েছে। কিন্তু এমন আশ্চর্য চোরের আড়ডা কোথায় যে একপাটি চটি চুরি করে বেড়ায়, আমার জানতে ইচ্ছে করে।

নীলু বললে, ঐটেই হচ্ছে তর্কের বিষয়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, চামড়ার বাজার ঢঙে গিয়েছে।

আমি দেখলুম, এর উপরে আর কথা চলবে না। বললুম, নীলুভাই, তুমি আসল কথাটি ধরতে পেরেছ। আজকালকার দিনে সবই বাজার নিয়ে। তাই আমি দেখেছি, মল্লিকদের দেউড়িতে পাঁচ-সাত দিন অন্তর মুঠি আসে দরোয়ানজির নাগরা জুতোয় সুকতলা বসাবার ভান ক'রে। তার দৃষ্টি রাস্তার লোকদের পায়ের দিকে।

তখনকার মতো তাকে আমি ঠাণ্ডা করেছিলুম। তার পরে সেই চটি বেরোল বিছানার নীচে থেকে। নীলুর পেয়ারের কুকুর সেটা নিয়ে আনলে ছেঁড়াছেঁড়ি করেছে। নীলুর সবচেয়ে দুঃখ হল এই চটির সন্ধান পেয়ে, তার প্রমাণ গেল মারা।

কুসমি বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, মানুষ এতবড়ো বোকা হয় কী করে।

আমি বললুম, অমন কথা বোলো না দিদি, অঙ্কশান্ত্রে ও পণ্ডিত। অঙ্ক কষে ওর বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম হয়েছে যে, সাধারণ লোকের চোখে পড়ে না।

কুসমি নাক তুলে বললে, ওর অঙ্ক নিয়ে কী করছেন উনি।

আমি বললুম, আবিষ্কার। চটি কেন হারায় সেটা উনি সব সময়ে খুঁজে পান না, কিন্তু চাঁদের গ্রহণ লাগায় সিকি সেকেভ দেরি কেন হয়, এ তাঁর অঙ্কের ডগায় ধরা পড়বেই। আজকাল তিনি প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন যে, জগতে গ্রহ তারা কোনো জিনিসই ঘূরছে না, তারা কেবলই লাফাছে। এ জগতে কোটি কোটি উচিংড়ে ছাড়া পেয়েছে। এর অকাট্য প্রমাণ রয়েছে ওর খাতায়। আমি আর কথা কই নে, পাছে সেগুলো বের করতে থাকেন।

কুসমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললে, ওর কি সবই অনাসৃষ্টি। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে উচিংড়ের লাফ মেপে মেপে অঙ্ক কষছেন! এ না হলে ওর এমন দশা হবে কেন।

আমি বললুম, ওর ঘরকন্না ঘূরতে ঘূরতে চলবে না, তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাফাতে চলবে।

কুসমি বললে, এতক্ষণে বুঝলুম, এ লোকটার কলমই বা হারায় কেন, এক-পাটি চটিই বা পাওয়া যায় না কেন, আর তুমই বা কেন ওঁকে এত ভালোবাস। যত পাগলের উপরে তোমার ভালোবাসা, আর তারাই তোমার চার দিকে এসে জোটে।

দেখো দিদি, সবশেষে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। তুমি ভাবছ, নীলু লক্ষ্মীছাড়াকে নিয়ে তোমার বউদি রেগেই আছেন। গোপনে তোমাকে জানাচ্ছি—একেবারে তার উল্টো। ওর এই এলোমেলো আলুথালু ভাব দেখেই তিনি মুঢ় আমারও সেই দশা।

পাঁচটা না বাজতেই ভুলুরাম শৰ্মা সে  
 টেরিটি বাজারে গেল মনিবের ফরমাশে ।  
 মরেছে অতুল মামা, আজি তারি শ্রাদ্ধের  
 জোগাড় করতে হবে নানাবিধ খাদ্যের ।  
 বাবু বলে, ভুলো না হে, আরো চাই দরূমা ।  
 ভোলা কি সহজ কথা, বলে ভুলু শৰ্মা ।  
 কাঁক্রোল কিনে বসে কাঁচকলা কিনতে ।  
 শাকআলু কচু কিনা পারে না সে চিনতে ।  
 বকুনি খেয়েছে হেই মাছওলা মিন্সের,  
 তাড়াতাড়ি কিনে বসে কামরাঙ্গা তিন সের ।  
 বাবু বলে, কানে আমি শুনি নাই তবে কি ।  
 ভুলু বলে, কিনছে যে ও পাড়ার সরকার,  
 বুঝলেম নিশ্চয় আছে এর দরকার ।  
 কানে গঁজে নিয়ে তার হিসাবের লেখনী  
 বাবু বলে, ফিরে দিয়ে এসো তুমি এখনি ।  
 মনিবের ছুকুমটা তনল সে হাঁ ক'রে,  
 ফিরে দিতে চ'লে গেল কিছু দেরি না ক'রে ।  
 বললে সে, দোকানিকে যা করেছি জদ—  
 ফলগুলো ফিরে নিতে করে নি টুঁ শব্দ ।  
 বাবু কয় 'টাকা কই' টান দিয়ে তামাকে ।  
 ভুলু বলে, সে কথাটা বল নি তো আমাকে ।  
 এসেছি উজাড় ক'রে বাজারের বুড়িটা—  
 দোকানির মাসি ছিল, হেসে খুন বুড়িটা ।

## রাজার বাড়ি

কুসমি জিগেস করলে, দাদামশায়, ইরুমাসির বোধ হয় খুব বুদ্ধি ছিল ।  
 ছিল বৈকি, তোর চেয়ে বেশি ছিল ।  
 থমকে গেল কুসমি । অল্প একটু দীর্ঘনিষ্ঠাস ফেলে বললে, ওঃ, তাই বুঝি  
 তোমাকে এত করে বশ করেছিলেন?  
 তুই যে উল্টো কথা বললি, বুদ্ধি দিয়ে কেউ কাউকে বশ করে?  
 তবে?  
 করে অবুদ্ধি দিয়ে । সকলেরই মধ্যে এক জায়গায় বাসা করে থাকে একটা

বোকা, সেইখানে ভালো করে বোকামি চালাতে পারলে মানুষকে বশ করা সহজ হয়। তাই তো ভালোবাসাকে বলে মন ভোলানো।

কেমন করে করতে হয় বলো-না।

কিছু জানি নে, কী যে হয় সেই কথাই জানি, তাই তো বলতে যাচ্ছিলুম।  
আচ্ছা, বলো।

আমার একটা কাঁচামি আছে, আমি সব-তাতেই অবাক হয়ে যাই; ইরুঁ ঐখানেই পেয়ে বসেছিল। সে আমাকে কথায় কথায় কেবল তাক লাগিয়ে দিত।

কিন্তু, ইরুমাসি তো তোমার চেয়ে ছোটো ছিলেন।

অন্তত বছর খানেক ছোটো। কিন্তু আমি তার বয়সের নাগাল পেতুম না; এমন করে আমাকে চালাত, যেন আমার দুধে-দাঁত ওঠে নি। তার কাছে আমি হাঁ করেই থাকতুম।

ভারি মজা।

মজা বৈকি। তার কোনো-এক সাতমহল রাজবাড়ি নিয়ে সে আমাকে ছট্টফটিয়ে তুলেছিল। কোনো ঠিকানা পাই নি। একমাত্র সেই জানত রাজার বাড়ির সন্ধান। আমি পড়তুম থার্ড নম্বর রীডার; মাস্টারমশায়কে জিগ্গেস করেছি, মাস্টারমশায় হেসে আমার কান ধরে টেনে দিয়েছেন।

জিগ্গেস করেছি ইরুকে, রাজবাড়িটা কোথায় বলো-না।

সে চোখ দুটো এতখানি করে বলত, এই বাড়িতেই।

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতুম হাঁ করে; বলতুম, এই বাড়িতেই!—কোন্খানে আমাকে দেখিয়ে দাও-না।

সে বলত, মন্ত্র না জানলে দেখবে কী করে।

আমি বলতুম, মন্ত্র আমাকে বলে দাও-না। আমি তোমাকে আমার কাঁচাআম-কাটা খিনুকটা দেব।

সে বলত, মন্ত্র বলে দিতে মানা আছে।

আমি জিগ্গেস করতুম, বলে দিলে কী হয়।

সে কেবল বলত, ও বাবা!

কী যে হয় জানাই হল না।—তার ভঙ্গি দেখে গা শিউরে উঠত। ঠিক করেছিলুম, একদিন যখন ইরু রাজবাড়িতে যাবে আমি যাব লুকিয়ে লুকিয়ে তার পিছনে পিছনে। কিন্তু সে যেত রাজবাড়িতে আমি যখন যেতুম ইঙ্গুলে। একদিন জিগ্গেস করেছিলুম, অন্য সময় গেলে কী হয়। আমার সেই ‘ও বাবা’। পীড়াপীড়ি করতে সাহসে কুলোত না।

আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে ইরু খুব একটা-কিছু মনে করত। হয়তো একদিন ইঙ্গুল থেকে আসতেই সে বলে উঠেছে, উঃ, সে কী পে়লায় কাও।

ব্যস্ত হয়ে জিগ্গেস করেছি, কী কাও।

সে বলেছে, বলব না।

ভালোই করত — কানে শুনতুম কী একটা কাণ, মনে বরাবর রয়ে যেত পে়ল্লায় কাণ।

ইরু গিয়েছে হস্ত-দন্তের মাঠে, যখন আমি ঘুমোতুম। সেখানে পক্ষীরাজ ঘোড়া চরে বেড়ায়, মানুষকে কাছে পেলেই সে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যায় মেঘের মধ্যে।

আমি হাততালি দিয়ে বলে উঠতুম, সে তো বেশ মজা।

সে বলত, মজা বৈকি! ও বাবা!

কী বিপদ ঘটতে পারত শোনা হয় নি, চুপ করে গেছি মুখের ভঙ্গি দেখে। ইরু দেখেছে পরীদের ঘরকল্লা — সে বেশি দূরে নয়। আমাদের পুকুরের পুর পাড়িতে যে চীনে বট আছে তারই মোটা মোটা শিকড়গুলোর অঙ্কাকার ফাঁকে ফাঁকে। তাদের ফুল তুলে দিয়ে সে বশ করেছিল। তারা ফুলের মধু ছাড়া আর কিছু খায় না। ইরুর পরী-বাড়ি যাবার একমাত্র সময় ছিল দক্ষিণের বারান্দায় যখন নীলকমল মাস্টারের কাছে আমাদের পড়া করতে বসতে হত।

ইরুকে জিগ্গেস করতুম, অন্য সময় গেলে কী হয়।

ইরু বলত, পরীরা প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায়।

আরো অনেক কিছু ছিল তার অবাক-করা ঝুলিতে। কিন্তু, সবচেয়ে চমক লাগাত সেই না-দেখা রাজবাড়িটা। সে যে একবারে আমাদের বাড়িতেই, হয়তো আমার শোবার ঘরের পাশেই। কিন্তু, মন্ত্র জানি নে যে। ছুটির দিনে দুপুর বেলায় ইরুর সঙ্গে গেছি আমতলায়, কাঁচা আম পেড়ে দিয়েছি, দিয়েছি তাকে আমার বহুমূল্য ঘষা ঝিনুক। সে খোসা ছাড়িয়ে শুল্পো শাক দিয়ে বসে বসে খেয়েছে কাঁচা আম, কিন্তু মন্ত্রের কথা পাড়লেই বলে উঠেছে, ও বাবা!

তার পরে মন্ত্র গেল কোথায়, ইরু গেল শৃঙ্খলবাড়িতে আমারও রাজবাড়ি খৌজ করবার বয়স গেল পেরিয়ে — এই বাড়িটা রয়ে গেল গর-ঠিকানা। দূরের রাজবাড়ি অনেক দেখেছি, কিন্তু ঘরের কাছের রাজবাড়ি — ও বাবা!

\* \* \*

খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে, মুখটা শুকোনো।

মা বলে দেখ, ওই আকাশে আছে লুকোনো।

খোকা শুধোয়, ঘরের থেকে গেল কী করৈ।

মা বলে যে, ওই তো মেঘের থলিটা ভ'রে

নিয়ে গেছে ইন্দুলোকের শাসন-ছেঁড়া ছেলে।

খোকা বলে, কখন এল, কখন খবর পেলে।

মা বললে, ওরা এল যখন সবাই মিলি

চৌধুরিদের আমবাগানে লুকিয়ে গিয়েছিল,

যখন ওদের ফলগুলো সব করলি বেবাক নষ্ট।

মেঘলা দিনে আলো তখন ছিল নাকো পষ্ট —

গাছের ছায়ার চাদর দিয়ে এসেছে মুখ ঢেকে,  
 কেউ আমরা জানি নে তো কজন তারা কে কে ।  
 কুকুরটাও ঘুমোছিল লেজেতে মুখ উঁজে,  
 সেই সুযোগে ছুপিছুপি গিয়েছে ঘর খুঁজে ।  
 আমরা ভাবি, বাতাস বুঝি লাগল বাঁশের ডালে,  
 কাঠবেড়ালি ছুটছে বুঝি আটচালাটার চালে ।  
 তখন দিঘির বাঁধ ছাপিয়ে ছুটছে মাঠে জল,  
 মাছ ধরতে হো হো রবে জুটছে মেঘের দল ।  
 তালের আগা ঝড়ের তাড়ায় শূন্যে মাথা কোটে,  
 মেঘের ডাকে জানলাঙ্গলো ঝড়বড়িয়ে ওঠে ।  
 ভেবেছিলুম, শান্ত হয়ে পড়ছ ক্লাসে তুমি,  
 জানি নে তো কখন এমন শিখেছ দুষ্টুমি ।  
 খোকা বলে, ওই যে তোমার ইন্দ্রলোকের ছেলে—  
 তাদের কেন এমনতরো দুষ্টুমিতে পেলে ।  
 ওরা যখন নেমে আসে আমবাগানের 'পরে—  
 ডাল ভাঙে আর ফল ছেঁড়ে আর কী কাষটাই করে ।  
 আসল কথা, বাদল যেদিন বনে লাগায় দোল,  
 ডালে-পালায় লতায়-পাতায় বাধায় গওগোল—  
 সেদিন ওরা পড়াশুনোয় মন দিতে কি পারে,  
 সেদিন ছুটির মাতন লাগায় অজয়নদীর ধারে ।  
 তার পরে সব শান্ত হলে ফেরে আপন দেশে,  
 মা তাহাদের বকুনি দেয়, গঞ্জ শোনায় শেষে ।

## বড়ো খবর

কুসমি বললে, তুমি যে বললে এখনকার কালের বড়ো বড়ো সব খবর তুমি  
 আমাকে শোনাবে, নইলে আমার শিক্ষা হবে কী রকম করে দাদামশায় ।

দাদামশায় বললে, বড়ো খবরের ঝুলি বয়ে বেড়াবে কে বলো, তার মধ্যে যে  
 বিস্তার রাবিশ ।

সেগুলো বাদ দাও-না ।

বাদ দিলে খুব অল্প একটু বাকি থাকবে, তখন তোমার মনে হবে ছেটো খবর ।  
 কিন্তু আসলে সেই খাটি খবর ।

আমাকে খাটি খবরই দাও ।

তাই দেব । তোমাকে যদি বি.এ. পাস করতে হত, সব রাবিশই তোমার  
 টেবিলে উঁচু করতে হত; অনেক বাজে কথা, অনেক মিথ্যে কথা, টেনে বেড়াতে  
 হত খাতা বোঝাই করে ।

କୁସମି ବଲଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦାଦାମଶାୟ ଏଥନକାର କାଳେର ଏକଟା ଖୁବ ବଡ଼ୋ ଖବର ଦାଓ ଦେଖି ଖୁବ ଛୋଟୋ କରେ, ଦେଖି ତୋମାର କେମନ କ୍ଷମତା ।

ଆଜ୍ଞା ଶୋନୋ ।

ଶାନ୍ତିତେ କାଜ ଚଲଛିଲ ।

ମହାଜନି ନୌକୋଯ ଘୋରତର ଝାଗଡ଼ା ଚଲଛେ ପାଲେ ଆର ଦାଁଡେ । ଦାଁଡେର ଦଲ ଠକ୍ଠକ୍ କରତେ କରତେ ମାଧ୍ୟିର ବିଚାରସଭାୟ ଏସେ ଉପାସ୍ତିତ, ବଲଲେ, ଏ ତୋ ଆର ସହ୍ୟ ହୟ ନା । ଏ ଯେ ତୋମାର ଅହୂକେରେ ପାଲ, ବୁକ ଫୁଲିଯେ ବଲେ ଆମାଦେର ଛୋଟୋଲୋକ । କେନନା, ଆମରା ଦିନେ ରାତେ ନୀଚେର ପାଟାତନେ ବାଁଧା ଥେକେ ଜଳ ଠେଲେ ଠେଲେ ଚଲି । ଆର ଉନି ଚଲେନ ଖୋଲୋଲେ, କାରାଓ ହାତେର ଠେଲାର ତୋଯାଙ୍କା ରାଖେନ ନା । ସେଇଜନ୍ୟେଇ ଉନି ହଲେନ ବଡ଼ୋଲୋକ । ତୁମି ଠିକ କରେ ଦାଓ କାର କଦର ବେଶି । ଆମରା ସଦି ଛୋଟୋଲୋକ ହଇ ତବେ ଜୋଟ ବେଂଧେ କାଜେ ଇତ୍ତଫା ଦେବ, ଦେଖି ତୁମି ନୌକୋ ଚାଲାଓ କୀ କରେ ।

ମାଧ୍ୟି ଦେଖଲେ ବିପଦ, ଦାଁଡ଼ କଟାକେ ଆଡ଼ାଲେ ଟେନେ ନିଯେ ଚୁପିଚୁପି ବଲଲେ, ଓର କଥାଯ କାନ ଦିଯୋ ନା ଭାଯାରା । ନିତାନ୍ତ ଫାଁଗ୍ପା ଭାଷାୟ ଓ କଥା ବଲେ ଥାକେ । ତୋମରା ଜୋଯାନରା ସବ ମରି-ବାଁଚି କରେ ନା ଖାଟିଲେ ନୌକୋ ଏକେବାରେ ଅଚଳ । ଆର, ଏ ପାଲ କରେନ ଫାଁକା ବାବୁଯାନ ଉପରେର ମହଲେ । ଏକଟୁ ବୋଡ଼ୋ ହାଓୟା ନିଯେଛେ କି ଉନି କାଜ ବନ୍ଧ କରେ ଗୁଟିସୁଟି ମେରେ ପଡ଼େ ଥାକେନ ନୌକୋର ଚାଲେର ଉପରେ । ତଥନ ଫଡ୍ଫଡ଼ାନି ବନ୍ଧ, ସାଡ଼ାଇ ପାଓୟା ଯାଯା ନା । କିନ୍ତୁ ସୁଖେ-ଦୁଃଖେ ବିପଦେ-ଆପଦେ ହାଟେ-ଘାଟେ ତୋମରାଇ ଆହୁ ଆମାର ଭରସା । ଏ ନବାବିର ବୋଖାଟାକେ ସଥନ-ତଥନ ତୋମାଦେର ଟେନେ ନିଯେ ବେଡ଼ାତେ ହୟ । କେ ବଲେ ତୋମାଦେର ଛୋଟୋଲୋକ ।

ମାଧ୍ୟିର ଭୟ ହଲ, କଥାଗୁଲୋ ପାଲେର କାନେ ଉଠିଲ ବୁଝି । ସେ ଏସେ କାନେ କାନେ ବଲଲେ, ପାଲ-ମଶାୟ, ତୋମାର ସଙ୍ଗେ କାର ତୁଳନା । କେ ବଲେ ଯେ ତୁମି ନୌକୋ ଚାଲାଓ, ସେ ତୋ ମଜୁରେର କର୍ମ । ତୁମି ଆପନ ଫୁର୍ତିତେ ଚଲ ଆର ତୋମାର ଇଯାରବସ୍ତିରା ତୋମାର ଇଶାରାୟ ପିଛନ-ପିଛନ ଚଲେ । ଆବାର ବୁଲେ ପଡ଼ ଏକଟୁ ସଦି ହାଁଗ ଧରେ । ଏ ଦାଁଡ଼ଗୁଲୋର ଇତରମିତେ ତୁମି କାନ ଦିଯୋ ନା ଭାଯା, ଓଦେର ଏମନି କଷେ ବେଂଧେ ରେଖେଛି ଯେ ଯତଇ ଓଦେର ଝପ୍ତାପାନି ଥାକ୍-ନା କାଜ ନା କରେ ଉପାୟ ନେଇ ।

ଶୁଣେ ପାଲ ଉଠିଲ ଫୁଲେ । ମେଘେର ଦିକେ ତାକିଯେ ତାକିଯେ ହାଇ ତୁଲତେ ଲାଗଲ ।

କିନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଲୋ ନଯ । ଟୋଚିର ହୟେ ଯାବେ ପାଲେର ଗୁମର । ଧରା ପଡ଼ିବେ ଦାଁଡେଇ ଚାଲାଯ ନୌକୋ—ଝଡ଼ ହୋକ, ଝାପଟା ହୋକ, ଉଜାନ ହୋକ, ଭାଁଟା ହୋକ ।

କୁସମି ବଲଲେ, ତୋମାର ବଡ଼ୋ ଖବର ଏହିଟକୁ ବୈ ନଯ? ତୁମି ଠାଟ୍ଟା କରଛ ।

ଦାଦାମଶାୟ ବଲଲେ, ଠାଟ୍ଟାର ମତନ ଏଥନ ଶୋନାଛେ । ଦେଖତେ ଦେଖତେ ଏକଦିନ ବଡ଼ୋ ଖବର ବଡ଼ୋ ହୟେଇ ଉଠିବେ ।

ତଥନ?

ତଥନ ତୋମାର ଦାଦାମଶାୟ ଏ ଦାଁଡ଼ଗୁଲୋର ସଙ୍ଗେ ତାଲ ମେଲାନୋ ଅଭ୍ୟାସ କରତେ ବସବେ ।

ଆର, ଆମି?

যেখানে দাঁড় বড়ো বেশি কচকচ করে সেখানে দেবে একটু তেল।

দাদামশায় বললেন, খাঁটি খবর ছোটো হয়েই থাকে, যেমন বীজ। ডালপালা  
নিয়ে বড়ো গাছ আসে পরে। এখন বুঝেছ তো?

কুসমি বললে, হ্যাঁ, বুঝেছি।

মুখ দেখে বোঝা গেল, বোঝে নি। কিন্তু কুসমির একটা গুণ আছে,  
দাদামশায়ের কাছে ও সহজে মানতে চায় না যে ও কিন্তু বোঝে নি। ওর ইরুমাসির  
চেয়ে ও বুঝিতে যে কম, এ কথাটা চাপা থাকাই ভালো।

\* \* \*

পালের সঙ্গে দাঁড়ের বুঝি গোপন রেধারেষি,

মনে মনে তর্ক করে কার সমাদুর বেশি।

দাঁড় ভাবে যে, পাঁচ-ছজনা গোলাম তাহার পাছে,

একলা কেবল বুড়ো মাঝি পালের তর্বে আছে।

পাল ভাবে যে, জলের সঙ্গে দাঁড়ের নিত্য বৈরি,

বাতাসকে তো বক্ষে নিতে আমি সদাই তৈরি;

আমার খাতির মিতার সঙ্গে ভালোবাসার জোরে,

ওরা মরে ঝোঁকে ঝোঁকেই শধু লড়াই ক'রৈ—

ওঠে পড়ে পরের খেয়ে তাড়া,

আমি চলি আকাশ থেকে যখনি পাই সাড়া।

চণ্ডী

দিদি, তুমি বোধ হয় ও পাড়ার চণ্ডীবাবুকে জান?

জানি নে! তিনি যে ডাকসাইটে নিন্দুক।

বিধাতার কারখানায় খাঁটি জিনিস তৈরি হয় না, মিশল থাকেই। দৈবাং এক-একজন  
উত্তরে যায়। চণ্ডী তারই সেরা নমুনা। ওর নিন্দুকতায় ভেজাল নেই। জান তো,  
আমি আটিস্ট-মানুষ। সেইজন্যে এরকম খাঁটি জিনিস আমার দরবারে জুটিয়ে আনি।  
একেবারে লোকটা জীনিয়স বললেই হয়। একটা এড়িয়ে গেলে তার খুঁজে পাওয়া  
যাবে না। একদিন দেখি, অধ্যাপক অনিলের দরজায় কান দিয়ে কী শুনছে। আমি  
তাকে বললুম, অমন করে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছ কাকে হে।

সেটাই যদি জানতুম তা হলে তো কথাই ছিল না। চার দিকে চোখ কান খুলে  
রাখতে হয়, কাউকে বিশ্বাস করবার জো নেই—চোর-হ্যাচড়ে দেশ ভরে গেল।

বলো কী হে।

শুনে অবাক হবেন, এই সেইদিন অমন আমার চাঁপার রঙের গামছাখানা আলনার  
উপর থেকে বেমালুম গায়ের হয়ে গেল।

বলো কী হে, গামছা!

আজ্জে হ্যাঁ, গামছা বৈকি। কোণটাতে একটুখানি ছেঁড়া ছিল, তা সেলাই করিয়ে  
নিয়েছিলুম।

তুমি অনিলবাবুর দরজার কাছে অমন ঘূর-ঘূর করছিলে কেন। পরের ছেঁড়া  
গামছা জোগাড় করবার রোগে তাঁকে ধরেছে নাকি।

আরে ছি ছি, ওঁরা হলেন বড়োলোক, গামছা কখনো চক্ষেও দেখেন নি। টার্কিস  
তোয়ালে না হলে ওর এক পা চলে না।

তা হলে?

আমি ভাবছিলুম ওর পাওনা তো বেশি নয়। অথচ, এত বাবুয়ানা চলে কী করে।  
বোধ হয় ধার করে!

আজকালকার বাজারে ধার তো সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ ফাঁকি।

আচ্ছা, তুমি পুলিসে খবর দিয়েছিলে নাকি।

না, তার দরকার হয় নি। সেটা বেরাল আমার শ্রী ময়লা কাপড়ের ঝুঁড়ির ভিতর  
থেকে। কাউকেই বিশ্বাস করবার জো নেই।

কী বল তুমি, ওটা ঠিক জায়গাতেই তো ছিল।

আপনি সাদা লোক, আসল কথাটাই বুঝতে পারছেন না। আপনি জানেন তো  
আমার শালা কোচ্চলুকে। কী রকম সে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ায়। পয়সা জোটে কোথা  
থেকে। কাজটি করছেন তিনি, আর গিন্নি সেটাকে বেমালুম চাপা দিয়েছেন।

তুমি জানলে কী করে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এ কি জানতে বাকি থাকে।

কখনো তাকে নিতে দেখেছ?

যে এমন কাজ করে সে কি দেখিয়ে দেখিয়ে করে। এ দিকে দেখুন-না, পুলিস  
আছে চোখ বুজে, তারা যে বখরা নিয়ে থাকে। এই-সব উৎপাত আরঙ্গ হয়েছে  
যখন থেকে দেখা দিয়েছেন ঐ আপনাদের গান্ধিমহারাজ।

এর মধ্যে তিনি আবার এলেন কোথেকে।

ঐ যে তাঁর অহিংস্র নীতি। ধড়াধড় না পিটলে চোরের চুরি রোগ কখনো সারে?  
তিনি নিজে থাকেন কপ্নি প'রে। এক পয়সা সম্বল নেই। এ-সব লম্বাচওড়া বুলি  
তাঁকেই সাজে। আমরা গেরস্ত মানুষ, শুনে চক্ষুস্থির হয়ে যায়। এ দিকে আর-এক  
নতুন ফন্দি বেরিয়েছে জানেন তো? ঐ যে যাকে আপনারা বলেন চাঁদা। তার মুনফা  
কম নয়। কিন্তু সেটা তলিয়ে যায় কোথায় তার হিসেব রাখে কে। মশায়, সেদিন  
আমারই ঘরে এসে উপস্থিত অনাথ-হাসপাতালের চাঁদা চাইতে। লজ্জা হয়, কী আর  
বলব। খাতা হাতে যিনি এসেছিলেন আপনারা সবাই তাঁকে জানেন। ডাঙ্কার — আর  
নাম করে কাজ নেই, কে আবার তাঁর কানে ওঠাবে। তিনি যে মাঝে মাঝে আসেন  
আমাদের ঘরে নাড়ি টিপতে। সিকি পয়সা দিতে হয় না বটে, তেমনি সিকি পয়সার  
ফলও পাই নে। তবু হাজার হোক, এম. বি. তো বটে। এমনি হাল আমলের তাঁর  
চিকিৎসা যে রোগীরা তাঁর কাছে ঘুঁষে না। কাজেই টাকার টানাটানি হয় বৈকি।

ছি ছি, কী বলছ তুমি।

তা মশায়, আমি মুখফোড় মানুষ। সত্যি কথা আমার বাধে না। ওর মুখের  
সামনেই শুনিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু কী বলব, আমার ছেলেটাকে আদায়ের কাজে

রেখে আমার মুখ বন্ধ করেছেন। তার কাছ থেকেও মাঝে মাঝে ইশারা পাই।  
দক্ষিণহস্ত বেশ চলছে ভালো। বুঝছেন তো? আমাদের দেশে আজকালকার ইতরামি  
যে কী রকম অসহ্য, তার-একটা নমুনা আপনাকে শোনাই।

কী রকম।

আমাদের পাড়ায় আছে একটা গোমুখ্য যাকে ওরা নাম দিয়েছে কবিবর। তাকে  
দিয়ে দেখুন আমার নামে কী লিখিয়েছে। ঘোর লাইবেল। নিম্নকেরা দল  
পাকিয়েছে। পাড়ায় কান পাতবার জো নেই। খ্যাকশিয়ালি বলে চেঁচাচ্ছে আমার  
পিছনে পিছনে। এত সাহস হত না যদি-না এদের পিছনে থাকত নামজাদা মুরব্বি  
সব গান্ধিজির চেলা।

দেখি দেখি কী লিখেছে। মন্দ হয় নি তো। লোকটার হাত দোরস্ত আছে।—

আলো যার মিট্টিটে,  
স্বভাবটা খিট্টিটে,  
বড়োকে করিতে চায় ছোটো,  
সব ছবি ভূঁয়ো মেজে  
কালো ক'রে নিজেকে যে  
মনে করে ওঙ্গাদ পোটো,  
বিধাতার অভিশাপে  
ঘূরে মরে বোপে বাপে,  
স্বভাবটা যার বদ্ধেয়ালি,  
খ্যাক খ্যাক করে মিছে  
সব তাতে দাঁত খিচে  
তারে নাম দিব খ্যাকশেয়ালি।

ও কী ও, আপনার দরজায় পুলিস যে।

ব্যাপারটা কী।

চণ্ডীবাবুর ছেলের নামে কেস এসেছে।

হাঁ, কিসের কেস।

অনাথ-হাসপাতালের চাঁদার টাকা তিনি তেঙ্গে বসেছেন।

মিথ্যে কথা। আগাগোড়া পুলিসের সাজানো। আপনি তো জানেন, আমার ছেলে  
এক সময় আহার নিদ্রা ছেড়ে গান্ধির নামে দরজায় দরজায় চাঁদা ভিক্ষে করে  
বেড়িয়েছিল, সেই অবধি বরাবর তার উপর পুলিসের নজর লেগে আছে। কিছু না,  
এটা পলিটিক্যাল মামলা।

দাদামশায়, তোমার এই গল্পটা আমার একটুও ভালো লাগল না।

\* \* \*

যেমন পাজি তেমনি বোকা,  
গোবর-ভরা মাথা,  
লোকটা কে-যে ভেবে পাছি না তা।

কবে যে কী বলেছিল ঠিক তা মনে নাই,  
 আচ্ছা ক'রে মুখের মতো জবাব দিতে চাই;  
 কী যে জবাব, কার যে জবাব যদি মনে পড়ে—  
 গ্রাম ফিরে পাই ধড়ে।  
 হাতে পেলে দেওয়াই নাকে খত,  
 স্ত্রীর ছিড়ে দিই নথ।  
 রাঙ্কেল সে, পাঞ্জির অধম, শয়তান মিটমিটে;  
 দিনরাত্রির ইচ্ছে করে, ঘূঘু চুরাই ভিটেয়।  
 বদ্মাশকে শিক্ষা দেব—অসহ্য এই ইচ্ছে  
 মনকে নাড়া দিচ্ছে।  
 লোকটা কে-যে পষ্ট তা নয়, এই কথাটাই পষ্ট—  
 অতি খারাপ, নিভাস্তই সে নষ্ট।  
 পথের মোড়ে যদি পেতেম দেখা  
 মনের ঝালটা ঝেড়ে নিতেম যদি থাকত একা।  
 বুকটা ভরে অকথ্য সব জমে উঠছে ঢের,  
 লঙ্ক্ষ্য মনে না পড়ে তো কাগজ করব বের,  
 যেখানে পাই নাম একটা করব নির্বাচন—  
 খালাস পাবে মন।

## রাজরানী

কাল তোমার ভালো লাগে নি চাঁপিকে নিয়ে বকুনি। ও একটা ছবি মাত্র। কড়া কড়া লাইনে আঁকা, ওতে রস নাই। আজ তোমাকে কিছু বলব, সে সভিকার গল্প।

কুসমি অত্যন্ত উৎফুল্প হয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলো। তুমি তো সেদিন বললে, বরাবর মানুষ সত্যি খবর দিয়ে এসেছে গঁগের মধ্যে মুড়ে। একেবারে ঘয়রার দোকান বানিয়ে রেখেছে। সন্দেশের মধ্যে ছানাকে চেনাই যায় না।

দাদামশায় বললে, এ না হলে মানুষের দিন কাটিত না। কত আরব্য-উপন্যাস, পারস্য-উপন্যাস, পঞ্চতত্ত্ব, কত কী সাজানো হয়ে গেল। মানুষ অনেকখানি ছেলেমানুষ, তাকে রূপকথা দিয়ে ভোলাতে হয়। আর ভূমিকায় কাজ নেই। এবার শুরু করা যাক।—

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল না রাজরানী। রাজকন্যার সকানে দৃত গেল অঙ্গ কলিঙ্গ মগধ কোশল কাঞ্চী। তারা এসে খবর দেয় যে, মহারাজ, সে কী দেখলুম; কারু চোখের জলে মুক্তো ঝরে, কারু হাসিতে খসে পড়ে মানিক! কারু দেহ চাঁদের আলোয় গড়া, সে যেন পূর্ণিমারাত্রের স্বপ্ন।

রাজা শুনেই বুঝলেন, কথাগুলি বাড়িয়ে বলা, রাজাৰ ভাগ্যে সত্য কথা জোটে না অনুচরদের মুখের থেকে। তিনি বললেন, আমি নিজে যাব দেখতে।

সেনাপতি বললেন, তবে ফৌজ ডাকি?

রাজা বললেন, লড়াই করতে যাচ্ছি নে।

মন্ত্রী বললেন, তবে পাত্র-মিত্রদের খবর দিই?

রাজা বললেন, পাত্র-মিত্রদের পছন্দ নিয়ে কন্যা দেখার কাজ চলে না।

তা হলে রাজহস্তী তৈরি করতে বলে দিই!

রাজা বললেন, আমার একজোড়া পা আছে।

সঙ্গে কয়জন যাবে পেয়াদা?

রাজা বললেন, যাবে আমার ছায়াটা।

আচ্ছা, তা হলে রাজবেশ পরুন — চুনিপান্নার হার, মানিক-লাগানো মুকুট, হীরে লাগানো কাঁকন আর গজমোতির কানবালা।

রাজা বললেন, আমি রাজার সঙ্গ সেজেই থাকি, এবার সাজব সন্নেসির সঙ্গ।

মাথায় লাগালেন জটা, পরলেন কপনি, গায়ে শাখলেন ছাই, কপালে আঁকলেন তিলক আর হাতে নিলেন কমঙ্গলু আর বেলকাঠের দণ্ড। ‘বোং বোং মহাদেব’ বলে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দেশে দেশে রটে গেল — বাবা পিনাকীশ্বর নেমে এসেছেন হিমালয়ের গুহা থেকে, তাঁর একশো-পঁচিশ বছরের তপস্যা শেষ হল।

রাজা প্রথমে গেলেন অঙ্গদেশে। রাজকন্যা খবর পেয়ে বললেন, ভাকো আমার কাছে।

কন্যার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামল, চুলের রঙ যেন ফিঙের পালক, চোখ দুটিতে হরিণের চমকে-ওঠা চাহনি। তিনি বসে বসে সাজ করছেন। কোনো বাঁদি নিয়ে এল স্বর্ণচন্দন বাটা, তাতে মুখের রঙ হবে যেন চাঁপাফুলের মতো। কেউ-বা আনল ভৃঙ্গলাঙ্গন তেল, তাতে চুল হবে যেন পশ্পাসরোবরের ঢেউ। কেউ-বা আনল মাকড়সাজাল শাড়ি। কেউ-বা আনল হাওয়াহালকা ওড়না। এই করতে করতে দিনের তিনটে প্রহর যায় কেটে। কিছুতেই কিছু মনের মতো হয় না। সন্নেসিকে বললেন, বাবা, আমাকে এমন চোখ-ভোলানো সাজের সঙ্কান বলে দাও, যাতে রাজরাজেশ্বরের লেগে যায় ধাঁধা, রাজকর্ম যায় ঘুচে, কেবল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দিনরাত্রি কাটে।

সন্ম্যাসী বললেন, আর-কিছুই চাই না?

রাজকন্যা বললেন, না আর-কিছুই না।

সন্ম্যাসী বললেন, আচ্ছা, আমি তবে চললেম, সঙ্কান মিললে নাহয় আবার দেখা দেব।

রাজা দেখান থেকে গেলেন বঙ্গদেশে। রাজকন্যা শুনলেন সন্ম্যাসীর নামডাক। প্রণাম করে বললেন, বাবা, আমাকে এমন কঠ দাও যাতে আমার মুখের কথায় রাজরাজেশ্বরের কান যায় ভরে, মাথা যায় ঘুরে, মন হয় উতলা। আমার ছাড়া আর কারও কথা যেন তাঁর কানে না যায়। আমি যা বলাই তাই বলেন।

সন্ম্যাসী বললেন, সেই মন্ত্র আমি সঙ্কান করতে বেরলুম। যদি পাই তবে ফিরে এসে দেখা হবে।

বলে তিনি গেলেন চলে ।

গেলেন কলিঙ্গে । সেখানে আর-এক হাওয়া অন্দরমহলে । রাজকন্যা মন্ত্রণা করছেন কী করে কাষ্ঠী জয় করে তাঁর সেনাপতি সেখানকার মহিমীর মাথা হেঁট করে দিতে পারে, আর কোশলের গুমরও তাঁর সহ্য হয় না । তার রাজলক্ষ্মীকে বাঁদী করে তাঁর পায়ে তেল দিতে লাগিয়ে দেবেন ।

সন্ন্যাসীর খবর পেয়ে ডেকে পাঠালেন । বললেন, বাবা, শুনেছি সহস্রাবী অস্ত্র আছে শ্বেতদীপে যার তেজ নগর গ্রাম সমষ্টি পুড়ে ছাই হয়ে যায় । আমি যাকে বিয়ে করব, আমি চাই তাঁর পায়ের কাছে বড়ো বড়ো রাজবন্দীরা হাত জোড় করে থাকবে, আর রাজার মেয়েরা বন্দিনী হয়ে কেউ-বা চামর দোলাবে, কেউ-বা ছত্র ধরে থাকবে, আর কেউ-বা আনবে তাঁর পানের বাটা ।

সন্ন্যাসী বললেন, আর-কিছু চাই নে তোমার?

রাজকন্যা বললেন, আর-কিছুই না ।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই দেশ-জুলানো অঞ্চলে সন্দানে চললেম ।

সন্ন্যাসী গেলেন চলে । বললেন, ধিক্ ।

চলতে চলতে এসে পড়লেন এক বনে । খুলে ফেললেন জটাজুট । ঝরনার জলে স্নান করে গায়ের ছাই ফেললেন ধূয়ে । তখন বেলা প্রায় তিনপ্রহর । প্রথর রোদ, শরীর শ্বাস, শুধু প্রবল । আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে দেখলেন একটি পাতার ছাউনি । সেখানে একটি ছোটো চুলা বানিয়ে একটি মেয়ে শাকপাকা চড়িয়ে দিয়েছে রাঁধবার জন্য । সে ছাগল চরায় বনে, সে মধু জড়ে করে রাজবাড়িতে জোগান দিত । বেলা কেটে গেছে এই কাজে । এখন শুকনো কাঠ জুলিয়ে শুরু করেছে রান্না । তার পরনের কাপড়খানি দাগপড়া, তার দুই হাতে দুটি শাঁখা, কানে লাগিয়ে রেখেছে একটি ধানের শিশ । চোখ দৃঢ়ি তার ভোমরার মতো কালো । স্নান করে সে ভিজে চূল পিঠে মেলে দিয়েছে যেন বাদলশেষের রাস্তির ।

রাজা বললেন, বড়ো খিদে পেয়েছে ।

মেয়েটি বললে, একটু সবুর করুন, আমি অন্ন চড়িয়েছি, এখনই তৈরি হবে আপনার জন্য ।

রাজা বললেন, আর, তুমি কী খাবে তা হলে ।

সে বললে, আমি বনের মেয়ে, জানি কোথায় ফলমূল কুড়িয়ে পাওয়া যায় । সেই আমার হবে চের । অতিথিকে অন্ন দিয়ে যে পুণ্য হয় গরিবের ভাগ্যে তা তো সহজে জোটে না ।

রাজা বললেন, তোমার আর কে আছে?

মেয়েটি বললে, আছেন আমার বুড়ো বাপ, বনের বাইরে তাঁর কুঁড়েঘর । আমি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই । কাজ শেষ করে কিছু খাবার নিয়ে যাই তাঁর কাছে । আমার জন্য তিনি পথ চেয়ে আছেন ।

রাজা বললেন, তুমি অন্ন নিয়ে চলো, আর আমাকে দেখিয়ে দাও সেই-সব ফলমূল যা তুমি নিজে জড়ো করে থাও ।

କନ୍ୟା ବଲଲେ, ଆମାର ଯେ ଅପରାଧ ହବେ ।

ରାଜା ବଲଲେନ, ତୁମି ଦେବତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାବେ । ତୋମାର କୋନୋ ଭୟ ନେଇ ।  
ଆମାକେ ପଥ ଦେଖିଯେ ନିଯେ ଚଲୋ ।

ବାପେର ଜନ୍ୟ ତୈରି ଅନ୍ନେର ଥାଳି ସେ ମାଥାଯ ନିଯେ ଚଲଲ । ଫଳମୂଳ ସଂଘର କରେ  
ଦୁଜନେ ତାଇ ଖେଯେ ନିଲେ । ରାଜା ଗିଯେ ଦେଖଲେନ, ବୁଡ୍ଢୋ ବାପ କୁଠେଘରେ ଦରଜାଯ  
ବ'ସେ ।

ସେ ବଲଲେ, ମା, ଆଜ ଦେଇ ହଲ କେନ ।

କନ୍ୟା ବଲଲେ, ବାବା, ଅତିଥି ଏନେଛି ତୋମାର ଘରେ ।

ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟନ୍ତ ହେଁ ବଲଲେ, ଆମାର ଗରିବେର ଘର, କୀ ଦିଯେ ଆମି ଅତିଥିସେବା କରବ ।

ରାଜା ବଲଲେନ, ଆମି ତୋ ଆର କିଛୁଇ ଚାଇ ନେ, ପେଯେଛି ତୋମାର କନ୍ୟାର ହାତେର  
ସେବା । ଆଜ ଆମି ବିଦାଯ ନିଲେମ । ଆର-ଏକଦିନ ଆସବ ।

ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତି ଚଲେ ଗେଲ, ଏବାର ରାଜା ଏଲେନ ରାଜବେଶେ । ତାଁର ଅଷ୍ଟ ରଥ  
ସମନ୍ତ ରଇଲ ବନେର ବାହିରେ । ବୃଦ୍ଧେର ପାଯେର କାହେ ମାଥା ରେଖେ ପ୍ରଗାମ କରଲେନ;  
ବଲଲେନ, ଆମି ବିଜୟପତ୍ନେର ରାଜା । ରାନୀ ଖୁଜିତେ ବେରିଯେଛିଲାମ ଦେଶେ ବିଦେଶେ ।  
ଏତଦିନ ପରେ ପେଯେଛି—ଯଦି ତୁମି ଆମାଯ ଦାନ କର, ଆର ଯଦି କନ୍ୟା ଥାକେନ ରାଜି ।

ବୃଦ୍ଧେର ଚୋଥ ଜଲେ ଭରେ ଗେଲ । ଏଲ ରାଜହଣ୍ଟୀ—କାଠକୁଡ଼ାନି ମେଯେକେ ପାଶେ ନିଯେ  
ରାଜା ଫିରେ ଗେଲେନ ରାଜଧାନୀତେ ।

ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ କଲିଙ୍ଗେର ରାଜକନ୍ୟାରା ଶୁନେ ବଲଲେ, ଛି!

\* \* \*

ଆସିଲ ଦିଯାଡ଼ି ହାତେ ରାଜାର ଝିଯାରି

ଖିଡ଼କିର ଆଞ୍ଜିନାୟ, ନାମଟି ପିଯାରି ।

ଆମି ଶୁଧାଲେମ ତାରେ, ଏସେଛ କୀ ଲାଗି ।

ସେ କହିଲ ଚୁପେ ଚୁପେ, କିଛୁ ନାହି ମାଗି ।

ଆମି ଚାଇ ଭାଲୋ କରେ ଚିନେ ରାଖୋ ମୋରେ,

ଆମାର ଏ ଆଲୋଟିତେ ମନ ଲାହୋ ଭରେ ।

ଆମି ଯେ ତୋମାର ଧାରେ କରି ଆସା-ୟାଓୟା,

ତାଇ ହେଠା ବକୁଲେର ବନେ ଦେଯ ହାଓୟା ।

ଯଥନ ଫୁଟିଯା ଓଠେ ଯୁଧୀ ବନମୟ

ଆମାର ଆଁଚଲେ ଆନି ତାର ପରିଚୟ ।

ଯେଥା ଯତ ଫୁଲ ଆହେ ବନେ ବନେ ଫୋଟେ

ଆମାର ପରଶ ପେଲେ ଖୁଶି ହେଁ ଓଠେ ।

ଶୁକତାରା ଓଠେ ତୋରେ, ତୁମି ଥାକ ଏକା,

ଆମିହି ଦେଖାଇ ତାରେ ଠିକମତ ଦେଖା ।

ଯଥନି ଆମାର ଶୋନେ ନୃପୁରେର ଧରନି

ଘାସେ ଘାସେ ଶିହରନ ଜାଗେ-ଯେ ତଥନି ।

ତୋମାର ବାଗାନେ ସାଜେ ଫୁଲେର କେଯାରି,

କାନାକାନି କରେ ତାରା, ଏସେଛ ପିଯାରି,

কানাকানি করে তারা, এসেছে পিয়ারি ।  
 অরুণের আভা লাগে সকালের মেঘে,  
 ‘এসেছে পিয়ারি’ বলে বন ওঠে জেগে ।  
 পূর্ণিমারাতে আসে ফাগুনের দোল,  
 ‘পিয়ারি পিয়ারি’ রবে ওঠে উত্তরোল ।  
 আমের মুকুলে হাওয়া মেঘে ওঠে গ্রামে,  
 চারি দিকে বাঁশি বাজে পিয়ারির নামে ।  
 শরতে ভরিয়া উঠে যমুনার বারি,  
 কুলে কুলে গেয়ে চলে ‘পিয়ারি পিয়ারি’ ।

## মুনশি

আচ্ছা দাদামশায়, তোমাদের সেই মুনশিজি এখন কোথায় আছেন ।

এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারব তার সময়টা বুঝি কাছে এসেছে, তবু হয়তো  
কিছুদিন সবুর করতে হবে ।

ফের অমন কথা যদি তুমি বল, তা হলে তোমার সঙ্গে কথা বদ্ধ করব ।

সর্বনাশ, তার চেয়ে যে মিথ্যে কথা বলাও ভালো । তোমার দাদামশায় যখন  
সুল-পালানে ছেলে ছিল তখন মুনশিজি ছিলেন, ঠিক কত বয়েস, তা বলা শক্ত ।

তিনি বুঝি পাগল ছিলেন?

হঁ, যেমন পাগল আমি ।

তুমি আবার পাগল? কী-যে বল তার ঠিক নেই ।

তাঁর পাগলামির লক্ষণ শুনলে বুঝতে পারবে, আমার সঙ্গে তাঁর আশ্র্য মিল ।

কী রকম শুনি ।

যেমন তিনি বলতেন, জগতে তিনি অদ্বিতীয় । আমিও তাই বলি ।

তুমি যা বল সে তো সত্যি কথা । কিন্তু, তিনি যা বলতেন তা যে মিথ্যে ।

দেখো দিদি, সত্য কখনো সত্যই হয় না যদি স্কলের সম্বন্ধেই সে না খাটে ।  
বিধাতা লক্ষকোটি মানুষ বানিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয় । তাঁদের ছাঁচ ভেঙে  
ফেলেছেন । অধিকাংশ লোকে নিজেকে পাঁচজনের সমান মনে ক'রে আরাম বোধ  
করে । দৈবাং এক-একজন লোককে পাওয়া যায় যারা জানে, তাদের জুড়ি নেই ।  
মুনশি ছিলেন সেই জাতের মানুষ ।

দাদামশায়, তুমি একটু স্পষ্ট করে তাঁর কথা বলো-না, তোমার অর্দেক কথা  
আমি বুঝতে পারি নে ।

ক্রমে ক্রমে বলছি, একটু ধৈর্য ধরো ।—

আমাদের বাড়িতে ছিলেন মুনশি, দাদাকে ফার্সি পড়াতেন । কাঠামোটা তাঁর  
বানিয়ে তুলতে মাংসের পড়েছিল টানাটানি । হাড় কখনার উপরে একটা চামড়া ছিল

ଲେଗେ, ଯେନ ମୋମଜାମାର ମତୋ । ଦେଖେ କେଉ ଆନ୍ଦାଜ କରତେ ପାରନ୍ତ ନା ତୀର କ୍ଷମତା କିନ୍ତୁ । ନା ପାରବାର ହେତୁ ଏହି ଯେ, କ୍ଷମତାର କଥାଟା ଜାନତେନ କେବଳ ତିନି ନିଜେ । ପୃଥିବୀତେ ବଡ଼ୋ ବଡ଼ୋ ସବ ପାଲୋଯାନ କଥନୋ ଜେତେ କଥନୋ ହାରେ । କିନ୍ତୁ, ଯେ ତାଲିମ ନିଯେ ମୁନଶିର ଛିଲ ଗୁମର ତାତେ ତିନି କଥନୋ କାରଓ କାହେ ହଟେନ ନି । ତୀର ବିଦ୍ୟେତେ କାରଓ କାହେ ତିନି ଯେ ଛିଲେନ କର୍ମତି ସେଟାର ନଜିର ବାଇରେ ଥାକତେ ପାରେ, ଛିଲ ନା ତୀର ମନେ । ସଦି ହତ ଫାର୍ସି ପଡ଼ା ବିଦ୍ୟେ ତା ହଲେ କଥାଟା ସହଜେ ମେନେ ନିତେ ରାଜି ଛିଲ ଲୋକେ । କିନ୍ତୁ, ଫାର୍ସିର କଥା ପାଡ଼ିଲେଇ ବଲତେନ, ଆରେ ଓ କି ଏକଟା ବିଦ୍ୟେ । କିନ୍ତୁ, ତୀର ବିଶ୍ୱାସ ଛିଲ ଆପନାର ଗାନେ । ଅଥଚ ତୀର ଗଲାଯ ଯେ ଆଓଯାଜ ବେରୋତ ସେଟା ଚେଂଚାନି କିଂବା କାନ୍ଦୁନିର ଜାତେର, ପାଡ଼ାର ଲୋକେ ଛୁଟେ ଆସନ୍ତ ବାଡ଼ିତେ କିଛୁ ବିପଦ ଘଟେଛେ ମନେ କରେ । ଆମାଦେର ବାଡ଼ିତେ ନାମଜାଦା ଗାଇୟେ ଛିଲେନ ବିଷ୍ଣୁ, ତିନି କପାଳ ଚାପ୍ତିଯେ ବଲତେନ, ମୁନଶିଜି ଆମାର ଝୁଟି ମାରଲେନ ଦେଖାଇ । ବିଷ୍ଣୁର ଏହି ହତାଶ ଭାବଖାନା ଦେଖେ ମୁନଶି ବିଶେଷ ଦୁଃଖିତ ହତେନ ନା—ଏକଟୁ ମୁଚକେ ହାସତେନ ମାତ୍ର । ସବାଇ ବଲତ, ମୁନଶିଜି, କୀ ଗଲାଇ ଭଗବାନ ଆପନାକେ ଦିଯୋଛେନ । ଖୋଶନାମଟା ମୁନଶି ନିଜେର ପାଞ୍ଚନା ବଲେଇ ଟେକେ ଗୁଞ୍ଜତେନ । ଏହି ତୋ ଗେଲ ଗାନ ।

ଆରୋ ଏକଟି ବିଦ୍ୟେ ମୁନଶିର ଦଖଲେ ଛିଲ । ତାରଓ ସମଜଦାର ପାଓଯା ଯେତ ନା । ଇଂରେଜି ଭାଷାଯ କୋନୋ ହାଡ଼ପାକା ଇଂରେଜଙ୍କ ତୀର ସାମନେ ଦାଁଡାତେ ପାରେ ନା, ଏହି ଛିଲ ତୀର ବିଶ୍ୱାସ । ଏକବାର ବକ୍ତ୍ଵାର ଆସରେ ନାବଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାଡ଼ ଜେକେ ଦେଶଛାଡ଼ା କରତେ ପାରତେନ କେବଳ ସଦି ଇଚ୍ଛେ କରତେନ । କୋନୋଦିନ ତିନି ଇଚ୍ଛେ କରେନ ନି । ବିଷ୍ଣୁର ଝୁଟି ବେଁଚେ ଗେଲ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥେର ନାମଓ । କେବଳ କଥାଟା ଉଠିଲେ ମୁନଶି ଏକଟୁ ମୁଚକେ ହାସତେନ ।

କିନ୍ତୁ, ମୁନଶିର ଇଂରେଜି ଭାଷାଯ ଦଖଲ ନିଯେ ଆମାଦେର ଏକଟା ପାପକର୍ମର ବିଶେଷ ସୁବିଧା ହେଁଛିଲ । କଥାଟା ଖୁଲେ ବଲି । ତଥନ ଆମରା ପଡ଼ିଥୁମ ବେଙ୍ଗଲ ଅୟାକାଡେମିତେ, ଡିକ୍ରିଜ୍ ସାହେବ ଛିଲେନ ଇଞ୍ଚୁଲେର ମାଲିକ । ତିନି ଠିକ୍ କରେ ରେଖେଛିଲେନ, ଆମାଦେର ପଡ଼ାଣୁନୋ କୋନୋକାଲେଇ ହବେ ନା । କିନ୍ତୁ, ଭାବନା କୀ । ଆମାଦେର ବିଦ୍ୟେଓ ଚାଇ ନେ, ବୁଦ୍ଧିଓ ଚାଇ ନେ, ଆମାଦେର କାହେ ପୈତ୍ରିକ ସମ୍ପନ୍ତି । ତବୁଓ ତୀର ଇଞ୍ଚୁଲ ଥେକେ ଛୁଟି ଚାରି କରେ ନିତେ ହଲେ ତାର ଚଲତି ନିୟମଟା ମାନତେ ହତ । କର୍ତ୍ତାଦେର ଚିଠିତେ ଛୁଟିର ଦାବିର କାରଣ ଦେଖାତେ ହତ । ସେ ଚିଠି ଯତ ବଡ଼ୋ ଜାଲଇ ହୋକ, ଡିକ୍ରିଜ୍ ସାହେବ ଚୋଥ ବୁଜେ ଦିତେନ ଛୁଟି । ମାଇନେର ପାଞ୍ଚନାତେ ଲୋକସାନ ନା ଘଟିଲେ ତାର ଭାବନା ଛିଲ ନା । ମୁନଶିକେ ଜାନାତୁମ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ହେଁଛେ । ମୁନଶି ମୁଖ ଟିପେ ହାସତେନ । ହବେ ନା? ବାସ୍ ରେ, ତୀର ଇଂରେଜି ଭାଷାର କୀ ଜୋର । ସେ ଇଂରେଜି କେବଳ ବ୍ୟାକରଣେର ଠେଲାଯ ହାଇକୋର୍ଟେର ଜଜେର ରାଯ ଘୁରିଯେ ଦିତେ ପାରତ । ଆମରା ବଲିଥୁମ, ନିଶ୍ଚୟ! ହାଇକୋର୍ଟେର ଜଜେର କାହେ କୋନୋଦିନ ତାକେ କଲମ ପେଶ କରତେ ହୟ ନି ।

କିନ୍ତୁ, ସବଚେଯେ ତୀର ଜ୍ଞାକ ଛିଲ ଲାଟି-ଖେଲାର କାରଦାନି ନିଯେ । ଆମାଦେର ବାଡ଼ିର ଉଠୋନେ ରୋଦ୍ଦୁର ପଡ଼ିଲେଇ ତୀର ଖେଲା ଶୁରୁ ହତ । ସେ ଖେଲା ଛିଲ ନିଜେର ଛାୟାଟାର ସଙ୍ଗେ । ହୁଂକାର ଦିଯେ ଘା ଲାଗାତେନ କଥନୋ ଛାୟାଟାର ପାଯେ, କଥନୋ ତାର ଘାଡ଼େ, କଥନୋ ତାର ମାଥାଯ । ଆର ମୁଖ ତୁଲେ ଚେଯେ ଚେଯେ ଦେଖିଲେ ଚାରି ଦିକେ ଘାରା ଜଡ଼ୋ

হত তাদের দিকে। সবাই বলত, শাবাশ! বলত, ছায়াটা যে বর্তিয়ে আছে সে ছায়ার  
বাপের ভাগ্য। এই থেকে একটা কথা শেখা যায় যে ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে  
কখনো হার হয় না। আর-একটা কথা এই যে, নিজের মনে যদি জানি ‘জিতেছি’  
তা হলে সে জিত কেউ কেড়ে নিতে পারে না। শেষ দিন পর্যন্ত মুনশিজির জিত  
রইল। সবাই বলত ‘শাবাশ’, আর মনুশি মুখ টিপে হাসতেন।

দিদি, এখন বুঝাতে পারছ, ওর পাগলামির সঙ্গে আমার মিল কোথায়। আমিও  
ছায়ার সঙ্গে লড়াই করি! সে লড়াইয়ে আমি যে জিতি তার কোনো সন্দেহ থাকে  
না। ইতিহাসে ছায়ার লড়াইতে সত্যি লড়াই বলে বর্ণনা করে।

\* \* \*

ভীষণ লড়াই তার উঠোন-কোণের,  
সতুর মনটা ছিল নেপোলিয়নের।  
ইংরেজ ফৌজের সাথে দ্বার রঞ্চে  
দু-বেলা লড়াই হত দুই চোখ মুদে।  
যোড়া টগ্বগ ছোটে, ধুলা যায় উড়ে,  
বাঙালি সৈন্যদল চলে মাঠ জুড়ে।  
ইংরেজ দুদাঢ় কোথা দেয় ছুট,  
কোন দূরে মস্মস করে তার বুট।  
বিছানায় শুয়ে শুয়ে শোনো বারে বারে,  
দেশে তার জয়রব ওঠে চারি ধারে।  
যখন হাত-পা নেড়ে করে বক্তৃতা  
কী যে ইংরেজি ফোটে বলা যায় কি তা।  
ক্লাসে কথা বেরোয় না, গলা তার ভাঙা,  
প্রশ্ন শুধালে মুখ হয়ে ওঠে রাঙ্গা।  
কাহিল চেহারা তার, অতি মুখচোরা—  
রোজ পেন্সিল তার কেড়ে নেয় গোরা।  
খবরের কাগজের ছেঁড়া ছবি কেটে  
খাতা সে বানিয়েছিল আঠা দিয়ে এটে।  
রোঁজ তার পাতাগুলি দেখতে সে নেড়ে,  
ভুন্দ একদিন সেটা নিয়ে গেল কেড়ে।  
কালি দিয়ে গাধা লিখে পিঠে দিয়ে ছাপ  
হাততালি দিতে দিতে চ্যাচায় প্রতাপ।  
বাহিরের ব্যবহারে হারে সে সদাই,  
ভিতরের ছবিটাতে জিত ছাড়া নাই।

## ম্যাজিশিয়ান

কুসমি বললে, আছ্ছা দাদামশায়, শুনেছি এক সময়ে তুমি বড়ো বড়ো কথা নিয়ে খুব  
বড়ো বড়ো বই লিখেছিলে ।

জীবনে অনেক দুর্ভূতি করেছি, তা কবুল করতে হবে । ভারতচন্দ্র বলেছেন, সে  
কহে বিষ্টুর মিহা যে কহে বিষ্টুর ।

আমার ভালো লাগে না মনে করতে যে, আমি তোমার সময় নষ্ট করে দিচ্ছি ।

ভাগ্যবান মানুষেরই যোগ্য লোক জোটে সময় নষ্ট করে দেবার ।

আমি বুঝি তোমার সেই যোগ্য লোক?

আমার কপালক্রমে পেয়েছি, খুঁজলে পাওয়া যায় না ।

তোমাকে খুব ছেলেমানুষি করাই?

দেখো, অনেকদিন ধরে আমি গঢ়ীর পোশাকি সাজ পরে এতদিন কাটিয়েছি,  
সেলাম পেয়েছি অনেক । এখন তোমার দরবারে এসে ছেলেমানুষির টিলে কাপড়  
পরে হাঁপ ছেড়েছি । সময় নষ্ট করার কথা বলছি, দিদি—এক সময় তার হৃকুম ছিল  
না । তখন ছিলুম সময়ের গোলাম । আজ আমি গোলামিতে ইন্সফা দিয়েছি । শেষের  
কটা দিন আরামে কাটিবে । ছেলেমানুষির দোসর পেয়ে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে  
বসেছি । যা খুশি বলে যাব, মাথা চুলকে কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না ।

তোমার এই ছেলেমানুষির নেশাতেই তুমি যে খুশি তাই বানিয়ে বলছ ।

কী বানিয়েছি বলো ।

যেমন তোমার ঐ হ.চ.হ. অমনতরো অভূত খ্যাপাটে মানুষ তো আমি দেখি নি ।

দেখো দিদি, এক-একটা জীব জন্মায় যার কাঠামোটা হঠাতে যায় বেঁকে । সে হয়  
মিউজিয়মের মাল । ঐ হ. চ. হ. আমার মিউজিয়মে দিয়েছেন দরা ।

ওঁকে পেয়ে তুমি খুব খুশি হয়েছিলে?

তা হয়েছিলুম । কেননা তখন তোমার ইরুমাসি গিয়েছেন চলে শুশ্রবাড়ি ।  
আমাকে অবাক করে দেবার লোকের অবাব ঘটেছিল । ঠিক সেই সময় এসেছিলেন  
হরীশচন্দ্র হালদার একমাথা টাক নিয়ে । তাঁর তাক লাগিয়ে দেবার রকমটা ছিল  
আলাদা, তোমার ইরুমাসির উল্টো । সেদিন তোমার ইরুমাসি শুরু করেছিল  
জটাইবুড়ির কথা । ঐ জটাইবুড়ির সঙ্গে আমাবস্যার রাত্রে আলাপ পরিচয় হত । সে  
বুড়িটার কাজ ছিল চাঁদে বসে চরকা কাটা । সে চরকা বেশিদিন আর চলল না । ঠিক  
এমন সময় পালা জমাতে এলেন প্রোফেসোর হরীশ হালদার । নামের গোড়ার  
পদবীটা তাঁর নিজের হাতেই লাগানো । তাঁর ছিল ম্যাজিক-দেখানো হাত । একদিন  
বাদলা দিনের সক্ষেবেলায় চায়ের সঙ্গে চিড়েভাজা খাওয়ার পর তিনি বলে বসলেন,  
এমন ম্যাজিক আছে যাতে সামনের ঐ দেয়ালগুলো হয়ে যাবে ফাঁকা ।

পঞ্চানন দাদা টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, এ বিদ্যে ছিল বটে ঋষিদের  
জানা ।

শুনে প্রোফেসার রেগে টেবিল চাপড়ে বললেন, আরে রেখে দিন আপনার মুনি  
ঝুঁঝি, দৈত্য দানা, ভূত প্রেত।

পঞ্চানন দাদা বললেন, আপনি তবে কী মানেন।

হয়ীশ একটিমাত্র ছোটো কথায় বলে দিলেন, দ্রব্যগুণ।

আমরা ব্যস্ত হয়ে বললুম, সে জিনিসটা কী।

প্রোফেসার বলে উঠলেন, আর যাই হোক, বানানো কথা নয়, মন্ত্র নয়, তন্ত্র  
নয়, বোকা-ভুলোনো আজগুবি কথা নয়।

আমরা ধরে পড়লুম, তবে সেই দ্রব্যগুণটা কী।

প্রোফেসার বললেন, বুঝিয়ে বলি। আগুন জিনিসটা একটা আশ্র্য জিনিস, কিন্তু  
তোমাদের ঐ-সব ঝুঁঝি মুনির কথায় জুলে না। দরকার হয় জুলানি কাঠের। আমার  
ম্যাজিকও তাই। সাত বছর হরতকি খেয়ে তপস্যা করতে হয় না। জেনে নিতে হয়  
দ্রব্যগুণ। জানবা মাত্র তুমিও পার আমিও পারি।

কী বলেন প্রোফেসার, আমিও পারি ঐ দেওয়ালটাকে হাওয়া করে দিতে?

পার বৈকি। হিড়িংফিড়িং দরকার হয় না, দরকার হয় মাল-মসলার।

আমি বললুম, বলে দিন-না কী চাই।

দিচ্ছি। কিছু না—কিছু না, কেবল একটা বিলিতি আমড়ার আঁষ্টি আর শিলনোড়ার  
শিল।

আমি বললুম, এ তো খুবই সহজ। আমড়ার আঁষ্টি আর শিল আনিয়ে দেব, তুমি  
দেওয়ালটাকে উড়িয়ে দাও।

আমড়ার গাছটা হওয়া চাই ঠিক আট বছর সাত মাসের। কৃষ্ণদাদশীর চাঁদ  
ঠেবার এক দণ্ড আগে তার অঙ্কুরটা সবে দেখা দিয়েছে। সেই তিথিটা পড়া চাই  
শুরুবারে রাত্রির এক প্রহর থাকতে। আবার শুরুর বারটা অগ্রহায়ণের উনিশে  
তারিখে না হলে চলবে না। ভেবে দেখো বাবা, এতে ফাঁকি কিছুই নেই। দিনখন  
তারিখ সমন্ত পাকা করে বেঁধে দেওয়া।

আমরা ভাবলুম, কথাটা শোনাচ্ছে অত্যন্ত বেশি খাঁটি। বুড়ো মালীটাকে সন্ধান  
করতে লাগিয়ে দেব।

এখনো সামান্য কিছু বাকি আছে। ঐ শিলটা তিক্বতের লামারা কালিম্পঙ্গের  
হাটে বেচতে নিয়ে আসে ধ্বলেশ্বর পাহাড় থেকে।

পঞ্চানন দাদা এ পার থেকে ও পার পর্যন্ত টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, এটা কিছু  
শক্ত ঠেকছে।

প্রোফেসার বললেন, শক্ত কিছুই নয়। সন্ধান করলেই পাওয়া যাবে।

মনে মনে ভাবলুম, সন্ধান করাই চাই, ছাড়া হবে না—তার পরে শিল নিয়ে কী  
করতে হবে।

রোসো, অল্প একটু বাকি আছে। একটা দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চাই।

পঞ্চানন দাদা বললেন, সে শঙ্খ পাওয়া তো সহজ নয়। যে পায় সে যে রাজা  
হয়।

হঁয়া, রাজা হয় না মাথা হয়। শঙ্খ জিনিসটা শঙ্খ। যাকে বাংলায় বলে শাঁখ। সেই শঙ্খটা আমড়ার আঁষি দিয়ে, শিলের উপর রেখে, ঘষতে হবে। ঘষতে ঘষতে আঁষির চিহ্ন থাকবে না, শঙ্খ যাবে শ্ফয়ে। আর, শিলটা যাবে কাদা হয়ে। এইবার এই পিণ্ডিটা নিয়ে দাও বুলিয়ে দেয়ালের গায়। বাস্। এ'কেই বলে দ্রব্যগুণ। দ্রব্যগুণেই দেয়ালটা দেয়াল হয়েছে। মন্তব্য হয় নি। আর দ্রব্যগুণেই সেটা হয়ে যাবে ধোঁয়া, এতে আশ্চর্য কী।

আমি বললুম, তাই তো, কথাটা খুব সত্যি শোনাচ্ছে।

পঞ্চানন দাদা মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন বসে বসে, বাঁ হাতে ছঁকেটা ধ'রে।

আমাদের সন্ধানের জটিতে এই সামান্য কথাটার প্রমাণ হলই না। এতদিন পরে ইরুচি মন্তব্য তত্ত্ব রাজবাড়ি, মনে হল, সব বাজে। কিন্তু, অধ্যাপকের দ্রব্যগুণের মধ্যে কোনোখানেই তো ফাঁকি নেই। দেয়াল রাইল নিরেট হয়ে। অধ্যাপকের 'প'রে আমাদের ভক্তি রাইল অটল হয়ে। কিন্তু, একবার দৈবাঙ কী মনের ভুলে দ্রব্যগুণটাকে নাগালের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, ফলের আঁষি মাটিতে পুঁতে এক ঘটার মধ্যেই গাছও পাওয়া যাবে, ফলও পাওয়া যাবে।

আমরা বললুম, আশ্চর্য।

হ.চ.হ. বললেন, কিন্তু আশ্চর্য নয়, দ্রব্যগুণ। ঐ আঁষিতে মনসাসিজের আঠা একুশবার লাগিয়ে একুশবার শুকোতে হবে। তার পরে পৌতো মাটিতে আর দেখো কী হয়।

উঠে-প'ড়ে জোগাড় করতে লাগলুম। মাস দুয়োক লাগল আঠা মাথাতে আর শুকোতে। কী আশ্চর্য, গাছও হল ফলও ধরল, কিন্তু সাত বছরে! এখন বুঝেছি কাকে বলে দ্রব্যগুণ। হ.চ.হ. বললেন, ঠিক আঠা লাগানো হয় নি।

বুঝলেন, এই ঠিক আঠাটা দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। বুঝতে সময় লেগেছে।

\* \* \*

যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই—

হয় না যা তাই হল ম্যাজিক তবেই।

নিয়মের বেড়াটাতে ভেঙে গেলে খুঁটি

জগতের ইঙ্কুলে তবে পাই ছুঁটি।

অঙ্কর কেলাসেতে অঙ্কই কৰি—

যেখায় সংখ্যাগুলো যদি পড়ে খসি,

বোর্ডের 'প'রে যদি হঠাত নাম্বতা

বোকার মতন করে আম্বতা-আম্বতা,

দুইয়ে দুইয়ে চার যদি কোনো উজ্জ্বাসে

একেবারে চ'ড়ে বসে উনপঞ্চাসে,

ভুল তবু নির্ভুল ম্যাজিক তো সেই;

'পাঁচ-সাতে পঁয়ত্রিশ' এ কোনো মজা নেই।

মিথ্যেটা সতই আছে কোনোখানে,  
কবিরা শুনেছি তারি রাস্তাটা জানে—  
তাদের ম্যাজিকওলা খ্যাপা পদ্যের  
দোকানেতে তাই এত জোটে খন্দের।

## পরী

কুসমি বললে, তুমি বড় বানিয়ে কথা বল। একটা সত্যিকার গল্ল শোনাও-না।

আমি বললুম, জগতে দুরকম পদার্থ আছে। এক হচ্ছে সত্য, আর হচ্ছে—আরো-সত্য। আমার কারবার আরো-সত্যকে নিয়ে।

দাদামশায়, সবাই বলে, তুমি কী যে বল কিছু বোঝাই যায় না।

আমি বললুম, কথাটা সত্য, কিন্তু ধারা বোঝে না সেটা তাদেরই দোষ।

আরো-সত্য কাকে বলছ একটু বুঝিয়ে বলো-না।

আমি বললুম, এই যেমন তোমাকে সবাই কুসমি বলে জানে। এই কথাটা খুবই সত্য; তার হাজার প্রমাণ আছে। আমি কিন্তু সন্ধান পেয়েছি যে, তুমি পরীস্থানের পরী। এটা হল আরো-সত্য।

খুশি হল কুসমি। বলল, আচ্ছা, সন্ধান পেলে কী করে।

আমি বললুম, তোমার ছিল একজামিন, বিছানার উপরে বসে বসে ভূগোল-বৃত্তান্ত মুখস্থ করছিলে, কখন তোমার মাথা ঠেকল বালিশে, পড়লে ঘুমিয়ে। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। জানলার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ল তোমার মুখের উপরে, তোমার আসমানি রঙের শাড়ির উপরে। আমি সেদিন স্পষ্ট দেখতে পেলুম, পরীস্থানের রাজা চর পাঠিয়েছে তাদের পলাতকা পরীর খবর নিতে। সে এসেছিল আমার জানলার কাছে, তার সাদা চাদরটা উড়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। চর দেখল তোমাকে আগাগোড়া, ভেবে পেল না তুমি তাদের সেই পালিয়ে-আসা পরী কি না। তুমি এই পৃথিবীর পরী বলে তার সন্দেহ হল। তোমাকে মাটির কোল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজ হবে না। এত ভার সহিবে না। ক্রমে চাঁদ উপরে উঠে গেল, ঘরের মধ্যে ছায়া পড়ল, চর শিশুগাছের ছায়ায় মাথা নেড়ে চলে গেল। সেদিন আমি খবর পেলুম, তুমি পরীস্থানের পরী, পৃথিবীর মাটির ভারে বাঁধা পড়ে গেছ।

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, আমি পরীস্থান থেকে এলুম কী করে।

আমি বললুম, সেখানে একদিন তুমি পারিজাতের বনে প্রজাপতির পিঠে চড়ে উড়ে বেড়াছিলে, হঠাৎ তোমার চোখে পড়ল দিগন্তের ঘাটে এসে ঠেকেছে একটা খেয়ানৌকো। সেটা সাদা মেঘ দিয়ে গড়া, হাওয়া লেগে দুলছে। তোমার কী মনে হল, তুমি উঠে পড়লে সেই নৌকোয়। নৌকো চলল ভেসে, ঠেকল এসে পৃথিবীর ঘাটে, তোমার মা নিলেন কুড়িয়ে।

কুসমি ভারি খুশি হয়ে বললে হাততালি দিয়ে, দাদামশায়, আচ্ছা, এ কি সত্যি।

আমি বললুম, ঐ দেখো, কে বললে সত্যি। আমি কি সত্যিকে মানি। এ হল আরো-সত্যি।

কুসমি বললে, আচ্ছা, আমি কি পরীস্থানে ফিরে যেতে পারব না।

আমি বললুম, পারতেও পার, যদি তোমার স্বপ্নের পালে পরীস্থানের হাওয়া এসে লাগে।

আচ্ছা, যদি হাওয়া লাগে তবে কোন্ রাস্তায় কোথা দিয়ে কোথায় যাব। সে কি অনেক দূরে।

আমি বললুম, সে খুব কাছে।

কত কাছে।

যত কাছে তুমি আছ আর আমি আছি। ঐ বিছানার বাইরে যেতে হবে না। আর-একদিন জানলা দিয়ে পড় ক এসে জ্যোৎস্না; এবার যখন তুমি তাকিয়ে দেখবে বাইরে, তোমার আর সন্দেহ হবে না। তুমি দেখবে জ্যোৎস্নার স্মৃতি বেয়ে মেঘের খেয়ালোকা এসে পৌঁচছে। কিন্তু, তুমি যে এখন পৃথিবীর পরী হয়েছ, ও নৌকোয় তোমার কুলোবে না। এখন তুমি তোমার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, কেবল তোমার মন থাকবে তোমার সাথি। তোমার সত্য থাকবে এই পৃথিবীতে পড়ে আর তোমার আরো-সত্য যাবে কোথায় ভেসে, আমরা কেউ তার নাগাল পাব না।

কুসমি বললে, আচ্ছা, এবারে পূর্ণিমারাত এলে আমি ঐ আকাশের পানে তাকিয়ে থাকব। দাদামশায়, তুমি কি আমার হাত ধরে যাবে।

আমি বললুম, আমি এইখানে বসে বসে পথ দেখিয়ে দিতে পারব। আমার সেই ক্ষমতা আছে—কেননা আমি সেই আরো-সত্যের কারবারি।

\* \* \*

যেটা তোমায় লুকিয়ে-জানা সেটাই আমার পেয়ার,

বাপ মা তোমায় যে নাম দিল থোড়াই করি কেয়ার।

সত্য দেখায় যেটা দেখি তারেই বলি পরী,

আমি ছাড়া কজন জানে তুমি যে অঙ্গরী।

কেটে দেব বাঁধা নামের বন্দীর শৃঙ্খল,

সেই কাজতেই লেগে গেছি আমরা কবির দল—

কোনো নামেই কোনো কালে কুলোয় নাকো যাবে

তাহার নামের ইশারা দেই ছন্দে ঝংকাবে।

## আরো-সত্য

দাদাদমশায়, সেদিন তুমি যে আরো-সত্যির কথা বলছিলে, সে কি কেবল পরীস্থানেই দেখা যায়।

আমি বললুম, তা নয় গো, এ পৃথিবীতেও তার অভাব নেই। তাকিয়ে দেখলেই হয়। তবে কিনা সেই দেখার চাউনি থাকা চাই।

তা, তুমি দেখতে পাও?

আমার ঐ গুণটাই আছে, যা না দেখবার তাই হঠাৎ দেখে ফেলি। তুমি যখন  
বসে বসে ভূগোল-বিবরণ মুখস্থ কর তখন মনে পড়ে যায় আমার ভূগোল পড়া।  
তোমার ঐ ইয়াৎসিকিয়াৎ নদীর কথা পড়লে চোখেল সামনে যে-জ্যোগ্রাফি খুলে  
যেত তাকে নিয়ে একজামিন পাস করা চলে না। আজও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সারি  
সারি উট চলেছে রেশমের বস্তা নিয়ে। একটা উটের পিঠে আমি পেয়েছিলুম  
জায়গা।

সে কী কথা দাদামশায়। আমি জানি, তুমি কোনোদিন উটে চড় নি।

ঐ দেখো, দিদি, তুমি বড়ো বেশি প্রশ্ন কর।

আচ্ছা, তুমি বলে যাও। তার পরে? উট পেলে তুমি কোথা থেকে।

ঐ দেখো, আবার প্রশ্ন। উট পাই বা না পাই, আমি চড়ে বসি। কোনো দেশে  
যাই বা না যাই, আমার ভ্রমণ করতে বাধে না। ওটা আমার স্বভাব।

তার পরে কী হল।

তার পরে কত শহর গেলেম পেরিয়ে—ফুচুং, হ্যাংচাও, চুংকুং; কত মরক্কোমির  
ভিতর দিয়ে গিয়েছি রান্তির বেলায় তারা দেখে রাস্তা চিনে চিনে। গেলুম উস্বুস  
পাহাড়ের তরাইয়ে। জলপাইয়ের বন দিয়ে, আঙুলের খেত দিয়ে, পাইন গাছের  
ছায়া দিয়ে। পড়েছিলুম ডাকাতের হাতে, সাদা ভালুক সামনে দাঁড়িয়েছিল দুই থাবা  
তুলে।

আচ্ছা, এত যে তুমি ঘুরে বেড়ালে, সময় পেলে কখন।

যখন ক্লাসনুন্দ ছেলে খাতা নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিল।

তুমি পরীক্ষায় পাস করলে তা হলে কী করে।

ওর সহজ উন্তুর হচ্ছে—আমি পাস করি নি।

আচ্ছা, তুমি বলে যাও।

এর কিছুদিন আগে আমি আরব্য উপন্যাসে চীনদেশের রাজকন্যার কথা পড়েছি,  
বড়ো সুন্দরী তিনি। আশ্চর্যের কথা কী আর বলব, সেই রাজকন্যার সঙ্গেই আমার  
হল দেখা। সেটা ঘটেছিল ফুচাও নদীর ঘাটে। সাদা পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাট,  
উপরে নীল পাথরের মণ্ড। দুই ধারে দুই চাপা গাছ, তার তলায় দুই পাথরের  
সিংহের মৃত্তি। পাশে সোনার ধূনুচি থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে ধোঁয়া। একজন  
দাসী পাখা করছিল, একজন চামর দোলাছিল, একজন দিছিল চুল বেঁধে। আমি  
কেমন করে পড়ে গেলুম তাঁর সামনে। রাজকন্যা তখন তাঁর দুধের মতো সাদা  
ময়ূরকে দাঢ়িমের দানা খাওয়াচ্ছিলেন, চমকে উঠে বললেন, কে তুমি।

সেই মুহূর্তেই ফস্ করে আমার মনে পড়ে গেল যে, আমি বাংলাদেশের  
রাজপুত্র।

সে কী কথা। তুমি তো—

ঐ দেখো, আবার প্রশ্ন? আমি বলছি, সেদিন ছিলুম বাংলাদেশের রাজপুত্র, তাই

তো বেঁচে গেলুম। নইলে সে তো দূর করে তাড়িয়ে দিত আমাকে। তা না করে, দিলে সোনার পেয়ালায় চা খেতে। চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে মেশানো সেই চা, গক্ষে আকুল করে দেয়।

তা হলে কি তোমাকে বিয়ে করল নাকি!

দেখো, ওটা বড়ো গোপন কথা। আজ পর্যন্ত কেউ জানে না।

কুসমি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, বিয়ে নিশ্চয়ই হয়েছিল, খুব ঘটা করে হয়েছিল।

দেখলুম, বিয়েটা না হলে ও বড়ো দুঃখিত হবে। শেষকালে হল বিয়ে। হ্যাঁচাও শহরের আঙ্কেক রাজতৃত্ব আর শ্রীমতী আংচনী দেবীকে লাভ করলুম। করে—

করে কী হল। আবার বুঝি সেই উটে চড়ে বসলে?

নইলে এখানে ফিরে এসে দাদামশায় হলেম কী করে। হ্যাঁ, চড়েছিলুম—সে উট কোথাও যায় না। মাথার উপর দিয়ে ফুসুং পাখি গান গেয়ে চলে গেল।

ফুসুং-পাখি? সে কোথায় থাকে।

কোথাও থাকে না; কিন্তু তার লেজ নীল, তার ডানা বাসন্তী, তার ঘাড়ের কাছে বাদামী, ওরা দলে দলে উড়ে গিয়ে বসল হাচাং গাছে।

হাচাং গাছের তো আমি নাম শুনি নি।

আমিও শুনি নি, তোমাকে বলতে বলতে এইমাত্র মনে পড়ল। আমার ঐ দশা, আমি আগে থাকতে তৈরি হই নে। তখনি তখনি দেখি, তখনি তখনি বলি। আজ আমার ফুসুং পাখি উড়ে চলে গেছে সমুদ্রের আর-এক পারে। অনেকদিন তার কোনো খবর নেই।

কিন্তু, তোমার বিয়ের কী হল। সেই রাজকন্যা?

দেখো, চুপ করে যাও। আমি কোনো জবাব দেব না। আর তা ছাড়া, তুমি দুঃখ কোরো না, তখনো তুমি জন্মাও নি—সে কথা মনে রেখো।

\* \* \*

আমি যখন ছোটো ছিলুম, ছিলুম তখন ছোটো;

আমার ছুটির সঙ্গী ছিল ছবি আঁকার পোটো।

বাড়িটা তার ছিল বুঝি শঙ্গী নদীর মোড়ে,

নাগকন্যা আসত ঘাটে শাখের নৌকো চড়ে।

ঠাপার মতো আঙুল দিয়ে বেণীর বাঁধন খুলে

ঘন কালো চুলের শুচে কী চেউ দিত তুলে।

রৌদ্র-আলোয় ঝলক দিয়ে বিদ্যুবারির মতো

কাটির 'পরে পড়ত ঝরে মুক্তা মানিক কত।

নাগকেশরের তলায় বসে পদ্মফুলের কুঁড়ি

দূরের থেকে কে দিত তার পায়ের তলায় ছুঁড়ি।

একদিন সেই নাগকুমারী বলে উঠল, কে ও।

জবাব পেলে, দয়া করে আমার বাড়ি যেয়ো।

রাজপ্রাসাদের দেউড়ি সেথায় শ্বেত পাথরে গাঁথা,  
 মণিপে তার মুকুটাকালৰ দোলায় রাজাৰ ছাতা।  
 ঘোড়সওয়াৰি সৈন্য সেথায় চলে পথে পথে,  
 রক্ষবৱন ধৰজা ওড়ে তিৰিশঘোড়াৰ রথে।  
 আমি থাকি মালঘেঠে রাজবাগানেৰ মালী,  
 সেইখানেতে যূথীৰ বনে সন্ধ্যাপ্ৰদীপ জ্বালি।  
 রাজকুমাৰীৰ তৰে সাজাই কনকচাপার ডালা,  
 বেণীৰ বাঁধন-তৰে গাঁথি শ্বেতকৰবীৰ মালা।  
 মাধবীতে ধৰল কুড়ি, আৱ হবে না দেৱি—  
 তুমি যদি এস তবে ফুটবে তোমায় ঘেৱি।  
 উঠবে জেগে রঞ্জনশুচ পায়েৰ আসনটিতে,  
 সামনে তোমার কৱবে নৃত্য ময়ূৰ-ময়ূৰীতে।  
 বনেৰ পথে সাবি সাবি রজনীগন্ধায়  
 বাতাস দেবে আকুল কৱে ফাগুনি সক্ষ্যায়।

বলতে বলতে মাথাৰ উপৰ উড়ল হাঁসেৰ দল,  
 নাগকুমাৰী মুখেৰ 'পৰে টানল নীলাঞ্চল।  
 ধীৱে ধীৱে নদীৰ 'পৰে নামল নীৱৰ পায়ে,  
 ছায়া হয়ে গেল কখন চাঁপাগাছেৰ ছায়ে।  
 সন্ধ্যামেঘেৰ সোনাৰ আভা মিলিয়ে গেল জলে।  
 পাতল রাতি তাৱা-গাঁথা আসন শূন্যতলে।

## ম্যানেজারবাৰু

আজ তোমাকে যে গল্পটা বলব মনে কৱেছি সেটা তোমার ভালো লাগবে না।

তুমি বললেও ভালো লাগবে না কেন।

যে লোকটাৰ কথা বলব সে চিতোৱ থেকে আসে নি কোনো রানা-মহারানাৰ দল  
 ছেড়ে—

চিতোৱ থেকে না এলে বুঝি গল্প হয় না?

হয় বৈকি—সেইটাই তো প্ৰমাণ কৱা চাই। এই মানুষটা ছিল সামান্য একজন  
 জমিদাৱেৰ সামান্য পাইক। এমন-কি, তাৱ নামটাই ভুলে গেছি। ধৰে নেওয়া যাক  
 সুজনলাল মিশিৰ। একটু নামেৰ গোলমাল হলে ইতিহাসেৰ কোনো পণ্ডিত তা নিয়ে  
 কোনো তৰ্ক কৱবে না।

সেদিন ছিল যাকে বলে জমিদাৱি সেৱেন্টাৱ 'পুণ্যাহ', খাজনা-আদায়েৰ প্ৰথম  
 দিন। কাজটা নিতান্তই বিষয়-কাজ। কিন্তু, জমিদাৱি মহলে সেটা হয়ে উঠেছে  
 একটা পাৰ্বণ। সবাই খুশি—যে খাজনা দেয় সেও, আৱ যে খাজনা বাঞ্ছতে ভৰ্তি  
 কৱে সেও। এৱ মধ্যে হিসেব মিলিয়ে দেখবাৰ গুৰু ছিল না। যে যা দিতে পাৱে

তাই দেয়, প্রাপ্য নিয়ে কোনো তক্রার করা হয় না। খুব ধূমধাম, পাড়াগেঁয়ে সানাই অত্যন্ত বেসুরে আকাশ মাতিয়ে তোলে। নতুন কাপড় পরে প্রজারা কাছারিতে সেলাম দিতে আসে। সেই পুণ্যাহের দিনে ঢাক ঢোল সানাইয়ের শব্দে জেগে উঠে ম্যানেজারবাবু ঠিক করলেন, তিনি স্নান করবেন দুধে। চারি দিকে সমারোহ দেখে হঠাতে তাঁর মনে হল, তিনি তো সামান্য লোক নন। সামান্য জলে তাঁর অভিষেক কী করে হবে। ঘড়া ঘড়া দুধ এল গোয়ালা প্রজাদের কাছ থেকে। হল তাঁর স্নান। নাম বেরিয়ে গেল চারি দিকে; সেদিন তিনি সঙ্ক্ষ্যাবেলায় খুশিমনে বাসার রোয়াকে বসে গুড়গুড়ি টানছেন, এমন সময় মিশির সর্দার, ব্রাঞ্ছণের ছেলে, লাঠিখেলা নিয়ে খুব নাম করেছে, বললে, হজুর আপনার নিমিক তো খেয়েছি অনেককাল, কিন্তু অনেকদিন বসে আছি, আমাকে তো কাজে লাগালেন না। যদি কিছু করবার থাকে তো হ্রস্ব করুন।

ম্যানেজার গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন। মনে পড়ে গেল একটা কাজের কথা। জিসিম মন্তব্য চর মহলের প্রজা, তাঁর খেত ছিল পাশের জমিদারের সীমানা-ঘেঁষা। ফসল জন্মালৈ প্রতিবেশী জমিদার লোকজন নিয়ে প্রজাকে আটকাত। দায়ে পড়ে জিসিমের দুই জমিদারেরই খাতায় আর দু জায়গাতেই খাজনা দিয়ে ফসল সামলাতে হত। যে ম্যানেজার দুধে স্নান করেন এটা তাঁর ভালো লাগে নি। এ বছরের জলিধানের ফসল কাটাবার সময় আসছে—এটা চরের বিশেষ ফসল। চরের জমির জল নেমে গেলেই কৃষ্ণ পলিমাটিতে বীজ ছিটিয়ে দেয়, শ্রাবণ-ভদ্র মাসে ফসল গোলায় তোলে। এ বছরটা ছিল ভালো; ধানের শিষে সমস্ত মাঠ হি হি করছে। এবারকার ফসল বেদখল হলে ভারি লোকসান।

ম্যানেজার বললেন, সর্দার, একটা কাজ আছে। জিসিমের জমিতে তোমাকে ধান আগলাতে হবে। একা তোমারই উপরে ভার। দেখব কেমন মরদ তুমি।

ম্যানেজার তখনো দুধের স্নানের গুমোর হজম করে উঠতে পারেন নি। মিশিরকে হ্রস্ব দিয়ে গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন।

ধান কাটার সময় এল। দিন নেই, রাত নেই, মিশির জিসিমের খেতে পাহারা দেয়।

একদিন ভরা খেতে অন্য পক্ষের লোক হল্লা করে এল, মিশির বুক ফুলিয়ে বললে, বাবা-সকল, আমি থাকতে এ ধান তোমাদের ঘরে উঠবে না। সেলাম ঠুকে চলে যাও।

মিশির যত বড়ো সর্দার হোক, সেদিন সে একলা। যখন তাকে ঘেরাও করলে সে গুটিসুটি মেরে বসে সবাইকে আটকাতে লাগল।

অপর পক্ষের লোক বলল, দাদা, পারবে না। কেন প্রাণ দেবে!

মিশির বললে, নিমিক খেয়েছি, প্রাণ যায় যাক; নিমকের মান রাখতেই হবে।

চলল দাঙ্গা—শুধু লাঠির মার হলে হয়তো মিশির ঠেকাতেও পারত। অপর পক্ষে সড়কি চালাল। একটা এসে বিধল মিশিরের পায়ে।

অপর পক্ষ আবার তাকে সতর্ক করে বললে, আর কেন। এবার ক্ষান্ত দে ভাই।

মিশির বললে, মিশির সর্দার প্রাণের ভয় করে না, ভয় করে বেইমানির।

শেষকালে একটা সড়কি এসে বিধল তার পেটে। এটা হল মরণের মার। পুলিশের হাতে পড়াবার ভয়ে অপর পক্ষ পালাবার পথ দেখলে। মিশির সড়কি টেনে উপড়ে, পেটে চাদর জড়িয়ে ছুটল তাদের পিছন-পিছন। বেশি দূরে যেতে পারলে না। পড়ে গেল মাটিতে।

পুলিশ এল। মিশির জমিদারকে বাঁচাবার জন্য, তাঁর নামও করলে না। বললে, আমি জসিমের চাকরি নিয়ে তার ধান আগলাঞ্চিলুম।

ম্যানেজার সব খবর পেলেন। গুড়গুড়ি লাগলেন টানতে।

তাঁর দুধের স্নানের খ্যাতি—এ তো যে-সে লোকের কর্ম নয়। কিন্তু, নিম্নক  
খয়েছে যখন তখন প্রাণ দেওয়া—এটা এতই কী আশ্চর্য। এমন তো ঘটেই  
থাকে। কিন্তু, দুধে স্নান!

\* \* \*

তুমি ভাবো এই-যে বেঁটা  
কিছুই বুঝি নয়কো ওটা,  
ফুলের গুমোর সবার চেয়ে বড়ো—  
বিমুখ হয়ে আজ যদি ও  
আলগা করে বাঁধন স্থীয়  
তখনি ফুল হয় যে পড়ো-পড়ো।  
বেঁটাই ওকে হাওয়ায় নাচায়,  
অপমানের থেকে বাঁচায়,  
ধরে রাখে সূর্যালোকের ভোজে;  
বুক ফুলিয়ে দেয় না দেখা,  
গোপনে রয় একা একা,  
নিচু হয়ে সবার উপর ও যে।  
বনের ও তো আদুরে নয়,  
শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়,  
গায়েতে ওর নাইকো অলংকার;  
রস জোগায় সে চুপে চুপে,  
থাকে নিজে নীরস রূপে,  
আপন জোরে বহে আপন ভার।  
কঁটা যখন উঁচিয়ে থাকে  
অঙ্গস্তু কেউ কয় না তাকে—  
যতই কিন্তু করুক-না বদনাম,  
পশুর কামড় থেকে যারে  
বাঁচিয়ে রাখে বারে বারে  
সেই তো জানে কঁটার কত দাম।

## বাচস্পতি

দাদামশায়, তুমি তোমার চার দিকে যে-সব পাগলের দল জমিয়েছিলে, গুণ হিসেব  
করে তাদের বুঝি সব নম্বর দিয়ে রেখেছিলে?

হ্যাঁ, তা করতে হয়েছে বৈকি। কম তো জমে নি।

তোমার পয়লা নম্বর ছিলেন বাচস্পতি মশায়, তাঁকে আমার ভারি মজা লাগে।

আমার শুধু মজা লাগে না, আশ্চর্য লাগে। কারণ বলি— কবিতা লিখে থাকি।  
কথা বাঁকানো-চোরানো আমাদের ব্যাবসা। যে শব্দের কোনো সাদা মানে আছে  
তাকে আমরা ধৰনি লাগিয়ে তার চেহারা বদল করি। সে এক রকমের জানুবিদ্যা  
বললেই হয়। কাজটা সহজ নয়। আমাদের বাচস্পতি আমাকে আশ্চর্য করে  
দিয়েছিলেন যখন দেখলুম তিনি একেবারে গোড়াগুড়ি ভাষা বানিয়েছেন। কান দিয়ে  
ধৰনির রাস্তায় তার মানের রাস্তা খুঁজতে হয়। আমাদের কাজটাও অনেকটা তাই,  
কিন্তু এতদূর পর্যন্ত নয়। আমরা তবু ব্যাকরণ অভিধান মেনে চলি। বাচস্পতির ভাষা  
চলত সে-সমস্তই ডিঙিয়ে। শুনলে মনে হত যেন কী একটি মানে আছে! মানে ছিল  
বৈকি। কিন্তু, সেটা কানের সঙ্গে ধৰনি মিলিয়ে আন্দাজ করতে হত। আমার  
'অভুত-রত্নাকর' সভার প্রধান পঞ্জি ছিলেন বাচস্পতি মশায়। প্রথম বয়সে পড়াশুনা  
করেছিলেন বিশ্ব, তাতে মনের তলা পর্যন্ত গিয়েছিল ঘূলিয়ে। হঠাৎ এক সময়ে  
তাঁর মনে হল, ভাষার শব্দগুলো চলে অভিধানের আঁচল ধরে। এই গোলামি ঘটেছে  
ভাষার কলিযুগে। সত্যযুগে শব্দগুলো আপনি উঠে পড়ত মুখে। সঙ্গে সঙ্গেই মানে  
আনত টেনে। তিনি বলতেন, শব্দের আপন কাজই হচ্ছে বোঝানো, তাকে আবার  
বোঝাবে কে। একদিন একটা নমুনা শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন। বললেন, আমার  
নায়িকা যখন নায়ককে বলেছিল হাত নেড়ে 'দিন রাত তোমার ঐ হিন্দুহিন্দু হিন্দিকারে  
আমার পাঁজগুরিতে তিড়িতক লাগে', তখন তার মানে বোঝাতে পঞ্জিতকে ডাকতে  
হয় নি। যেমন পিঠে কিল মেরে সেটাকে কিল প্রমাণ করতে মহামহোপাধ্যায়ের  
দরকার হয় না।

সভাপতি একদিন বিষয়টা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ওহে বাচস্পতি, সেই ছেলেটার  
কী দশা হল।

বাচস্পতি বললেন, সে ছেলেটার বুঝাকিন্ গোড়া থেকেই ছিল বুঝাত্তুমুল  
গোছের। তার নাম দিয়েছিলাম বিচ্কুম্ভুর।

মথুরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ও নামটা কেন।

বাচস্পতি বললেন, সে যে একেবারেই বিচ্কুম্ভুর। পাঠশালার পেডেভোকে  
দেখলেই তার আন্তারা যেত ফুস্কলিয়ে। বুকের ভিতরে করতে থাকত কুড় কুর  
কুড় কুর। এমন ছেলেকে বেশি পড়ালে সে একেবারেই ফুস্কে যাবে, এ কথাটা  
বলেছিল পাড়ার সবচেয়ে যে ছিল পেড়াস্বর হড় ম্কি। একটু রসুন—বুঝিয়ে বলি।  
পেডেভো কথাটা বালিদ্বীপের কাছে পেয়েছি। তাদের মুখের পঞ্জি শব্দটা আপনিই

হয়ে উঠেছে পেডেভো । ভেবে দেখুন, কত বড়ো ওজন, ওর বিদ্যের বোঝা ঠেলে নিয়ে যেতে দশবিশ জন ডিহিধারী জোয়ানের দরকার হয় । আর পঙ্গিত — ছোঃ, তুড়ি দিয়ে তুড়তুড় করে উড়িয়ে দেওয়া যায় ।

অটলদা বললেন, বাচস্পতি, তোমার আজকেকার বর্ণনাটা যে একেবারেই চলতি গ্রাম্যভাষায় । এ তোমাকে মানায় না । সেই সেদিন যে সাধুভাষা বেরিয়েছিল তোমার মুখ দিয়ে, যার সধৃংসূনিত হার্দিকে বুদ্বুধিদের মন তিংতিড়ি তিংতিড়ি করে ওঠে, সেই ভাষার একটু নমুনা আজ এদের শুনিয়ে দাও । যে ভাষায় ভারতের ইতিহাসটি গেঁথেছে, যার গুরুত্বার হিসেব করে বলেছিলে ডুর্ভূমানিত ভাষা, তার পরিচয়টা চাই । শুনে এদের সকলের আন্তরা ফাঁচকলিয়ে যাক ।

বাচস্পতি মশায় শুরু করলেন, সম্মরাট সমুদ্রগুণের ক্রেক্ষটাকৃষ্ট তৃরিধ্যন্ত পর্যুগাসন উপ্থৎসিত —

একজন সভাসদ বললেন, বাচস্পতি মশায়, উপ্থৎসিত কথাটা শোনাচ্ছে ভালো, ওর মানেটা বুঝিয়ে দিন ।

পঙ্গিতজি বললেন, ওর মানে উপ্থৎসিত ।

তার মানে?

তার মানে উপ্থৎসিত ।

অর্থাৎ

অর্থাৎ, তার মানে হতেই পারে না । মেরেকেটে একটা মানে দিতেও পারি ।  
কী করম ।

ভিরভিংগট ।

আর বলতে হবে না, স্পষ্ট বুঝেছি, বলে যান ।

বাচস্পতি আবার শুরু করে দিলেন, সম্মরাট সমুদ্রগুণের ক্রেক্ষটাকৃষ্ট তৃরিধ্যন্ত পর্যুগাসন উপ্থৎসিত নিরংকরালের সহিত —

মথুরবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কেমন মশায়, বুঝেছেন তো নিরংকরাল —

একেবারে জলের মতো । ওর চেয়ে বেশি বুঝতে চাই নে—মুশকিল হবে ।

বাচস্পতি আবার ধরলেন, নিরংকরালের সহিত অজাতশক্ত অপরিপর্যন্তি গগরায়ণকে পরমতি শয়নে সমুসদ্গারিত করিয়াছিল ।

এই পর্যন্ত বলে বাচস্পতি মশায় একবার সভাস্থ সকলের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন । বললেন, দেখুন একবার, সহজ কাকে বলে । অভিধানের প্রয়োজনই হয় না ।

সভার লোকেরা বললে, প্রয়োজন হলেই বা পাব কোথায় ।

বাচস্পতি মশায় একটু চোখ টিপে বললেন, ভাবখানা বুঝেছেন তো?

মথুরবাবু বললেন, বুঝেছি বৈকি । সমুদ্রগুণ অজাতশক্তকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিয়েছিলেন । আহা, বাচস্পতি মশায়, লোকটাকে একেবারে সমুসদ্গারিত করে দিলে গো—একেবারে পরমতি শয়নে ।

বাচস্পতি বললেন, ছোটোট একবার এসেছিলেন আমাদের পাড়ার ক্ষুলে বুটের ধূলো দিয়ে যেতে। তখন আমি তাঁকে এই বুগবুলবুলি ভাষায় একটা ইংরেজি তর্জমা শুনিয়েছিলুম।

সভাস্থ সকলেই বললেন, ইংরেজিটা শোনা যাক।

বাচস্পতি পড়ে গেলেন, দি হাবুরফুয়াস ইন্ফ্যাচুফুয়েশন অব আকবর ডর্বেন্ডিক্যালি ল্যাসেরটাইজ্ট্ দি গৰ্বাভিজম্ অফ হ্রায়ুন। শুনে ছোটোট একেবারে টরেটম্ বনে গিয়েছিলেন; মুখ হয়েছিল চাপা হাসিতে ফুস্কায়িত। হেড পেডেভোর চিকির চার ধারে ভেরেভম্ লেগে গেল, সেক্রেটারি চৌকি থেকে তড়তৎ করে উঠিয়ে উঠলেন। ছেলেগুলোর উজবুম্বুরো ফুড়ফুড়োমি দেখে মনে হল, তারা যেন সব ফিরিচুম্বুসের একেবারে চিক্চাকস্ আমদানি। গতিক দেখে আমি চংটকা দিলুম।

সভাপতি বললেন, বাচস্পতি, এইখানেই স্কান্ড দাও হে, আর বেশিক্ষণ চললে পরাগগলিত হয়ে যাব। এখনি মাথাটার মধ্যে তাঙ্গিম্ মাঙ্গিম করছে।

বাচস্পতি আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে সভাপতির ভাষা এতদিনে ওঁদের মুখবুদ্বুদী শব্দে রুবাম্ গৰাম্ করে উঠত।

\* \* \*

যার যত নাম আছে সব গড়া পেটা,  
যে নাম সহজে আসে দেওয়া যাক সেটা—  
এই বলে কাউকে সে ডাকে বুজ্বুল,  
আদ্রুম ডাকত সে যে ছিল অতুল।  
মোতিরাম দাস নিল নাম মুচকুস,  
কাশিরাম মিসির হল পুচফুস।  
পাঁশগাড়ি নাম নিল পাঁচকড়ি ঘোষ,  
আজ হতে বাজ্রাই হল আগতোষ।  
ভুষকুড়ি রায় হল শ্রীমজ্জুমদার,  
কুর্দম হয়ে গেল যে ছিল কেদার।  
যেদিন যৃথীরে নাম দিল ভুজকুশি,  
সেদিন স্বামীর সাথে হল ঘুঘোঘুষি।  
পিচকিনি নাম দিল যবে ললিতারে  
দাদা এসে রাসকেল বলে গেল তারে।  
মিঠে মিঠে নাম যত মানে দিয়ে ঘেরা,  
সে বলত, ভাবীকালে রবে না তো এরা—  
পিণ্ড নাশিবে নাম যদি হয় তিতো,  
ভুজকালি নাম দেখো আমি নিয়েছি তো।  
পাড়ার লোকেরা বলে ঘিরে তার বাড়ি,  
ভাবীকালে পৌছিয়ে দিব তবে গাড়ি।  
বেচারা গতিক দেখে দিল মুখ ঢাকা,  
পিছে পিছে তাড়া করে মেসো আর কাকা।

দিয়েছিল যে মেয়ের নাম উজকুড়ি,  
সঙ্গে উকিল নিয়ে এল তার খুড়ি।  
শনলে সে কেস হবে ডিফারেশনের,  
ছেড়ে দিলে কাজ নাম-পরিবেশনের।

## পান্নালাল

দাদামশায়, তোমার পাগলের দলের মধ্যে পান্নালাল ছিল খুব নতুন রকমের।

জান, দিদি! পাগলরা প্রত্যেকেই নতুন, কারও সঙ্গে কারও মিল হয় না। যেমন তোমার দাদামশায়। বিধাতার নতুন পরীক্ষা। ছাঁচ তিনি ভেঙে ফেলেন। সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে মিল হয়, অসাধারণ পাগলের মিল হয় না। তোমাকে একটা উদাহরণ দেখাই।

আমার দলে একজন পাগল ছিল, তার নাম ত্রিলোচন দাস। সে তিন ক্রোশ পথ না ঘুরে কখনো বাড়ি যেত না।

জিজ্ঞাসা করলে বলত, বাবা, যমের চর চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ফাঁকি দিতে না পারলে রক্ষে নাই। জান তো, আমার বাবা ছিলেন কী রকম একগুঁয়ে মানুষ? পাগল বললেই হয়। কোনোমতেই আমার পরামর্শ মানতেন না। বরাবর তিনি সিধে রাস্তায় বাড়ি গিয়েছেন—তার পরে জান তো? আজ তিনি কোথায়। আর, আমি আজ সাত বছর ধরে পশ্চিমমুখো রাস্তা ধরে আমার পুবের দিকের বাড়িতে যাই। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলি, ভোজুমভলের বাড়িতে আমার পুজোর নেমতন্ত্র।

জগতে যত বুদ্ধিমান আছে সকলেই সিধে রাস্তায় বাড়ি যায়। বিশ্বব্রাহ্মাণ্ডে কেবল একজন আছে যে বাড়ি যেতে তিন ক্রোশ পথ বেঁকে যায়।

আমার দুইনংশের কথা শোনো; সে বাচস্পতির কথা শনে বলত, আহা, লোকটা একেবারে বেহেড হয়ে গেছে। আর, বাচস্পতি তার কথা শনে মুখ টিপে হাসতেন; বলতেন, এই লোকটার মগজে আছে বুজগুলের বাসা।

প্রেসিডেন্ট বললেন, কী হে হাজরা, তোমার বাড়ির হয়েছিল কী!

এতকালের পৈতৃক ঘরটা পথের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। এমন দৌড় মারলে, কোনো চিহ্ন রাখলে না কোথাও।

বল কী!

আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। কলকাতায় হয়েছি মানুষ, বাবার মৃত্যুর পর কিছু টাকা এল হাতে। ঠিক করলেম, পৈতৃক ভিটেটা একবার দেখে আসা দরকার। সেই ভিটের কথা এইটুকু মাত্র জানতুম—পাঁচকুড়ু গ্রামে ছিল তার ভিত, ভোজুঘাটার সাড়ে সাত ক্রোশ তফাতে। শুভদিন দেখে নৌকো করে পৌছলাম ভোজুঘাটায়। কেউ ঠিকনা

বলতে পারলে না। চললেম খুঁজে বের করতে, মুদির দোকান থেকে চিড়ে মুড়কি নিলুম বেঁধে। সাত ক্রোশ পার হতে বাজল রাস্তির ন'টা। চার দিকে পোড়ো জমি, আগাছায় জঙ্গল ভিটের কোনো চিহ্ন নাই। বার বার যাওয়া-আসা করেছি, ভিটে খুঁজে পাই নে রাস্তার দোকানি আমাকে দেখে কী ভাবলে কে জানে, দুর্দশার কথা শুনল আমার কাছে। বললে, এক কাজ করো বাপু, বোড়োগামে বিখ্যাত গণৎকার মধুসূদন জ্যোতিষী কৃষ্ণ দেখে তোমার ভিটের খবর দিতে পারবেন।

কোথা থেকে তিনি খবর পেয়েছেন আমার হাতে কিছু মাল আছে। খুব স্ফূর্তি করে গণনায় বসে গেলেন। অনেক আঁকড়োক কেটে শেষকালে বললেন, আপনার ঘরের সঙ্গে রাস্তার ঘোরতর মন-কমাকষি হয়ে গেছে; একেবারে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ; ভিটে রেগে দৌড় মেরেছে মাসির বাড়িতে।

ব্যস্ত হয়ে বললেম, মাসির বাড়িটা কোথায়।

শুনে বিশ্঵াস করবেন না, একেবারে সাত হাত মাটির নীচে। ঐখানে মানুষ হয়েছিল, ঐখানেই মুখ লুকিয়েছে।

তা হলে এখন উপায়?

আছে উপায়। আপনি যান কলকাতায় ফিরে, উপযুক্ত-মতো কিছু টাকা রেখে যান। ঠিক সাড়ে সাত মাস পরে ফিরে আসবেন। মাসিকে খুশি করে আপনার পৈতৃক বাড়ি ফিরিয়ে আনব। কিন্তু, কিছু দক্ষিণা লাগবে।

আমি বললেম, তা যত লাগে লাগুক, আপনি ভাববেন না। পৈতৃক ভিটে আমার চাই।

আশ্চর্য জ্যোতিষীর বাহাদুরি। সাড়ে সাত মাস পরে ফিরে এসে ভোজুঘাটার থেকে মেপে ঠিক সাড়ে সাত ক্রোশ পেরলুম। যেখানে কিছু ছিল না সেখানে বাসাটা উঠেছে মাথা তুলে। আমি বললুম, কিন্তু গণকঠাকুর, বাসাটা যে ঠেকছে একেবারে চাঁছাপোছা নতুন?

গণকঠাকুর বললেন, হবে না? মাসির বাড়িতে খেয়েদেয়ে একেবারে চিকচিকিয়ে উঠেছে!

আপনারা হাসাহাসি করছেন, কিন্তু এ একেবারে আমার স্বচক্ষে দেখা। আমকাঠের দরজা-জানালা আর তালকাঠের কড়িবরগা। আমার কলেজি বঙ্গুরা কথাটাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আমার বালুকডাঙ্গার বিখ্যাত পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীকে ডাকিয়ে আনলুম বিধান দিতে। তিনি বললেন, সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে পথের সঙ্গে ঘরের আড়াআড়ি নিয়ে।

এর বেশি আর একটিও কথা বলতে চাইলেন না। আমি কলকাতার বন্দুদের ঠেলা দিয়ে বললুম, কেমন!

পান্নালালের গল্লটা শুনে বাচস্পতি মুচকে হেসে বললেন, ভোরঞ্জেল।

\* \* \*

মাটি থেকে গড়া হয়, পুন হয় মাটি,  
আবার গড়িতে তারে দিনরাত খাটি।

একই মসলায় তারে ভাঙে আর গড়ে,  
পুরোনোটা বারে বারে নৃতনেতে চড়ে ।  
গেছে যাহা তাও আছে, এই বিশ্বাসে ।  
ফাঁকা যেথা সেথা মন ফিরে ফিরে আসে ।

## চন্দনী

জানোই তো সেদিন কী কাও । একেবারে তলিয়ে গিয়েছিলেম আর-কি, কিন্তু তলায়  
কোথায় যে ফুটো হয়েছে তার কোনো খবর পাওয়া যায় নি । না মাথা ধরা; না মাথা  
ঘোরা, না গায়ে কোথাও ব্যথা, না পেটের মধ্যে একটুও খোঁচাখুঁচির তাপিদ ।  
যমরাজার চরণলি খবর আসার সব দরজাণ্ডলো বক্ষ করে ফিস্ ফিস্ করে মন্ত্রণা  
করছিল । এমন সুবিধে আর হয় না ! ডাঙ্কারেরা কলকাতায় নবহই মাইল দূরে ।  
সেদিনকার এই অবস্থা ।

সক্ষে হয়ে এসেছে । বারান্দায় বসে আছি । ঘন মেঘ করে এল । বৃষ্টি হবে  
বুঝি । আমার সভাসদ্রা বললে, ঠাকুরদা, এক সময় শুনেছি তুমি মুখে মুখে গল্প  
বলে শোনাতে, এখন শোনাও-না কেন ।

আর-একটু হলেই বলতে যাচ্ছিলুম, ক্ষমতায় ভাঁটা পড়েছে বলে ।

এমন সময় একটি বুদ্ধিমতী বলে উঠলেন, আজকাল আর বুঝি তুমি পার না ?

এটা সহ্য করা শক্ত । এ যেন হাতির মাথায় অঙ্কুশ । আমি বুঝলুম, আজ আমার  
আর নিষ্ঠার নেই । বললুম, পারি নে তা নয় — পারি । তবে কিনা—

বাকিটা আর বলা হল না । মনে মনে তখন রাজপুতনা থেকে গল্প তলপ করতে  
আবশ্য করেছি । খানিকটা কাশলুম । একবার বললুম, রোসো, একবার একটুখানি  
দেখে আসি, কে যেন এল ।

কেউ আসে নি । শেষকালে বসতে হল ।

যমদৃতগুলো মোটের উপরে হাঁদা । একটু নড়তে গেলেই ধূপধাপ করে শব্দ  
করে, আর তাদের শেলশূল-ছুরিছোরাণ্ডলো বন্ধনিয়ে ওঠে । সেদিন কিন্তু  
একেবারে নিঃশব্দ ।

সক্ষ্যা হয়েছে, পথিক চলেছেন গোরুর গাড়িতে করে । পরদিন সকালে  
রাজমহলে পৌছলে নৌকো নিয়ে তিনি যাত্রা করবেন পশ্চিমে । তিনি রাজপুত, তাঁর  
নাম অরিজিং সিংহ । বাংলাদেশে ছোটো কোনো রাজার ঘরে সেনাপতির কাজ  
করতেন । ছুটি নিয়ে চলেছেন রাজপুতনায় । রাত্রি হয়ে এসেছে । গাড়িতে বসে বসে  
ঘূরিয়ে পড়েছেন । হঠাৎ এক সময় জেগে উঠে দেখলেন, গাড়ি চলেছে বনের  
মধ্যে । গাড়োয়ানকে বললেন, ঘাটের রাস্তা ছেড়ে এখানে কেন ।

গাড়োয়ান বললে, আমাকে চিনলেই বুঝবেন কেন ।

তার পাগড়িটা অনেকখানি আড় করে পরা ছিল। সোজা করে পরতেই অরিজিং বললেন, চিনেছি। ডাকাতের সর্দার পরাক্রমসিংহের চর তুমি। অনেকবার তোমার হাতে পড়েছিলুম, এড়িয়ে এসেছি।

সে বললে, ঠিক ঠাওরেছেন, এবার এড়াতে পারছেন না। চলুন আমার মনিবের কাছে।

অরিজিং বললেন, উপায় নেই, যেতেই হবে। কিন্তু, তোমাদের ইচ্ছে পূর্ণ হবে না। গাড়ি চলল বনের মধ্যে। এর আগের কথাটা এবার খুলে বলা যাক।

অরিজিং বড়ো ঘরের ছেলে। মোগল সম্রাট তাঁর রাজ্য নিলে কেড়ে, তিনি এলেন বাংলাদেশে পালিয়ে। এখান থেকে তৈরি হয়ে একদিন তাঁর রাজ্য ফিরে নেবেন, এই ছিল তাঁর পণ। এ দিকে পরাক্রমসিং মুসলমানদের হাতে তাঁর বিষয়সম্পত্তি হারিয়ে ডাকাতের দল বানিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ের বিবাহের বয়স হয়েছে; অরিজিতের সঙ্গে বিবাহ হয়, এই ছিল তাঁর চেষ্টা। কিন্তু, জাতিতে তিনি অরিজিতের সমান দরের ছিলেন না, তাঁর ঘরের মেয়েকে বিবাহ করতে অরিজিং রাজি নন।

রাত্রি ভোর হয়ে এসেছে। তাঁকে পরাক্রমের দরবারে এনে দাঁড় করালে পরাক্রম বললেন, ভালো সময়েই এসেছ, বিয়ের লগু পড়বে আর দু দিন পরে। তোমার জন্য বরসজ্জা সব তৈরি।

অরিজিং বললেন, অন্যায় করবেন না। সকলেই জানে, আপনার গুষ্ঠিতে মুসলমান রক্তের মিশল ঘটেছে।

পরাক্রম বললেন, কথাটা সত্য হতেও পারে, সেইজন্যেই তোমার মতো উচ্চ কুলের রাজ মিশল করে আমার বৎশের রাজ শুধরে নেবার জন্যে এতদিন চেষ্টা করেছি। আজ সুযোগ এল। তোমার মানহানি করব না। বন্দী করে রাখতে চাই নে, ছাড়া থাকবে। একটা কথা মনে রেখো, এই বন থেকে বেরোবার রাস্তা না জানলে কারোর সাধ্য নেই এখান থেকে পালায়। মিছে চেষ্টা কোরো না, আর যা ইচ্ছা করতে পার।

রাত্রি অনেক হয়েছে। অরিজিতের ঘূম নেই, বসেছেন এসে কাশিনী নদীর ঘাটে বটগাছের তলায়। এমন সময় একটি মেয়ে, মুখ ঘোমটায় ঢাকা, তাঁকে এসে বললে, আমার প্রণাম নিন। আমি এখানকার সর্দারের মেয়ে। আমার নাম রঙনকুমারী। আমাকে সবাই চন্দনী বলে ডাকে। আপনার সঙ্গে পিতাজি আমার বিবাহ অনেক দিন থেকে ইচ্ছা করেছেন। শুনলেম, আপনি রাজি হচ্ছেন না। কারণ কী বলুন আমাকে। আপনি কি মনে করেন আমি অস্পৃশ্য।

অরিজিং বললেন, কোনো মেয়ে কখনো অস্পৃশ্য হয় না, শাস্ত্রে বলেছে।

তবে কি আমাকে দেখতে ভালো নয় বলে আপনার ধারণা।

তাও নয়, আপনার ঝুপের সুনাম আমি দূর থেকে শুনেছি।

তবে আপনি কেন কথা দিচ্ছেন না।

অরিজিং বললেন, কারণটা খুলে বলি। করঞ্জের রাজকন্যা নির্মলকুমারী আমার

বহুদূর-সম্পর্কের আঞ্চলিক। তাঁর সঙ্গে ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি। তিনি আজ বিপদে পড়েছেন। মুসলমান নবাব তাঁর পিতার কাছে তাঁর জন্যে দৃত পাঠিয়েছিলেন। পিতা কন্যা দিতে রাজি না হওয়াতে যুদ্ধ বেধে গেল। আমি তাঁকে বাঁচিয়ে আনব, ঠিক করেছি। তার আগে আর-কোথাও আমার বিবাহ হতে পারবে না, এই আমার পণ। করঞ্জের রাজ্যটি ছোটো, রাজাৰ শক্তি অল্প। বেশি দিন যুদ্ধ চলবে না জানি, তার আগেই আমাকে যেতে হবে। চলেছিলেম সেই রাস্তায়, পথের মধ্যে তোমার পিতা আমাকে ঠেকিয়ে রাখলেন। কী করা যায় তাই ভাবছি।

মেয়েটি বললে, আপনি ভাববেন না। এখান থেকে আপনার পালাবার বাধা হবে না, আমি রাস্তা জানি। আজ রাত্রেই আপনাকে বনের বাহিরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। কিছু মনে করবেন না, আপনার চোখ বেঁধে নিয়ে যেতে হবে, কেননা এ বনের পথের সংকেত বাইরের লোককে জানতে দিতে চলেশ্বরীদেবীৰ মানা আছে; তা ছাড়া আপনার হাতে পরাব শিকল। তার যে কী দরকার পথেই জানতে পারবেন।

অরিজিং চোখবাধা হাতবাধা অবস্থায় ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চন্দনীৰ পিছন-পিছন চললেন। সে রাত্রে ডাকাতেৰ দল সবাই ভাঙ খেয়ে বেহোশ। কেবল পাহারায় যে সর্দার ছিল সেই ছিল জেগে। সে বললে, চন্দনী, কোথায় চলেছ।

চন্দনী বললে, দেবীৰ মন্দিৱে।

ঐ বন্দীটি কে।

বিদেশী, ওকে দেবীৰ কাছে বলি দেব। তুমি পথ ছেড়ে দাও।

সে বললে, একলা কেন।

দেবীৰ আদেশ, আর-কাউকে সঙ্গে নেওয়া নিষেধ।

ওৱা বনের বাইরে গিয়ে পৌছল, তখন রাত্রি প্রায় হয়েছে ভোৱ। চন্দনী অরিজিৎকে প্রণাম করে বললে, আপনার আৱ ভয় নেই। এই আমার কঙ্কণ, নিয়ে যান, দরকার হলে পথের মধ্যে কাজে লাগতে পারে।

অরিজিং চললেন দূর পথে। নানা বিষ্ণু কাটিয়ে যতই দিন যাচ্ছে ভয় হতে লাগল, সময়মত হয়তো পৌছতে পারবেন না। বহুকষ্টে করঞ্জের রাজ্যের যখন কাছাকাছি গিয়েছেন খবৰ পেলেন, যুদ্ধের ফল ভালো নয়। দুর্গ বাঁচাতে পারবে না। আজ হোক, কাল হোক, মুসলমানেৰো দখল করে নিতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই। অরিজিং আহারনিদ্বা ছেড়ে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন দুর্গেৰ কাছাকাছি গিয়েছেন, দেখলেন, সেখানে আগুন জুলে উঠেছে। বুৰুলেন মেয়েৰা জহুৰত নিয়েছে। হার হয়েছে তাই সকলে চিতা জুলিয়েছে মৰবাৰ জন্যে। অরিজিং কোনোমতে দুর্গে পৌছলেন। তখন সমস্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। মেয়েৰা আৱ কেউ নেই। পুৰুষৱাৰ তাদেৱ শেষ লড়াই লড়ছে। নিৰ্মলকুমাৰী রক্ষা পেল কিন্তু সে মৃত্যুৰ হাতে, তাঁৰ হাতে নয় এই দুঃখ। তখন মনে পড়ল চন্দনী তাঁকে বলেছিল, তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে পৱ তোমাকে এইখানেই ফিরে আসতে হবে; সেজন্যে, যতদিন হোক, আমি পথ চেয়ে থাকব।

তার পর দুই মাস চলে গেল। ফাল্লুনের শুক্রপক্ষে অরিজিং সেই বনের মধ্যে পৌছলেন। শীখ বেজে উঠল, সানাই বাজল, সবাই পরল নতুন পাগড়ি লাল রঙের, গায়ে ওড়াল বাসন্তীরঙের চাদর। শুভলগ্নে অরিজিতের সঙ্গে চন্দনীর বিবাহ হয়ে গেল।

এই পর্যন্ত হল আমার গল্প। তার পরে বরাবরকার অভ্যাসমত শোবার ঘরের কেদারায় গিয়ে বসলুম। বাদলার হাওয়া বইছিল। বৃষ্টি হবে-হবে করছে। সুধাকাণ্ড দেখতে এলেন, দরজা জানালা ঠিকমত বন্ধ আছে কি না। এসে দেখলেন, আমি কেদারায় বসে আছি। ডাকলেন, কোনো উত্তর নেই। স্পর্শ করে বললেন, ঠাণ্ডা হাওয়া দিছে, চলুন বিছানায়।

কোনো সাড়া নেই। তার পরে চৌষট্টি ঘণ্টা কাটল অচেতনে।

\* \* \*

দিন-খাটুনির শেষে  
বৈকালে ঘরে এসে  
আরামকেদারা যদি যেলে,  
গল্পটি মনগঢ়া,  
কিছু বা কবিতা পড়া,  
সময়টা যায় হেসে-খেলে।  
হোথায় শিমুলবন,  
পাখি গায় সারাখন,  
ফুল থেকে মধু খেতে আসে।  
বোপে ঘুঘু বাসা বেঁধে  
সারাদিন সুর সেধে  
আধো ঘুম ছড়ায় বাতাসে।  
গোয়ালপাড়ার গ্রামে  
মেয়েরা নদীতে নামে,  
কলরব আসে দূর হতে।  
চারি দিকে ঢেউ তোলে,  
বটছায়া জলে দোলে,  
বালিকা ভসিয়া চলে স্নোতে।  
দিয়ে ঝুই বেল জবা  
সাজানো সুস্বস্তা,  
আলাপপ্রালাপ জেগে ওঠে—  
ঠিক সুরে তার বাঁধা,  
মুলতানে তান সাধা,  
গল্প শোনার ছেলে জোটে।

## ধ্বংস

দিদি, তোমাকে একটা হালের খবর বলি।

প্যারিস শহরের অঞ্চ একটু দূরে ছিল তাঁর ছোটো বাসাটি। বাড়ির কর্তার নাম পিয়ের শোপ্য়া। তাঁর সারা জীবন শখ ছিল গাছপালার জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে, তাদের চেহারা, তাদের রঙ, তাদের স্বাদ বদল করে নতুন রকমের সৃষ্টি তৈরি করতে। তাতে কম সময় লাগত না। এক-একটি ফুলের ফলের স্বভাব বদলাতে বছরের পর বছর কেটে যেত। এ কাজে যেমন ছিল তাঁর আনন্দ তেমনি ছিল তাঁর ধৈর্য। বাগান নিয়ে তিনি যেন জানু করতেন। লাল হত নীল, সাদা হত আলতার রঙ, আঁটি যেত উড়ে, খোসা যেত খসে। যেটা ফলতে লাগে ছ মাস তার মেয়াদ কমে হত দু মাস। ছিলেন গরিব, ব্যাবসাতে সুবিধা করতে পারতেন না। যে করত তাঁর হাতের কাজের তারিফ তাকে দামি মাল অমনি দিতেন বিলিয়ে। যার মতলব ছিল দাম ফাঁকি দিতে সে এনে বলত, কী ফুল ফুটেছে আপনার সেই গাছটাতে, চার দিক থেকে লোক আসছে দেখতে, একেবারে তাক লেগে যাচ্ছে।

তিনি দাম চাইতে ভুলে যেতেন।

তাঁর জীবনের খুব বড়ো শখ ছিল তাঁর মেয়েটি। তার নাম ছিল ক্যামিল। সে ছিল তাঁর দিনরাত্রের আনন্দ, তাঁর কাজকর্মের সঙ্গনী। তাকে তিনি তাঁর বাগানের কাজে পাকা করে তুলেছিলেন। ঠিকমত বুদ্ধি করে কলমের জোড় লাগাতে সে তার বাপের চেয়ে কম ছিল না। বাগানে সে মালী রাখতে দেয় নি। সে নিজে হাতে মাটি খুড়তে, বীজ বুনতে, আগাছা নিড়েতে, বাপের সঙ্গে সমান পরিশ্রম করত। এ ছাড়া রেঁধেবেড়ে বাপকে খাওয়ানো, কাপড় শেলাই করে দেওয়া, তাঁর হয়ে চিঠির জবাব দেওয়া — সব কাজের ভার নিয়েছিল নিজে। চেন্ট্নাট গাছের তলায় ওদের ছেট এই ঘরটি সেবায় শান্তিতে ছিল মধুমাখা। ওদের বাগানের ছায়ায় চা খেতে খেতে পাড়ার লোক সে কথা জানিয়ে যেত। ওরা জবাবে বলত, অনেক দামের আমাদের এই বাসা, রাজের মণিমানিক দিয়ে তৈরি নয়, তৈরি হয়েছে দুটি প্রাণীর ভালোবাসা দিয়ে, আর-কোথাও এ পাওয়া যাবে না।

যে ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহের কথা ছিল সেই জ্যাক মাঝে মাঝে কাজে যোগ দিতে আসত; কানে কানে জিগ্গেস করত, শুভদিন আসবে কবে। ক্যামিল কেবলই দিন পিছিয়ে দিত; বাপকে ছেড়ে সে কিছুতেই বিয়ে করতে চাইত না।

জর্মানির সঙ্গে যুদ্ধ বাধল ফ্রান্সের। রাজ্যের কড়া নিয়ম, পিয়েরকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেল। ক্যামিল চোখের জল লুকিয়ে বাপকে বললে, কিছু ভয় কোরো না, বাবা। আমাদের এই বাগানকে আগ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।

মেয়েটি তখন হলদে রঞ্জনীগঙ্কা তৈরি করে তোলবার পরখ করছিল। বাপ বলেছিলেন, হবে না; মেয়ে বলেছিল, হবে। তার কথা যদি খাটে তা হলে যুদ্ধ থেকে বাপ ফিরে এলে তাঁকে অবাক করে দেবে, এই ছিল তাঁর পণ।

ইতিমধ্যে জ্যাক এসেছিল দু দিনের ছুটিতে রণক্ষেত্র থেকে খবর দিতে যে, পিয়ের পেয়েছে সেনানায়কের তক্মা। নিজে না আসতে পেরে তাকে পাঠিলো দিয়েছে এই সুখবর দিতে। জ্যাক এসে দেখলে, সেইদিনই সকালে গোলা এসে পড়েছিল ফুলবাগানে। যে তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার প্রাণসূক্ষ নির্বে ছারখার হয়ে গেল বাগানটি। এর মধ্যে দয়ার হাত ছিল এইটুকু, ক্যামিল ছিল না বেঁচে।

সকলের আশ্চর্য লেগেছিল সভ্যতার জোর হিসাব করে। লম্বা দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েছিল পঁচিশ মাইল তফাত থেকে। একে বলে কালের উন্নতি।

সভ্যতার কত যে জোর, আর-এক দেশে আর-একবার তার পরীক্ষা হয়েছে। তার প্রমাণ রয়ে গেছে ধুলার মধ্যে, আর-কোথাও নয়। সে চীনদেশে। তাকে লড়তে হয়েছিল বড়ো বড়ো দুই সভ্য জাতের সঙ্গে। পিকিন শহরে ছিল আশ্চর্য এক রাজবাড়ি। তার মধ্যে ছিল বহু-কালের-জড়ো করা মন-মাতানো শিল্পের কাজ। মানুষের হাতের তেমন গুণপনা আর-কখনো হয় নি, হবে না। যুক্ত চীনের হার হল; হার হবার কথা, কেননা মার-জখমের কার্দানিতে সভ্যতার অন্তর বাহাদুরি। কিন্তু, হায় রে আশ্চর্য শিল্প, অনেক কালের গুণীদের ধ্যানের ধন, সভ্যতার অল্প কালের আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়েমিড়ে গেল কোথায়। পিকিনে একদিন গিয়েছিলুম বেড়াতে, নিজের চোখে দেখে এসেছি। বেশি কিছু বলতে মন যায় না।

\* \* \*

মানুষ সবার বড়ো জগতের ঘটনা,  
মনে হত, মিছে না এ শাস্ত্রের বটনা।  
তখন এ জীবনকে পবিত্র মেনেছি  
যখন মানুষ বলে মানুষকে জেনেছি।  
ভোরবেলা জানলায় পাখিগুলো জাগালে  
ভাবিতাম, আছি যেন স্বর্গের নাগালে।  
মনে হত, পাকা ধানে বাঁশি যেন বাজানো,  
মায়ের আঁচল-ভরা দান যেন সাজানো।  
তরী যেত মৌলাকাশে সাদা পাল মেলিয়া,  
প্রাণে যেত অজানার ছায়াখানি ফেলিয়া।  
রুনো হাঁস নদীপারে মেলে যেত পাখা সে,  
উত্তলা ভাবনা মোর নিয়ে যেত আকাশে।  
নদীর শুনেছি ধনি কত রাত দুপুরে।  
অঙ্গরী যেত যেন তাল রেখে নৃপুরে।  
পূজার বেজেছে বাঁশি ঘূম হতে উঠিতেই।  
পূজায় পাড়ার হাওয়া ভরে যেত ছুটিতেই।  
বন্ধুরা জুটিতাম কত নব বরষে,  
সুধায় ভরিত প্রাণ সুহাদের পরশে।

পশ্চিমে হেনকালে পথে কঁটা বিছিয়ে  
 সভ্যতা দেখা দিল দাঁত তার খিচিয়ে ।  
 সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা—  
 আজ দেখি কী অঙ্গচি, কী যে অপমানিতা ।  
 কলবল সঘল সিভিলাইজেশনের,  
 তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের ।  
 মানুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অসুরে,  
 আজ দেখি 'পশ্চ' বলা গাল দেওয়া পশ্চরে ।  
 মানুষকে ভুল করে গড়েছেন বিধাতা,  
 কত মারে এত বাঁকা হতে পারে সিধা তা  
 দয়া কি হয়েছে তাঁর হতাশের রোদনে,  
 তাই গিয়েছেন লেগে ভ্রমসংশোধনে ।  
 আজ তিনি নররূপী দানবের বৎশে  
 মানুষ লাগিয়েছেন মানুষের ধৰ্ষনে ।

## ভালোমানুষ

ছিঃ, আমি নেহাত ভালোমানুষ ।

কুসমি বললে, কী যে তুমি বল তার ঠিক নেই । তুমি যে ভালোমানুষ সেও কি  
বলতে হবে । কে না জানে, তুমি ও পাড়ার লোটনগুণার দলের সর্দার নও ।  
ভালোমানুষ তুমি বল কাকে ।

এইবার ঠিক প্রশ্নটা এসেছে তোমার মুখে । ভালোমানুষ তাকেই বলে যে  
অন্যায়ের কাছেও নিজের দখল ছেড়ে দেয়, দরাজ হাতের গুণে নয়, মনের জোর  
নেই বলেই ।

যেমন?

যেমন আজই ঘটেছিল সকালে । বেশ একটুখানি গুছিয়ে নিয়ে লিখতে  
বসেছিলুম, এমনসময় এসে হাজির পাঁচকড়ি । একেবারে সাহারা থেকে সিমুম  
হাওয়ায় বয়ে গেল, শুকিয়ে গেল মনের মধ্যে যা-কিছু ছিল তাজা । ঐ একটি প্রাণী  
বিধাতার কারখানা থেকে বাঁকা হয়ে বেরিয়েছিল, কোনো মানুষের সঙ্গে  
কোনোখানেই জোড় মেলে না । এক সময়ে ক্যাল্কাটাকে উচ্চারণ করেছিল  
কালকুট্টা, সেই অবধি সবাই ওকে ডাকত কালোকুটা । শুনতে শুনতে সেটা ওর  
কানে সয়ে গিয়েছিল । ইঙ্গুলে কেউ ওকে দেখতে পারত না । একদিন আমাদের  
রনেন 'রাঙ্কেল' বলে ঘাড়ের উপর পড়ে ঘুষিয়ে ওর নাক বাঁকিয়ে দিয়েছিল; বলে  
রেখেছিল, এর পরের বারে কান দেবে বাঁকা করে ।

এসেই সে বসল আমার লেখাপড়া করার চৌকিটাতে । ভালোমানুষের মুখ দিয়ে

বেরোল না, ওখানে আমি কাজ করব। ডেক্সের উপর ঝুঁকে যেন অন্যমনে এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। বললে দোষ হত না যে, ওগুলো দরকারি জিনিস, ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না। কিন্তু —কী আর বলব। বললে, অনেককাল দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। শুরু করলে, আহা আমাদের সেই ইঙ্কুলের দিন ছিল কী সুখের। গল্প লাগালে খৌড়া গোবিন্দ ময়রার। দেখি, আন্তে আন্তে সরে যাচ্ছে আমার সোনা-বাঁধানো ফাউন্টেন-পেনটা, চাদরের আড়ালে ওর পকেটের দিকে। বললেই হত, ভুল করছ, কলমটা তোমার নয়, ওটা আমার। কিন্তু, আমি যে ভালোমানুষ, ভদ্রলোকের ছেলে — এতবড়ো লজ্জার কথা ওকে বলি কী করে। ওর চুরিকরা হাতটার দিকে চাইতেই পারলুম না। সন্দেহ করছি লোকটা বলে বসবে, আজ এখানেই থাব। বলতে পারব না, না, সে হবে না। ভাবতে ভাবতে ঘেমে উঠেছি। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল; বলে বসলুম, রমেনের ওখানে আমাকে এখনই যেতে হবে।

কালকুন্তা বললে, ভালো হল, তোমার সঙ্গে একত্রেই যাওয়া যাক। ইঙ্কুল ছেড়ে অবধি তার সঙ্গে একবারও দেখা হয় নি।

কী মুশকিল। ধপ্ করে বসে পড়লুম। বাইরের দিকে তাকিয়ে বললুম, বৃষ্টি পড়ছে দেখছি।

ও বললে, তাতে হয়েছে কী। আমার ছাতা নেই, কিন্তু তোমার সঙ্গে এক ছাতাতেই যেতে পারব।

আর কেউ হলে জোর করেই বলত, সে হবে না। কিন্তু, আমার উপায় নেই। তা, ভালোমানুষ হলেও বিপদে পড়লে আমার মাথাতেও বুদ্ধি জোগায়। আমি বললুম, অত অসুবিধা করবার দরকার কী। তার চেয়ে বরঞ্চ ছাতাটা তুমি নিয়ে যাও, যখনই সুযোগ হবে ফিরিয়ে দিলেই হবে।

আর সে তিলমাত্র দেরি করল না। বললে, প্ল্যানটা শোনাচ্ছে ভালো।

ছাতাটা বগলে করে চট্টপট্ট সরে পড়ল। ভয় ছিল, ফাউন্টেন-পেনের খৌজ উঠে পড়ে। ছাতা ফেরাবার সুযোগ কোনোদিনই হবে না। হায় রে, আমার পনেরো টাকা দামের সিঙ্কের ছাতাটা। ছাতা ফিরবে না, ফাউন্টেন-পেনও ফিরবে না, কিন্তু সবচেয়ে আরামের কথা হচ্ছে — সেও ফিরবে না।

কী বল, দাদামশায়! তোমার সেই ফাউন্টেন-পেন, সেই ছাতা, তুমি ফিরে পাবে না?

ভদ্র বিধান-মতে ফিরে পাবার আশা নেই।

আর, অভদ্র বিধান-মতে?

ভালোমানুষের কুঠিতে সে লেখে না।

আমি তো ভালোমানুষ নই, আমি তাকে চিঠি লিখব — তোমার সে কথা জানবার দরকার হবে না।

আবে ছিছি, না না, সে কি হয়। আর, লিখে হবেই বা কী। সে বলবে আমি নিই নি।

জানি, ও তাই বলবে। কিন্তু, আমরা যে জেনেছি ও চুরি করেছে, সেইটেই  
ওকে আমি জানাতে চাই।

সর্বনাশ! ঠিক সেইটেই ওকে জানাতে চাই নে—ভদ্রলোকের ছেলে চুরি  
করেছে—ছিছি, কতবড়ো লজ্জার কথা। আমার এমন কত গেছে, তুমি তখন  
জন্মাও নি। তখন ব্রাউনিংগের কবিতার আদর নতুন বেড়েছে। খুব আগ্রহ করে  
পড়ছিলুম। আমার সাহিত্যিক বন্ধুকে উৎসাহ করে একটা কবিতা পড়ে শোনালুম।  
তিনি বললেন, এ বইটা আমার নিশ্চয় পড়া চাই, তিনি দিন পরেই ফিরিয়ে দেব।  
আমার মুখ শুকিয়ে গেল। বললুম, এটা আমি এখন পড়ছি। এতই ভালোমানুষের  
সুরে বলেছিলুম যে বইটা রাখতে পারা গেল না। দিনকয়েক পরে খবর নিয়ে  
জানলুম, তিনি গেছেন একটা মকদ্দমার তদ্দুরি করতে বহরমপুরে। ফিরতে দেরি  
হবে। আমার জানা হকারকে বলে দিলুম, ব্রাউনিংগের বড়ো এডিশনটা যদি পাওয়া  
যায় আমাকে যেন জানায়। কিছুদিন পরে খবর পেলাম, পাওয়া গেছে। বইটা বের  
করে দেখালে, আমারই সেই বই। যে পাতাখানায় আমার নাম লেখা ছিল সেই  
পাতাটা ছেঁড়া। কিনে নিলুম। তার পর থেকেই সেই বইখানা লুকিয়ে রাখতে হল,  
যেন আমিই চার। আমার লাইব্রেরি ঘাঁটতে ঘাঁটতে পাছে বইখানা তাঁর হাতে  
ঠেকে। আমার কাছে তাঁর বিদ্যে ধরা পড়েছে, এ কথাটা পাছে তিনি জানতে পান।  
আহা, হাজার হোক, ভদ্রলোক।

আর বলতে হবে না, দাদামশায়, স্পষ্ট বুঝেছি কাকে বলে ভালোমানুষ।

\*       \*       \*

মণিরাম সত্যই স্যায়না,  
বাহিরের ধাক্কা সে নেয় না।  
বেশি করে আপনারে দেখাতে  
চায় যেন কোনোমতে ঠেকাতে।  
যোগ্যতা থাকে যদি থাক-না,  
ঢাকে তারে চাপা দিয়ে ঢাকনা।  
আপনারে ঠেলে রেখে কোণেতে  
তবে সে আরাম পায় মনেতে।  
যেখা তারে নিতে চায় আগিয়ে  
দূরে থাকে সে সভায় না গিয়ে।  
বলে না সে, আরো দে বা খুবই দে;  
ঠেলা নাহি মারে পেলে সুবিধে।  
যদি দেখে টানাটানি খাবারে  
বলে, কী যে পেট ভার, বাবা রে!  
ব্যঙ্গনে নুন নেই, খাবে তা;  
মুখ দেখে বোঝা নাহি যাবে তা।  
যদি শোনে, যা তা বলে লোকরা  
বলে, আহা, ওরা ছেলে-ছোকরা।

পাচু বই নিয়ে গেল না বলে;  
 বলে, খোঁটা দিয়ো নাকো তা বলে।  
 বক্সু ঠকায় যদি, সহিবে;  
 বলে, হিসাবের ভুল দৈবে।  
 ধার নিয়ে যার কোনো সাড়া নেই।  
 বলে তারে, বিশেষ তো তাড়া নেই।  
 যত কেন যায় তারে ঘা মারি  
 বলে, দোষ ছিল বুঝি আমারি।

## মুক্তকুস্তলা

আমার খুদে বক্সুরা এসে হাজির তাদের নালিশ নিয়ে। বললে, দাদামশায় তুমি কি  
আমাদের ছেলেমানুষ মনে কর।

তা, ভাই, ঐ ভুলটাই তো করেছিলুম। আজকাল নিজেরই বয়েসটার ভুল হিসেব  
করতে শুরু করেছি।

রূপকথা আমাদের চলবে না, আমাদের বয়েস হয়ে গেছে।

আমি বললুম, ভায়া, রূপকথার কথাটা তো কিছুই নয়। ওর রূপটাই হল  
আসল। সেটা সব বয়েসেই চলে। আচ্ছা, ভালো, যদি পছন্দ নাহয় তবে দেখি  
খুঁজে-পেতে। নিজের বয়েসটাতে ডুব মেরে তোমাদের বয়েসটাকে মনে আনতে  
চেষ্টা করছি। তার থলি থেকে রূপকথা নাহয় বাদ দিলুম, তার পরের সারে দেখতে  
পাই মৎস্যনারীর উপাখ্যান। সেও চলবে না। তোমরা নতুন যুগের ছেলে, খাঁটি  
খবর চাও; ফস্ক করে জিজ্ঞেস করে বসেব, লেজা যদি হয় মাছের, মুড়ো কী করে  
হবে মানুষের; রোসো, তবে ভেবে দেখি। তোমাদের বয়েসে, এমন-কি,  
তোমাদের চেয়ে কিছু বেশি বয়েসে আমরা ম্যাজিকওয়ালা হৱীশ হালদারকে পেয়ে  
বসেছিলুম। শুধু তাঁর ম্যাজিকে হাত ছিল না, সাহিত্যও কলম চলত। আমাদের  
কাছে সেও ছিল ম্যাজিক-বিশেষ। আজও মনে আছে একটা ঝুল্বুলে খাতায় লেখা  
তাঁর নাটকটা, নাম ছিল মুক্তকুস্তলা। এমন নাম কার মাথায় আসতে পারে! কোথায়  
লাগে সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী। তার পর তার মধ্যে যা-সব লম্বা চালের কথাবার্তা, তার  
বুলিগুলো শুনে মনে হয়েছিল, এ কালিদাসের ছাপ-মারা মাল। বীরাঙ্গনার দাপট কী!  
আর দেশ-উদ্ধারের তাল ঠোকা! নাটকের রাজপুত্রটি ছিলেন স্বয়ং পুরুষাজের ভাগ্নে;  
নাম ছিল রণদুর্ধৰ্ষ সিং। এও একটা নাম বটে, মুক্তকুস্তলার নামের সঙ্গে সমান  
পায়তারা করতে পারে। আমাদের তাক লেগে গেল।

আলেকজান্ডার এসেছিলেন ভারত জয় করতে। রণদুর্ধৰ্ষ বিদায় নিতে এলেন  
মুক্তকুস্তলার কাছে। মুক্তকুস্তলা বললেন, যা ও বীরবর, যুদ্ধে জয়লাভ করে এসো,  
আলেকজান্ডারের মুকুট এনে দেওয়া চাই আমার পায়ের তলায়। যুদ্ধে মারা  
পড়লেও পাবে তুমি দ্বর্গলোক, আর যদি বেঁচে ফিরে এস তো স্বয়ং আছি আমি।

উঁ, কতবড়ো চটাপট হাততালির জায়গা একবার ভেবে দেখো। আমি রাজি হলেম মুক্তকুন্তলা সাজতে, কেননা, আমার গলার আওয়াজটা ছিল মিহি।

আমাদের দালানের পিছন দিকে খানিকটা পোড়ো জমি ছিল, তাকে বলা হত গোলাবাড়ি। সত্ত্বিকার ছেলেমানুষের পক্ষে সেই জায়গাটা ছিল ছুটির স্বর্গ। সেই গোলাবাড়ির একটা ধারে আমাদের বাড়ির ভাঁড়ার ঘর, লোহার গরাদে দেওয়া; সেই গরাদের মধ্যে হাত গলিয়ে বস্তার ফাঁকের থেকে ডাল চাল কুড়িয়ে আনতুম। ইঁটের উনুন পেতে কাঠকোট জোগাড় করে চড়িয়ে দিতুম ছেলেমানুষ খিচুড়ি। তাতে না ছিল নুন, না ছিল ঘি, না ছিল কোনোপ্রকার মসলার বালাই। কোনোমতে আধসিদ্ধ হলে খেতে লেগে যেতুম। মনে হয় নি ভোজের মধ্যে নিন্দের কিছু ছিল। এই গোলাবাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে গোটাকতক বাখারি জোগাড় করে ই. চ. হ. আমাদের বিখ্যাত-নাট্যকার, নানা আয়তনের খবরের কাগজ পূরে জুড়ে একটা স্টেজ খাড়া করেছিলেন। স্টেজ শব্দটা মনে করেই আমাদের বুক ফুলে উঠত। এই স্টেজে আমাকে সাজতে হবে মুক্তকুন্তলা। সব কথা স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু হতভাগিনী মুক্তকুন্তলার দুঃখের দশা কিছু কিছু মনে পড়ে। এইটুকু জানি, তিনি তলোয়ার হাতে বীরপুরুষের সঙ্গে যোগ দিতে গিয়েছিলেন ঘোড়ায় চড়ে। কিন্তু, ঘোড়াটা যে কার সাজবার কথা ছিল সে ঠিক মনে আনতে পারছি নে। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বীরললনা যে স্বদেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বুকে যখন বর্ষা (পাতকাঠি) বিদ্ধ হল, যখন মাটিতে তাঁর মুক্তকুন্তল লুটিয়ে পড়ছে, রণদুর্ধৰ্ষ পাশে এসে দাঁড়ালেন। বীরাঙ্গনা বললেন, বীরবর, আমাকে এখন বিদায় দাও, হয়তো স্বর্গে গিয়ে দেখা হবে। আহা, আবার হাততালির পালা।

অভিনয়ের জোগাড়যন্ত্র মোটামুটি একরকম হয়ে এসেছিল। হরীশচন্দ্র কোথা থেকে এনেছিলেন নানা রকমের পরচুলো গৌফদাঢ়ি। বউদিদির হাতে পায়ে ধরে দুটো-একটা শাড়িও জোগাড় করেছিলুম। তাঁর কৌটা থেকে সিদুর নিয়ে সিঁথেয় পরবার সময় কোনো ভাবনা মনে আসে নি। স্কুলে যাবার সময় ভুলেছিলুম তার দাগ মুছতে। ছেলেদের মধ্যে মন্ত হাসি উঠেছিল। কিছুদিন আমার ক্লাসে মুখ দেখাবার জো বাটুল না। নাটকের অভিনয়ে সবচেয়ে ফল দেখা গেল এই হাসিতে। আর, বাকিটুকু হয়ে গেল একেবারে ফাঁকি। যেখানে আমাদের স্টেজের বাখারি পৌতা হয়েছিল ঠিক সেই জায়গায় সেজদাদা কুস্তির আখড়া পন্তন করলেন। মুক্তকুন্তলার সবচেয়ে দুঃখের দশা হল যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, এই কুস্তির আজড়ায়। রণদুর্ধর্ষকে মিহি গলায় বলবার সুযোগ পেলেন না, হে বীরবর, স্বর্গে তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে। তার বদলে বলতে হল, সাড়ে নটা বাজল, স্কুলের গাড়ি তৈরি।

এর থেকেই বুবাবে, আমরা যখন ছেলেমানুষ ছিলেম সে ছিলেম খাঁটি ছেলেমানুষ।

\* \* \*

'দাদা হব' ছিল বিষম শব্দ—

তখন বয়স বারো হবে,

কড়া হয় নি তুক।

স্টেজ বেঁধেছি ঘরের কোণে,  
বুক ফুলিয়ে ক্ষণে ক্ষণে  
হয়েছিল দাদার অভিনয়;  
কাঠের তরবারি মেরে  
দাঢ়ি-পরা বিপক্ষেরে  
বারে বারেই করেছিলুম জয় ।

আজ খসেছে মুখোশটা সে,  
আরেক লড়াই চারি পাশে—  
মারছি কিছু অনেক খাছি মার ।

দিন চলেছে অবিরত,  
ভাবনা মনে জমছে কত,  
যোলো-আনা নয় সে অহংকার ।

দেখছে নতুন পালার দাদা  
হাত দুটো তার পড়ছে বাঁধা  
এ সংসারের হাজার গোলামিতে ।

তরুও সব হয় নি ফাঁকি,  
তহবিলে রয় যা বাকি  
কাজ চলছে দিতে এবং নিতে ।

সঙ্গ হয়ে এল পালা,  
নাট্যশৈরের দীপের মালা  
নিভে নিভে যাচ্ছে কুমে কুমে ।

রঞ্জন ছবির দৃশ্য রেখা  
বাপসা চোখে যায় না দেখা,  
আলোর চেয়ে দোঁয়া উঠছে জমে ।

সময় হয়ে এল এবার  
স্টেজের বাঁধন খুলে দেবার,  
নেবে আসছে আঁধার-যবনিকা ।

খাতা হাতে এখন বুঝি  
আসছে কানে কলম গুঁজি  
কর্ম যাহার চরম হিসাব লিখা ।

চোখের 'পরে দিয়ে ঢাকা  
ভোলা মনকে ভুলিয়ে রাখা  
কোনোমতেই চলবে না তো আর ।

অসীম দূরের প্রেক্ষণীতে  
পড়বে ধরা শেষ গণিতে  
জিত হয়েছে কিংবা হল হার ।

## পরীর পরিচয়

রাজপুত্রের বয়স কুড়ি পার হয়ে যায়, দেশবিদেশ থেকে বিবাহের সম্ভব আসে। ঘটক বললে, “বাহলীকরাজের মেয়ে রূপসী বটে, যেন সাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি।”

রাজপুত্র মুখ ফিরিয়ে থাকে, জবাব করে না।

দৃত এসে বললে, “গান্ধাররাজের মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ফেটে পড়ছে, যেন দ্রাক্ষালতায় আঙুরের গুচ্ছ।”

রাজপুত্র শিকারের ছলে বনে চলে যায়। দিন যায়, সশ্রাহ যায়, ফিরে আসে না।

দৃত এসে বললে, “কাহোজের রাজকন্যাকে দেখে এলেম; ভোলবেলাকার দিগন্তেরেখাটির মতো বাঁকা চোখের পল্লব, শিশিরে স্নিখ, আলোতে উজ্জ্বল।”

রাজপুত্র ভর্তৃহরির কাব্য পড়তে লাগল, পুঁথি থেকে চোখ তুলল না।

রাজা বললে, “এর কারণ? ডাকো দেখি মন্ত্রীর পুত্রকে।”

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা বললে, “তুমি তো আমার ছেলের মিতা, সত্য করে বলো, বিবাহে তার মন নেই কেন।”

মন্ত্রীর পুত্র বললে, “মহারাজ, যখন থেকে তোমার ছেলে পরীস্থানের কাহিনী শুনেছে সেই অবধি তার কামনা, সে পরী বিয়ে করবে।

### ২

রাজার হৃকুম হল, পরীস্থান কোথায় খবর চাই।

বড়ে বড়ো পণ্ডিত ডাকা হল, যেখানে যত পুঁথি আছে তারা সব খুলে দেখলে। মাথা নেড়ে বললে, পুঁথির কোনো পাতায় পরীস্থানের কোনো ইশারা মেলে না।

তখন রাজসভায় সওদাগরদের ডাক পড়ল। তারা বললে, “সমুদ্র পার হয়ে কত দীপেই ঘুরলেম—এলাদীপে, মরীচদীপে, লবঙ্গলতার দেশে। আমরা গিয়েছি মলয়দীপে চন্দন আনতে, মৃগনাভির সঙ্কানে গিয়েছি কৈলাসে দেবদারূবনে। কোথায় পীরস্থানের কোনো ঠিকানা পাই নি।”

রাজা বললে, “ডাকো মন্ত্রীর পুত্রকে।”

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, “পরীস্থানের কাহিনী রাজপুত্র কার কাছে শুনেছে।

মন্ত্রীপুত্র বললে, “সেই যে আছে নবীন পাগলা, বাঁশি হাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, শিকার করতে গিয়ে রাজপুত্র তারই কাছে পরীস্থানের গল্প শোনে।”

রাজা বললে, ‘আচ্ছা ডাকো তাকে।’

নবীন পাগলা এক মুঠো বনের ফুল ভেট দিয়ে রাজার সমানে দাঢ়াল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, “পরীস্থানের খবর তুমি কোথায় পেলে ।”

সে বললে, “সেখানে তো আমার সদাই যাওয়া-আসা ।”

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, “কোথায় সে জায়গা ।”

পাগলা বললে, “তোমার রাজ্যের সীমানায় চিরগিরি পাহাড়ের তলে, কাম্যক-সরোবরের ধারে ।”

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, “সেইখানে পরী দেখা যায়?”

পাগলা বললে, “দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। তারা ছদ্মবেশে থাকে। কখনো কখনো যখন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর ধরবার পথ থাকে না।”

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি তাদের চেন কী উপায়ে ।”

পাগলা বললে, “কখনো-বা একটা সুর শুনে, কখনো-বা একটা আলো দেখে ।”

রাজা বিরক্ত হয়ে বললে, “এর আগাগোড়া সমস্তই পাগলামি একে তাড়িয়ে দাও ।”

### ৩

পাগলার কথা রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজল।

ফালুনমাসে তখন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, আর শিরীষফুলে বনের প্রান্ত শিউরে উঠেছে। রাজপুত্র চিরগিরিতে একা চলে গেল।

সবাই জিজ্ঞাসা করলে, “কোথায় যাচ্ছ ।”

সে কোনো জবাব করলে না।

গুহার ভিতর দিয়ে একটি ঝরনা ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলিছে কাম্যক-সরোবরে; গ্রামের লোক তাকে বলে উদাসকৌরা। সেই ঝরনাতলায় একটি পোড়ো মন্দিরে রাজপুত্র বাসা নিলে।

এক মাস কেটে গেল। গাছে গাছে যে কচিপাতা উঠেছিল তাদের রঙ ঘন হয়ে আসে, আর ঝরাফুলে বনপথ ছেয়ে যায়। এমন সময় একদিন ভোরের স্বপ্নে রাজপুত্রের কানে একটি বাঁশির সুর এল। জেগে উঠেই রাজপুত্র বললে, “আজ পাব দেখা ।”

### ৪

তখনই ঘোড়ায় চড়ে ঝরনাধারার তীর বেয়ে চলল, পৌছল কাম্যক-সরোবরের ধারে। দেখে, সেখানে পাহাড়েদের এক মেঝে পন্থবনের ধারে বসে আছে। ঘড়োয় তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের থেকে সে ওঠে না। কালো মেঝে কানের উপর কালো চুলে একটি শিরীষফুল পরেছে, গোধূলিতে যেন প্রথম তারা।

রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বললে, “তোমার ঐ কানের শিরীষফুলটি আমাকে দেবে?”

যে হরিণী ভয় জানে না এ বুঝি সেই হরিণী। ঘাড় বেঁকিয়ে একবার সে

রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তখন তার কালো চোখের উপর একটা কিসের ছায়া আরো ঘন কালো হয়ে নেমে এল—যুমের উপর যেন স্বপ্ন, দিগন্তে যেন প্রথম শ্রাবণের সঞ্চার।

মেয়েটি কান থেকে ফুল খসিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বললে, “এই নাও।”

রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি কোনু পরী আমাকে সত্য করে বলো।”

শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিশ্বয়, তার পরেই আশ্চর্ষ-মেঘের অচমকা বৃষ্টির মতো তার হাসির উপর হাসি, সে আর থামতে চায় না।

রাজপুত্র মনে ভাবল, “স্বপ্ন বুঝি ফলল—এই হাসির সুর যেন সেই বাঁশির সুরের সঙ্গে মেলে।”

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিলে; বললে, “এসো।”

সে তার হাত ধরে ঘোড়ায় উঠে পড়ল, একটুও ভাবল না। তার জলভরা ঘড়া ঘাটে রাইল পড়ে।

শিরীষের ডাল থেকে কোকিল ডেকে উঠল, কুহ কুহ কুহ কুহ।

রাজপুত্র মেয়েটিকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার নাম কী।”

সে বললে, “আমার নাম কাজৱী।”

উদাস-ঝোরার ধারে দুজনে গেল সেই পোড়ো মন্দিরে। রাজপুত্র বললে, “এবার তোমার ছন্দবেশ ফেলে দাও।”

সে বললে, “আমরা বনের মেয়ে, আমরা তো ছন্দবেশ জানি নে।”

রাজপুত্র বললে, “আমি যে তোমার পরীর মূর্তি দেখতে চাই।”

পরীর মূর্তি! আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুত্র ভাবলে, “এর হাসির সুর এই ঝরনার সুরের সঙ্গে মেলে, এ আমার এই ঝরনার পরী।”

## ৫

রাজার কানে খবর গেল, রাজপুত্রের সঙ্গে পরীর বিয়ে হয়েছে। রাজবাড়ি থেকে ঘোড়া এল, হাতি এল, চতুর্দোলা এল।

কাজৱী জিজ্ঞাসা করলে, “এ-সব কেন!”

রাজপুত্র বললে, “তোমাকে রাজবাড়িতে যেতে হবে।”

তখন তার চোখ ছল্ছলিয়ে এল। মনে পড়ে গেল, তার ঘড়া পড়ে আছে সেই জলের ধারে; মনে পড়ে গেল, তার ঘরের আঙিনায় শুকোবার জন্যে ঘাসের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে; মনে পড়ল, তার বাপ আর তাই শিকারে চলে গিয়েছিল, তাদের ফেরবার সময় হয়েছে; আর মনে পড়ল, তার বিয়েতে একদিন যৌতুক দেবে বলে তার মা গাছতলায় তাঁত পেতে কাপড় বুনছে, আর গুণ্ণন্ন করে গান গাইছে।

সে বললে, “না, আমি যাব না।”

কিন্তু ঢাক ঢোল বেজে উঠল; বাজল বাঁশি, কাঁসি, দামামা—ওর কথা শোনা গেল না।

চুর্দোলা থেকে কাজৰী যখন রাজবাড়িতে নামল, রাজমহিষী কপাল চাপড়ে  
বললে, “এ কেমনতরো পৱী!”

রাজার মেয়ে বললে, “ছি ছি, কী লজ্জা!”

মহিষীর দাসী বললে, “পৱীর বেশটাই বা কী রকম।”

রাজপুত্র বললে, “চুপ করো, তোমাদের ঘরে পৱী ছদ্মবেশে এসেছে।”

## ৬

দিনের পৰ দিন যায়। রাজপুত্র জ্যোৎস্নারাত্রে বিছানায় জেনে উঠে চেয়ে দেখে,  
কাজৰীর ছদ্মবেশ একটু কোথাও খসে পড়েছে কি না। দেখে যা, কালো মেয়ের  
কালো চূল এলিয়ে গেছে, আৰ তাৰ দেহখানি যেন কালো পাথৰে নিখুঁত কৰে খোদা  
একটি প্ৰতিমা। রাজপুত্র চুপ কৰে বসে ভাবে, ‘পৱী কোথায় লুকিয়ে রইল,  
শেষৱাতে অঙ্ককাৰের আড়ালে উধাৰ মতো।’

রাজপুত্র ঘৰের লোকেৰ কাছে লজ্জা পেলে। একদিন মনে একটু রাগও হল।  
কাজৰী সকালবেলায় বিছানা ছেড়ে যখন উঠতে যায় রাজপুত্র শক্ত কৰে তাৰ হাত  
চেপে ধৰে বললে, “আজ তোমাকে ছাড়ব না — নিজৰূপ প্ৰকাশ কৰো, আমি দেখি।”

এমনি কথাই শুনে বনে যে হাসি হেসেছিল সে হাসি আৰ বেৰোল না। দেখতে  
দেখতে দুই চোখ জলে ভৱে এল।

রাজপুত্র বললে, “তুমি কি আমায় চিৰদিন ফাঁকি দেবে।”

সে বললে, “না, আৰ নয়।”

রাজপুত্র বললে, “তবে এইবাৰ কাৰ্তিকী পূৰ্ণিমায় পৱীকে যেন সবাই দেখে।”

## ৭

পূৰ্ণিমাৰ চাঁদ এখন মাৰুগগনে। রাজবাড়িৰ নহবতে মাৰুৱাতেৰ সুৱে ঝিমি ঝিমি  
তান লাগে।

রাজপুত্র বৰসজ্জা প'ৱে হাতে বৱণমালা নিয়ে মহলে চুকল; পৱী-বউয়েৰ সঙ্গে  
আজ হবে তাৰ শুভদৃষ্টি।

শয়নঘৰে বিচানায় সাদা আন্তরণ, তাৰ উপৰ সাদা কুন্দফুল রাশ-কৰা; আৱ  
উপৰে জানলা বেয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে।

আৱ, কাজৰী?

সে কোথাও নেই।

তিন প্ৰহৱেৰ বাঁশি বাজল। চাঁদ পশ্চিমে হেলেছে। একে একে কুচুপৰে ঘৰ ভৱে  
গেল।

পৱী কই?

রাজপুত্র বললে, “চলে গিয়ে পৱী আপন পৱিচয় দিয়ে যায়, আৱ তখন তাকে  
পাওয়া যায় না।”

## ରାଜପୁତ୍ର

ରାଜପୁତ୍ରରେ ଚଲେଛ ନିଜେର ରାଜ୍ୟ ଛେଡ଼େ, ସାତ ରାଜାର ରାଜ୍ୟ ପେରିଯେ, ଯେ ଦେଶେ  
କୋଣୋ ରାଜାର ରାଜ୍ୟ ନେଇ ସେଇ ଦେଶେ ।

ଦେ ହଳ ଯେ କାଳେର କଥା ସେ କାଳେର ଆରଞ୍ଜଓ ନେଇ, ଶୈଷଓ ନେଇ ।

ଶହରେ ଗ୍ରାମେ ଆର-ସକଳେ ହାଟବାଜାର କରେ, ସର କରେ, ଝଗଡ଼ା କରେ, ଯେ ଆମାଦେର  
ଚିରକାଳେର ରାଜପୁତ୍ରର ସେ ରାଜ୍ୟ ଛେଡ଼େ ଛେଡ଼େ ଚଲେ ଯାଏ ।

କେନ ଯାଏ ।

କୁଠୀର ଜଳ କୁଠୀତେଇ ଥାକେ, ଖାଲ ବିଲେର ଜଳ ଖାଲ ବିଲେର ମଧ୍ୟେଇ ଶାନ୍ତ ।  
କିନ୍ତୁ, ଗିରିଶିଖରେ ଜଳ ଗିରିଶିଖରେ ଧରେ ନା, ମେଘେର ଜଳ ମେଘେର ବଁଧନ ମାନେ ନା ।  
ରାଜପୁତ୍ରକେ ତାର ରାଜ୍ୟଟୁକୁର ମଧ୍ୟେ ଠେକିଯେ ରାଖବେ କେ । ତେପାତ୍ରର ମାଠ ଦେଖେ ସେ  
ଫେରେ ନା, ସାତସମୁଦ୍ର ତେରୋନନ୍ଦୀ ପାର ହୁୟେ ଯାଏ ।

ମାନୁଷ ବାରେ ବାରେ ଶିଖ ହୁୟେ ଜନ୍ମାଯ ଆର ବାରେ ବାରେ ନତୁନ କ'ରେ ଏହି ପୁରୋତନ  
କାହିନୀଟି ଶୋନେ । ସକ୍ଷାୟନ୍ଦୀପେର ଆଲୋ ଟିକ୍ର ହୁୟେ ଥାକେ, ଛେଲେରା ଚୁପ କରେ ଗାଲେ  
ହାତ ଦିଯେ ଭାବେ, ‘ଆମରା ସେଇ ରାଜପୁତ୍ରର ।’

ତେପାତ୍ରର ମାଠ ଯଦି-ବା ଫୁରୋଯ, ସାମନେ ସମୁଦ୍ର । ତାରଇ ମାଝଖାନେ ଦ୍ଵୀପ, ସେଥାନେ  
ଦୈତ୍ୟପୂରୀତେ ରାଜକନ୍ୟା ବଁଧା ଆଛେ ।

ପୃଥିବୀତେ ଆର-ସକଳେ ଟାକା ଖୁଜଛେ, ନାମ ଖୁଜଛେ, ଆରାମ ଖୁଜଛେ, ଆର ଯେ  
ଆମାଦେର ରାଜପୁତ୍ରର ସେ ଦୈତ୍ୟପୂରୀ ଥିକେ ରାଜକନ୍ୟାକେ ଉଦ୍ଧାର କରତେ ବେରିଯେଛେ ।  
ତୁଫାନ ଉଠିଲ, ଲୌକୋ ମିଲିଲ ନା, ତବୁ ସେ ପଥ ଖୁଜଛେ ।

ଏଇଟେଇ ହଜ୍ଜେ ମାନୁଷେର ସବ-ଗୋଡ଼ାକାର ରୂପକଥା ଆର ସବ-ଶୈଷେର । ପୃଥିବୀତେ  
ଯାରା ନତୁନ ଜନ୍ମାଇଛେ, ଦିଦିମାର କାହେ ତାଦେର ଏହି ଚିରକାଳେର ଖବରଟି ପାଓୟା ଚାଇ ଯେ,  
ରାଜକନ୍ୟା ବନ୍ଦିନୀ, ସମୁଦ୍ର ଦୂର୍ଗମ, ଦୈତ୍ୟ ଦୂର୍ଜୟ, ଆର ଛୋଟୋ ମାନୁଷଟି ଏକଳା ଦାଁଡ଼ିଯେ ପଣ  
କରଛେ, “ବନ୍ଦିନୀକେ ଉଦ୍ଧାର କରେ ଆନବ ।”

ବାଇରେ ବନେର ଅନ୍ଧକାରେ ବୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ, ଝିଲ୍ଲି ଡାକେ, ଆର ଛୋଟୋ ଛେଲେଟି ଚୁପ କରେ  
ଗାଲେ ହାତ ଦିଯେ ଭାବେ, “ଦୈତ୍ୟପୂରୀତେ ଆମାକେ ପାଡ଼ି ଦିତେ ହବେ ।”

୨

ସାମନେ ଏଲ ଅସୀମ ସମୁଦ୍ର, ସ୍ଵପ୍ନେର-ଟେଉ-ତୋଳା ନୀଳ ସୁମେର ମମେତା । ସେଥାନେ  
ରାଜପୁତ୍ରର ଘୋଡ଼ାର ଉପର ଥିକେ ନେମେ ପଡ଼ିଲ ।

কিন্তু, যেমনি মাটিতে পা পড়া অমনি এ কী হল। এ কোন্ জাদুকরের জাদু।

এ যে শহর। ট্রাম চলেছে। আপিসমুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম। তালপাতার বাঁশি-ওয়ালা গলির ধারে উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেছে।

আর, রাজপুত্রের এ কী বেশ। এ কী চাল। গায়ে বোতামখোলা জামা, ধূতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শহরে পড়ে, টিউশানি করে বাসাখরাচ চালায়।

রাজকন্যা কোথায়।

তার বাসার পাশের বাড়িতেই।

চাঁপাফুলের মতো রঙ নয়, হাসিতে তার মানিক খসে না। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নববর্ষার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারই সঙ্গে।

মা-মরা মেয়ে বাপের আদরের ছিল। বাপ ছিল গরিব, অপাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইল না, মেয়ের বয়স গেল বেড়ে, সকলে নিন্দে করলে।

বাপ গেছে মরে, এখন মেয়ে এসেছে খুড়োর বাড়িতে।

পাত্রের সঙ্গান মিলল। তার টাকাও বিস্তর, বয়সও বিস্তর, আর নাতিনাতনির সংখ্যাও অল্প নয়। তার দাবরাবের সীমা ছিল না।

খুড়ো বললে, মেয়ের কপাল ভালো।

এমন সময় গায়ে-হলুদের দিনে মেয়েটিকে দেখা গেল না, আর পাশের বাসার সেই ছেলেটিকে।

খবর এল, তারা লুকিয়ে বিবাহ করেছে। তাদের জাতের মিল ছিল না, ছিল কেবল মনের মিল। সকলেই নিন্দে করলে।

লক্ষপতি তার ইষ্টদেবতার কাছে সোনার সিংহাসন মানত করে বললেন, “এ ছেলেকে কে বাঁচায়।”

ছেলেটিকে আদালতে দাঁড় করিয়ে বিচক্ষণ সব উকিল প্রবীণ সব সাক্ষী দেবতার কৃপায় দিনকে রাত করলে তুললে। সে বড়ো আশ্র্য।

সেইদিন ইষ্টদেবতার কাছে জোড়া পাঁঠা কটা পড়ল, ঢাক ঢোল বাজল, সকলেই খুশি হল। বললে, “কলিকাল বটে, কিন্তু ধর্ম এখনো জেগে আছেন।”

### ৩

তার পরে অনেক কথা। জেল থেকে ছেলেটি ফিরে এল। কিন্তু, দীর্ঘ পথ আর শেষ হয় না। তেপাত্তির মাঠের চেয়েও সে দীর্ঘ এবং সঙ্গীহীন। কতবার অন্ধকারে তাকে শুনতে হল, “হাঁটুমাউখাউ, মানুষের গন্ধ পাউ।” মানুষকে খাবার জন্যে চারি দিকে এত লোভ।

রাস্তার শেষ নেই কিন্তু চলার শেষ আছে। একদিন সেই শয়ে এসে সে থামল।

সেদিন তাকে দেখবার লোক কেউ ছিল না। শিয়ারে কেবল একজন দয়াময় দেবতা জেগে ছিলেন। তিনি যম।

সেই যমের সোনার কাঠি যেমনি ছো�ঘানো অমনি ও কী কাণ! শহর গেল মিলিয়ে, স্বপ্ন গেল ভেঙে।

মুহূর্তে আবার দেখা দিল সেই রাজপুত্র। তার কপালে অসীমকালের রাজটিকা দৈত্যপুরীর ঘার সে ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুলবে।

যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে ধৰের পায়—সেই ঘরছাড়া মানুষ তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চলল। তার সামনের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করছে।

ইতিহাসের মধ্যে তার বিচ্চির চেহারা; ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ, সে রাজপুত্র।

আর্থিন ১০২৮

## সুয়োরানীর সাধ

সুয়োরানীর বুঝি মরণকাল এল।

তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে, তার কিছুই ভালো লাগছে না। বন্দি বড়ি নিয়ে এল। মধু দিয়ে মেঢ়ে বললে, “খাও।” সে ঠেলে ফেলে দিলে।

রাজার কানে খবর গেল। রাজা তাড়াতাড়ি সভা ছেড়ে এল। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার কী হয়েছে, কী চাই।”

সে গুমরে উঠে বললে, “তোমরা সবাই যাও; একবার আমার স্যাঙ্গাধনিকে দেকে দাও।”

স্যাঙ্গাধনি এল। রানী তার হাত ধরে বললে, “সই, বোসো। কথা আছে।”

স্যাঙ্গাধনি বললে, “প্রকাশ করে বলো।”

সুয়োরানী বললে, ‘আমার সাতমহলা বাড়ির এক ধারে তিনটে মহল ছিল দুয়োরানীর। তার পরে হল দুটো, তার পরে হল একটা। তার পরে রাজবাড়ি থেকে সে বের হয়ে গেল।

তার পরে দুয়োরানীর কথা আমার মনেই রইল না।

তার পরে একদিন দোলযাত্রা। নাটমন্দিরে যাচ্ছি মহূরপজ্ঞি চ'ড়ে। আগে লোক, পিছে লশ্কর। ডাইনে বাজে বাঁশি, বাঁয়ে বাজে মৃদঙ্গ।

এমন সময় পথের পাশে, নদীর ধারে, ঘাটের উপরচিতে দেখি একখানি কুঁড়েঘর, চাঁপাগাছের ছায়ায়। বেড়া বেয়ে অপরাজিতার ফুল ফুটেছে, দুয়োরের সামনে চালের গুঁড়ো দিয়ে শঙ্খচক্রের আলপনা। আমার ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, ‘আহ ঘরখানি কার।’ সে বললে, দুয়োরানীর।

তার পরে ঘরে ফিরে এসে সক্ষ্যার সময় বসে আছি, ঘরে প্রদীপ জ্বালি নি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বললে, ‘তোমার কী হয়েছে, কী চাই।’

আমি বললেম, ‘এ ঘরে আমি থাকব না।’

রাজা বললে, ‘আমি তোমার কোঠাবাড়ি বানিয়ে দেব গজদন্তের দেওয়াল দিয়ে। শঙ্খের গুঁড়োয় মেঝেটি হবে দুধের ফেনার মতো সাদা, মুক্তের বিনুক দিয়ে তার কিনারে এঁকে দেব পঞ্চের মালা।’

আমি বললেম, ‘আমার বড়ো সাধ গিয়েছে, কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকি তোমার বাহিরবাগানের একটি ধারে।’

রাজা বললে, ‘আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী !’

কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলে। সে ঘর যেন তুলে-আনা বনফুল। যেমনি তৈরি হল অমনি যেন মুষড়ে গেল। বাস করতে গেলেম, কেবল লজ্জা পেলেম।

তার পরে একদিন স্বানযাত্রা।

নদীতে নাইতে গেছি। সঙ্গে একশো সাত জন সঙ্গিনী। জলের মধ্যে পাঞ্চ নামিয়ে দিলে, স্বান হল।

পথে ফিরে আসছি, পাঞ্চির দরজা একটু ফাঁক করে দেখি, ও কোনু ঘরের বউ গা। যেন নির্মাল্যের ফুল। হাতে সাদা শাঁখা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। স্বানের পর ঘড়ায় ক'রে জল তুলে আনছে, সকালের আলো তার ভিজে চুলে আর ভিজে ঘড়ায় উপর বিকিয়ে উঠছে।

ছত্রধারিণীকে শুধোরেম, ‘মেয়েটি কে, কোনু দেবমন্দিরে তপস্যা করে।’

ছত্রধারিণী হেসে বললে, ‘চিনতে পারলে না? এই তো দুয়োরানী।’

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই। রাজা এসে বললে, ‘তোমার কী হয়েছে, কী চাই।’

আমি বললেম, ‘আমার বড়ো সাধ, রোজ সকালে নদীতে নেয়ে মাটির ঘড়ায় জল তুলে আনব বকুলতলার রাঙ্গা দিয়ে।’

রাজা বললে, ‘আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।’

রাঙ্গায় রাঙ্গায় পাহারা বসল, লোকজন গেল সরে।

সাদা শাঁখা পরলেম আর লালপেড়ে শাড়ি। নদীতে স্বান সেরে ঘড়ায় করে জল তুলে আনলেম। দুয়োরের কাছে এসে মনের মনের দুঃখে ঘড়া আছড়ে ভাঙলেম। যা খেবেছিলেম তা হল না, শুধু লজ্জা পেলেম।

তার পরে সেদিন রাসযাত্রা।

মধুবনে জ্যোৎস্নারাতে তাঁবু পড়ল। সমস্ত রাত নাচ হল, গান হল।

পরদিন সকালে হাতির উপর হাওদা চড়ল। পর্দার আড়ালে বসে ঘরে ফিরছি, এমন সময় দেখি, বনের পথ দিয়ে কে চলেছে, তার নবীন বয়েস। চূড়ায় তার বনফুলের মালা। হাতে তার ডালি; তাতে শালুক ফুল, তাকে বনের ফল, তাতে খেতের শাখ।

ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, ‘কোনু ভাগ্যবতীর ছেলে পথ আলো করেছে।’

ছত্রধারিণী বললে, ‘জান না? এই তো দুয়োরানীর ছেলে। ওর মান জন্যে নিয়ে চলেছে শালুক ফুল, বনের ফল, খেতের শাখ।’

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বললে, ‘তোমার কী হয়েছে, কী চাই।’

আমি বলরেম, ‘আমার বড়ো সাধ, রোজ খাব শালুক ফুল, বনের ফল, খেতে শাক; আমার ছেলে নিজের হাতে তুলে আনবে।’

রাজা বললে, ‘আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।’

সোনার পালকে বসে আছি, ছেলে ডালি নিয়ে এল। তার সর্বাঙ্গে ঘাম, তার মুখে রাগ। ডালি পড়ে রাইল, লজ্জা পেলেম।

তার পরে আমার কী হল কী জানি।

একলা বসে থাকি, মুখে কথা নেই। রাজা রোজ এসে আমাকে শুধোয়, ‘তোমার কী হয়েছে, কী চাই।’

সুয়োরানী হয়েও কী চাই সে কথা লজ্জায় কাউকে বলতে পারি নে। তাই তোমাকে ডেকেছি, স্যাঙ্গাঞ্জি। আমার শেষ কথাটি বলি তোমার কানে, ‘ঐ দুয়োরানীর দৃঢ় আমি চাই।’

স্যাঙ্গাঞ্জি গালে হাত দিয়ে বললে, “কেন বলো তো।”

সুয়োরানী, বললে, “ওর ঐ বাঁশের বাঁশিতে সুর বাজল, কিন্তু আমার সোনার বাঁশি কেবল বয়েই বেড়ালেম, আগলে বেড়ালেম, বাজাতে পারলেম না।”

আব্দিন ১০২৭

## কর্তার ভূত

বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসুন্দর সবাই বলে উঠল, “তুমি গেলে আমাদের কী দশা হবে।”

শুনে তারও মনে দুঃখ হল। ভাবলে, “আমি গেলে এদের ঠাণ্ডা রাখবে কে?”

তা বলে মরণ তো এড়াবার জো নেই। তবু দেবতার দয়া করে বললেন, “ভাবনা কী। লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক-না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।”

### ২

দেশের লোক ভাবি নিষিদ্ধ হল।

কেননা ভবিষ্যৎকে মানলেই তার জন্যে যত ভাবনা, ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই; সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, সুতরাং কারো জন্যে মাথাব্যথাও নেই।

তবু স্বভাবদোষে যারা নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে যায় তারা যায় ভূতের কানমলা। সেই কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সমস্কে না আছে বিচার।

দেশসুন্দর লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুজে চলে। দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, “এই চোখ বুজে চলাই হচ্ছে জগতের সবচেয়ে আদিম চলা। একেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা। সৃষ্টির প্রথম চক্ষুহীন কীটাগুরা এই চলা চলত; ঘাসের মধ্যে, গাছের মধ্যে, আজও এই চলার আভাস প্রচলিত।”

শুনে ভূতগ্রস্ত দেশ আপন আদিম আভিজাত্য অনুভব করে। তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়।

ভূতের নায়েব ভূতড়ে জেলখানার দারোগা। সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না। এইজন্যে ভেবে পাওয়া যায় না, সেটাকে ফুটো করে কী উপায়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এই জেলখানায় যে ঘানি নিরস্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে এক ছটাক তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে, বেরোবার মধ্যে বেরিয়ে যায় মানুষের তেজ। সেই তেজ বেরিয়ে গেলে মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাতে করে ভূতের রাজত্বে আর কিছুই না থাক—অন্ন হোক, অন্ত্র হোক, স্বাস্থ্য হোক—শাস্তি থাকে।

কত-যে শাস্তি তার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, অন্য সব দেশে ভূতের বাড়াবাড়ি

হলেই মানুষ অস্তির হয়ে ওবার খৌজ করে। এখানে সে চিন্তাই নেই। কেননা ওবাকেই আগেভাগে ভূতে পেয়ে বসেছে।

### ৩

এইভাবেই দিন চলত, ভূতশাসনত্ব নিয়ে কারো মনে দ্বিধা জাগত না; চিরকালই গর্ব করতে পারত যে, এদের ভবিষ্যৎটা পোষা ভেড়ার মতো ভূতের খৌটায় বাঁধা, সে ভবিষ্যৎ ভ্যাও করে না, ম্যাও করে না, চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে, যেন একেবারে চিরকালের মতো মাটি।

কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুশকিল বাধল। সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায় নি। তাই অন্য সব দেশে যত ঘানি ঘোরে তার থেকে তেল বেরোয় তাদের ভবিষ্যতের রথচক্রটাকে সচল করে রাখবার জন্যে, বুকের রক্ত পিষে ভূতের খর্পরে ঢেলে দেবার জন্যে নয়। কাজেই মানুষ সেখানে একেবারে জুড়িয়ে যায় নি। তারা ভয়ংকর সজাগ আছে।

### ৪

এ দিকে দিবিয় ঠাণ্ডায় ভূতের রাজ্য জুড়ে ‘খোকা শুমোলো, পাড়া জুড়োলো’।

সেটা খোকার পক্ষে আরামের, খোকার অভিভাবকের পক্ষেও; আর পাড়ার কথা তো বলাই আছে।

কিন্তু, ‘বর্ণি এল দেশে’।

নইলে ছন্দ মেলে না, ইতিহাসের পদটা খৌড়া হয়েই থাকে।

দেশে যত শিরোমণি চূড়ামণি আছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা গেল, “এমন হল কেন।”

তারা এক বাক্যে শিখা নেড়ে বললে, “এটা ভূতের দোষ নয়, ভূতুড়ে দেশের দোষ নয়, একমাত্র বর্ণিরই দোষ। বর্ণি আসে কেন।”

শুনে সকলেই বললে, “তা তো বটেই।” অত্যন্ত সাম্মত বোধ করলে।

দোষ যাইহৈ থাক, খিড়কির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভূতের পেয়াদা, আর সদরের রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে অভূতের পেয়াদা; ঘরে গেরত্বর টেকা দায়, ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই। এক দিক থেকে এ হাঁকে, “খাজনা দাও।” আর-এক দিক থেকে ও হাঁকে, “খাজনা দাও।”

এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে ‘খাজনা দেব কিসে’।

এতকাল উন্নত পুর পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল, কারো হঁশ ছিল না। জগতে যারা হঁশিয়ার এরা তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, পাছে প্রায়শিকভ করতে হয়। কিন্তু, তারা অক্ষমাও এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শিকভ করে না। শিরোমণি-চূড়ামণির দল পুরি খুলে

বলেন, “বেহঁশ যারা তারাই পবিত্র, হঁশিয়ার যারা তারাই অনুচ্ছি, অতএব হঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো, প্রবুদ্ধমিব সুণ্ডঃ।”

শুনে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

### ৫

কিন্তু, তৎসন্দেশেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না ‘খাজনা দেব কিসে’।

শুশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা ক'রে তার উপর আসে, “আক্রম দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।”

প্রশ্নমাত্রেরই দোষ এই যে যখন আসে একা আসে না। তাই আরো একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে, “ভূতের শাসনটাই কি অনন্তকাল চলবে।”

প্রশ্নমাত্রেরই দোষ এই যে, যখন আসে একা আসে না। তাই আরো একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে, “ভূতের শাসনটাই কি অনন্তকাল চলবে।”

শুনে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আর মাসতুতো-পিসতুতোর দল কানে হাত দিয়ে বলে, “কী সর্বনাশ! এমন প্রশ্ন তো বাপের জন্মে শুনি নি। তা হলে সন্তান ঘুমের কী হবে—সেই আদিমতম, সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘুমের?”

প্রশ্নকারী বলে, “সে তো বুঝালুম, কিন্তু আধুনিকতম বুলবুলির বাঁক আর উপস্থিতিম বর্গির দল, এদের কী করা যায়।”

মাসিপিসি বলে, “বুলবুলির বাঁককে কৃষ্ণনাম শোনাব, আর বর্গির দলকেও।”

অর্বাচীনেরা উদ্বিগ্ন হয়ে বলে ওঠে, “যেমন করে পারি ভূত ছাড়াব।”

ভূতের নায়েব চোখ পাকিয়ে বলে, “চুপ! এখনো ঘানি অচল হয় নি।”

শুনে দেশের খোকা নিষ্ঠন্ত হয়, তার পরে পাশ ফিরে শোয়।

### ৬

মোদা কথাটা হচ্ছে, বড়ো কর্তা বেঁচেও নেই, মরেও নেই, ভূত হয়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না, অথচ ছাড়েও না।

দেশের মধ্যে দুটো-একটা মানুষ, যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না, তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় করে বলে, “কর্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয় নি।”

কর্তা বলেন, “ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই, ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।”

তারা বলে, “ভয় করে যে কর্তা।”

কর্তা বলেন, “সেইখানেই তো ভূত।”

## তোতাকাহিনী

এক-যে ছিল পাখি । সে ছিল মূর্খ । সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না । লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে ।

রাজা বলিলেন, “এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায় ।”

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, “পাখিটাকে শিক্ষা দাও ।”

### ২

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার ।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন । প্রশ্নটা এই, উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী ।

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না । তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া ।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন ।

### ৩

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে । খাঁচাটা হইল এমন আশ্র্য যে, দেখিবার জন্য দেশবিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল । কেহ বলে, “শিক্ষার একেবারে হৃদযুদ্ধ !” কেহ বলে, “শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল । পাখির কী কপাল !”

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল । খুশি হইয়া সে তখনই পাড়ি দিল বাড়ির দিকে ।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে । নস্য লইয়া বলিলেন, “অঙ্গ পুঁথির কর্ম নয় ।”

ভাগিনা তখন পুঁথিলিখকদের তলব করিলেন । তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল । যে দেখিল সেই বলিল, “সাবাস । বিদ্যা আর ধরে না ।”

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া । তখনই ঘরের দিকে দৌড় দিল । তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না ।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্যে ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই । মেরামত তো লাগিয়াই আছে । তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, “উন্নতি হইতেছে ।”

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরো  
বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিকুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া  
কোঠাবালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

### ৪

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল,  
“খাচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।”

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, “ভাগিনা, এ কী  
কথা শুনি।”

ভাগিনা বলিল, “মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের,  
পণ্ডিদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত করে এবং  
মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা  
বলে।”

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তখনই ভাগিনার গলায়  
সোনার হার চড়িল।

### ৫

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন।  
একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাখ ঘটা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরী ভেরী  
দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল, মৃদঙ্গ জগঝঞ্চ। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া  
চিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিত্র মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর  
মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, “মহারাজম, কাওটা দেখিতেছেন।”

মহারাজ বলিলেন, “আশ্চর্য। শব্দ কম নয়।”

ভাগিনা বকল, “শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।”

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক  
ছিল জোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উটিল, “মহারাজ, পাখিটাকে  
দেখিয়াছেন কি।”

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন, “ঐ যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয়  
নাই।”

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, “পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার  
কায়দাটা দেখা চাই।”

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে,  
পাখিটাকে দেখাই যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন,  
আয়োজনের ক্রটি নাই। খাচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে  
রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান  
তো বঙ্কই, চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা-সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিম্নকের  
যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

৬

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্র-দন্তুর-মত আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল,  
বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর  
অন্যায় রকমে পাখা ঝট্টপট্ট করে। এমন-কি, এক-একদিন দেখা যায় সে তার  
রোগা ঠোট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, “এ কী বেয়াদবি!”

তখন শিক্ষকমহলে হাপড় হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী  
দমাদম পিটানি! লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কঢ়া।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, “এ রাজ্যে পাখিদের  
কেবল যে আকেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।”

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ করিল  
যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতায়ালের  
হঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

৭

পাখিটা মরিল। কোন্কালে যে, কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিম্নক  
লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, “পাখি মরিয়াছে।”

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, “ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।”

ভাগিনা বলিল, “মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরা হইয়াছে।”

রাজা শুধাইলেন, “ও কি আর লাফায়।”

ভাগিনা বলিল, “আরে রাম!”

“আর কি ওড়ে।”

“না।”

“আর কি গান গায়।”

“না।”

“দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়।”

“না।”

রাজা বলিলেন, “একবার পাখিটাকে আনো তো দেখি।”

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়াসওয়ার আসিল।  
রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হঁ করিল না। কেবল তার পেটের  
মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্খস্ গজ্গজ্জ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণহাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিষ্ঠাসে মুকুলিত বনের  
আকাশ আকুল করিয়া দিল।

## নতুন পুতুল

এই গুণী কেবল পুতুল তৈরি করত; সে পুতুল রাজবাড়ির মেয়েদের খেলার জন্যে।

বছরে বছরে রাজবাড়ির আঙিনায় পুতুলের মেলা বসে। সেই মেলায় সকল কারিগরই এই গুণীকে প্রধান মান দিয়ে এসেছে।

যখন তার বয়স হল প্রায় চার কুড়ি, এমন সময় মেলায় এক নতুন কারিগর এল। তার নাম কিষগলাল, বয়স তার নবীন, নতুন তার কায়দা।

যে পুতুল সে গড়ে তার কিছু গড়ে কিছু গড়ে না, কিছু রঙ দেয় কিছু বাকি রাখে। মনে হয়, পুতুলগুলো যেন ফুরোয় নি, যেন কোনোকালে ফুরিয়ে যাবে না।

নবীনের দল বললে, “লোকটা সাহস দেখিয়েছে।”

প্রবীণের দল বললে, “একে বলে সাহস? এ তো স্পর্ধা।”

কিন্তু, নতুন কালের নতুন দাবি। এ কালের রাজকন্যারা বলে, “আমাদের এই পুতুল চাই।”

সাবেক কালের অনুচরেরা বলে, “আরে ছিঃ।”

শুনে তাদের জেদ বেড়ে যায়।

বুড়োর দোকানে এবার ভিড় নেই। তার ঝাঁকাভরা পুতুল যেন খেয়াল অপেক্ষায় ঘাটের লোকের মতো ওপারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

এক বছর যায়, দু বছর যায়, বুড়োর নাম সবাই ভুলেই গেল। কিষগলাল হল রাজবাড়ির পুতুলহাটের সর্দার।

### ২

বুড়োর মন ভাঙল, বুড়োর দিনও চলে না। শেষকালে তার মেয়ে এসে তাকে বললে, “তুমি আমার বাড়িতে এসো।”

জামাই বললে, “খাও দাও, আরাম করো, আর সবজির খেত থেকে গোরু বাচ্চুর খেদিয়ে রাখো।”

বুড়োর মেয়ে থাকে অষ্টপ্রহর ঘরকরনার কাজে। তার জামাই গড়ে মাটির প্রদীপ, আর নৌকো বোঝাই করে শহরে নিয়ে যায়।

নতুন কাল এসেছে সে কথা বুড়ো বোঝে না, তেমনিই সে বোঝে না যে, তার নাতনির বয়স হয়েছে ষোলো।

যেখানে গাছতলায় ব'সে বুড়ো খেত আগলায় আর ক্ষণে ক্ষণে ঘুমে চুলে পড়ে  
সেখানে নাতনি গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে; বুড়োর বুকের হাড়গুলো পর্যন্ত খুশি  
হয়ে ওঠে। সে বলে, “কী দাদি, কী চাই।”

নাতনি বলে, “আমাকে পুতুল গড়িয়ে দাও, আমি খেলব।”

বুড়ো বলে, “আরে ভাই, আমার পুতুল তোর পছন্দ হবে কেন?”

নাতনি বলে, “তোমার চেয়ে ভালো পুতুল কে গড়ে শুনি।”

বুড়ো বলে, “কেন, কিষণলাল।”

নাতনি বলে, “ইস! কিষণলালের সাধ্যি।”

দুজনের এই কথা-কাটাকাটি কতবার হয়েছে। বারে বারে একই কথা।

তার পড়ে বুড়ো তার ঝুলি থেকে মালমশলা বের করে; চোখে মন্ত গোল  
চশমাটা আঁটে।

নাতনিকে বলে, “কিন্তু দাদি, ভূষ্ণা যে কাকে খেয়ে যাবে।”

নাতনি বলে, “দাদা, আমি কাক তাড়াব।”

বেলা বয়ে যায়; দূরে ইঁদারা থেকে বললে জল টানে, তার শব্দ আসে; নাতনি  
কাক তাড়ায়; বুড়ো বসে বসে পুতুল গড়ে।

### ৩

বুড়োর সকলের চেয়ে ভয় তার মেয়েকে। সেই গিন্নির শাসন বড়ো কড়া, তার  
সংসারে সবাই থাকে সাবধানে।

বুড়ো আজ একমনে পুতুল গড়তে বসেছে; হঁশ হল না, পিছন থেকে তার মেয়ে  
ঘন ঘন হাত দুলিয়ে আসছে।

কাছে এসে যখন ডাক দিলে তখন চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে অবোধ  
ছেলের মতো তাকিয়ে রইল।

মেয়ে বললে, “দুধ দোওয়া পড়ে থাক্, আর তুমি সুভদ্রাকে নিয়ে বেলা বইয়ে  
দাও। অত বড়ো মেয়ে, ওর কি পুতুলখেলার বয়স।”

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “সুভদ্রা খেলবে কেন। এ পুতুল রাজবাড়িতে  
বেচব। আমার দাদির যেদিন বর আসবে সেদিন তো ওর গলায় মোহরের মালা  
পরাতে হবে। আমি তাই টাকা মজাতে চাই।”

মেয়ে বিরক্ত হয়ে বললে, “রাজবাড়িতে এ পুতুল কিনবে কে।”

বুড়োর মাথা হেঁট হয়ে গেল। চুপ করে বসে রইল।

সুভদ্রা মাথা নেড়ে বললে, “দাদার পুতুল রাজবাড়িতে কেমন না কেনে দেখব।”

### ৪

দু দিন পরে সুভদ্রা এক কাহন সোনা এনে মাকে বললে, “এই নাও, আমার দাদার  
পুতুলের দাম।”

মা বললে, “কোথায় পেলি ?”

মেয়ে বললে, “রাজপুরীতে গিয়ে বেচে এসেছি।”

বুড়ো হাসতে হাসতে বললে, “দাদি, তবু তো তোর দাদা এখন চোখে ভালো দেখে না, তার হাত কেঁপে যায়।”

মা খুশি হয়ে বললে, “এখন ঘোলোটা মোহর হলেই তো সুভদ্রার গলার হার হবে।”

বুড়ো বললে, “তার আর ভাবনা কী ?”

সুভদ্রা বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, “দাদাভাই, আমার বরের জন্যে তো ভাবনা নেই।”

বুড়ো হাসতে লাগল, আর চোখ থেকে এক ফেঁটা জল মুছে ফেললে।

## ৫

বুড়োর ঘৌবন যেন ফিরে এল। সে গাছের তলায় বসে পুতুল গড়ে আর সুভদ্রা কাক তাড়ায়, আর দূরে ইন্দারায় বলদে ক্যা-কোঁ করে জল টানে।

একে একে ঘোলোটা মোহর গাঁথা হল, হার পূর্ণ হয়ে উঠল।

মা বললে, “এখন বর এলেই হয়।”

সুভদ্রা বুড়োর কানে কানে বললে, “দাদাভাই, বর ঠিক আছে।”

দাদা বললে, “বল তো দাদি, কোথায় পেলি বর।”

সুভদ্রা বললে, “যেদিন রাজপুরীতে গেলেম দ্বারী বললে, কী চাও। আমি বললেম, রাজকন্যাদের কাছে পুতুল বেচতে চাই। সে বললে, এ পুতুল এখনকার দিনে চলবে না। ব'লে আমাকে ফিরিয়ে দিলে। একজন মানুষ আমার কান্না দেখে বললে, দাও তো, ঐ পুতুলের একটু সাজ ফিরিয়ে দিই, বিক্রি হয়ে যাবে। সেই মানুষটিকে তুমি যদি পছন্দ কর দাদা, তা হলে আমি তার গলায় মালা দিই।”

বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, “সে আছে কোথায় ?”

নাতনি বললে, “ঐ যে বাইরে পিয়ালগাছের তলায়।”

বর এল ঘরের মধ্যে; বুড়ো বললে, “এ যে কিষণলাল !”

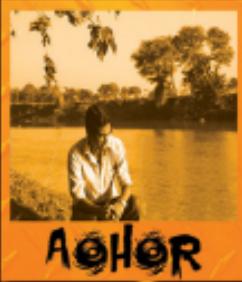
কিষণলাল বুড়োর পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, “হঁ, আমি কিষণলাল।”

বুড়ো তাকে বুকে চেপে ধরে বললে, “ভাই, একদিন তুমি কেড়ে নিয়েছিলে আমার হাতের পুতুলকে, আজ নিলে আমার প্রাণের পুতুলটিকে।”

নাতনি বুড়োর গলা ধরে তার কানে কানে বললে, “দাদা, তোমাকে সুন্দৰ।”

# High Quality Aohor Arsalan Scan

scan with  
Canon



Owner & Administrator  
[Banglapdfboi.com](http://Banglapdfboi.com)

---

Administrator  
[Banglapdf.net](http://Banglapdf.net)